প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৯৬০

প্রচ্ছদ
অশোক রায়

প্রকাশক
অশোক রায় ☐ এ পি পি
১১৭ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণগ্রন্থণ
অভীক রায় ☐ এ পি পি লেজার গ্রাফিক্স
১১৭ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
ষ্টারলাইন
১৯এইচ/১২এইচ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

তিনটি অনন্য সাধারণ উপন্যাস নিয়ে এই সংকলন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তিন বিদগ্ধ সাহিত্যিকের তিনটি উপন্যাস পৃথিবীর সমালোচকদের মতে ও বিচার বিশ্লেষনে অমর হয়ে আছে। উইলিয়াম ফকনার, আঁদ্রেজিদ ও ষ্টেইনবেক, এই তিন নোবেলজয়ী সাহিত্যিকের সেরা উপন্যাসগুলির মধ্য থেকে এই গ্রন্থে গ্রথিত উপন্যাস তিনটি সেরার শিরোপা দিয়েছেন দেশ বিদেশের সাহিত্য সচেতন মানুষরা। উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ১৯৪৯-এ নোবেল পুরস্কার পান উইলিয়াম ফকনার। কিছু সমাজ বিরোধী আর অপরাধ প্রবন চরিত্র আর তাদের কার্যকলাপের একদিককে নিয়ে গড়ে উঠেছে ফকনারের উপন্যাস স্যাংচুয়ারি। ঐ সব মানুষেরা আচরনের মন্দ-অসাধু কর্ম আর তার পাশাপাশি মহান দৃষ্টিভঙ্গি যা স্থির করে, সেসব উদ্দেশ্য, তিনি তুলে ধরেছেন তার এই বিয়োগান্ত উপন্যাসে। অনেকের মতে স্যাংচুয়ারি তাঁর ছিল তার লেখা শ্রেষ্ঠ ধ্রূপদী উপন্যাস।

১৯৪৭-এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ফরাসী ঔপন্যাসিক আঁদ্রেজিদ। ১৯৪৬ সালে গ্রীক উপকথাকে উপজীব্য করে লিখেছিলেন 'থিসিয়াস' উপন্যাসটি। শিল্প ভাবনা ও রচনাশৈলিতে আঁদ্রেজিদের এই উপন্যাস আজ সর্বজনবিদিত। সচেতন এই ভাষা শিল্পীর এই কালজয়ী উপন্যাসটি আমাদের কাছে এক দুর্লভ হীরের মত।

তৃতীয় উপন্যাসটি জন ষ্টেইনবেকের। অনন্য গদ্যরীতিতে লেখা তার উপন্যাস ক্যানেরী রো। সোজা সরল গল্প বলার রীতিতে তিনি বিশ্বাসী নন। জটিল রহস্যের মত ভাষা তার রচনাশৈলীতে। তার লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে সমুদ্র পাড়ের মানুষজন। তাদের অবচেন মনের অন্ধকার জটিল রহস্য।

যুক্তি এবং বিদগ্ধ বিচারের মধ্য দিয়ে মানুষের কথা, তার পরিবেশের তথ্য ও স্খলন ও উত্তরনের প্রকৃত চেহারা এঁরা তিনজনেই তুলে ধরেছেন তাদের উপন্যাসে। এই মুল্যবান তিনটি উপন্যাসকে গ্রন্থিত করে আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। তাঁদের এই অসামান্য কীর্তি স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরদিন।

অশোক রায়

উইলিয়াম ফকনার

দক্ষিণ আমেরিকায় মিসিসিপি নদীর কাছে রিপলি, সেখানকার ছোট শহর অক্সফোর্ডে ১৮৯৭-এ জন্ম নেন উইলিয়াম ফকনার। স্কুলের গণ্ডি পোরোনোর পরে পিতামহের ব্যাংকে শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন, একইসঙ্গে মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তিনি উচ্চশিক্ষা নেন। কিছুদিন পরে ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে উইলিয়াম রয়্যাল ফ্লাইং কোর-এর যোগ দেন, কৃতিত্ব দেখিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে লেফটেন্যান্ট-এর পদ অর্জন করেন। যুদ্ধ শেষ হলে উইলিয়াম অক্সফোর্ডে পৈতৃক বাড়িতে ফিরে এলেন, কিছুদিন বসে থাকার পরে এক মাছধরা ট্রলারে যোগ দিলেন নাবিক হিসেবে, অবসর সময়ে ছবি এঁকে আর কাঠের মিস্ত্রির কাজ করেও তিনি অর্থোপার্জন করেন। কিছুদিন এভাবে কেটে যাবার পরে উইলিয়াম নিউ অরলিয়নসের এক খবরের কাগজে সাংবাদিক হিসেবে যোগ দেন। সেটা ১৯২৬, এইসময় তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'সোলজার্স পে' ছেপে বেরোয়। কিন্তু সাংবাদিকের কাজে নিজেকে বেশিদিন ধরে রাখলেন না উইলিয়াম, খবরের কাগজের চাকরি ছেড়ে তিনি আবার বেছে নেন নাবিক জীবন, কাজ করেন একাধিক পণ্যবাহী জাহাজে। এরপরে ১৯২৯-এ বিয়ে করেন উইলিয়াম। কিন্তু সংসারের শান্তজীবন বেশিদিন তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলো না, বৈচিত্রের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে উইলিয়াম বিয়ের পরে নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়লেন, রাতেরবেলা যারা জাহাজে কয়লা তোলে সেই শ্রমিকদের দলে ভিড়ে গেলেন। রাতের গভীরে নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের চেহারা কেমন দেখায়, কতটা পাশবিক হয়ে ওঠে তার প্রকৃতি। এসব লক্ষ্য করার জন্যই শুধু রাতের শিফ্‌টে কাজ করতে লাগলেন। এইসময় ১৯৩০-এ প্রকাশিত হল তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'অ্যাজ আই লে ডাইং।' শুনলে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা সত্যি যে একদিন রাত ১২টা থেকে ভোর ৪টে, মাত্র এই চার ঘন্টায় তিনি উপন্যাসটি লিখে ফেলেন। রাতের গভীরে সহজাত শব্দাবলীর একটিও না পাল্টে বা সংশোধন না করে ঐ উপন্যাসটি ছেপে বেরোয় সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে ঘটনা একান্ত বিরল।

কিছু সমাজবিরোধী আর অপরাধপ্রবণ চরিত্র আর তাদের কার্যকলাপের একদিককে নিয়ে গড়ে উঠেছে উইলিয়ামের তৃতীয় উপন্যাস 'স্যাংচুয়ারি।' ঐসব মানুষের আচরণের মন্দ, অসাধু আর তার পাশাপাশি মহান দৃষ্টিভঙ্গিকে যা স্থির করে সেসব উদ্দেশ্য তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর এই বিয়োগান্ত উপন্যাসে। অনেকের মতে, স্যাংচুয়ারি উইলিয়াম ফকনারের লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির জন্য ১৯৪৯-এ নোবেল পুরস্কার পান উইলিয়াম ফকনার।

স্যাংচুয়ারী

রাস্তা থেকে একটা সরু পায়ে চলা পথ ঝর্ণার কছে গিয়ে শেষ হয়েছে, একরাশ ঝোপঝাড় ঘিরে আছে ঝর্ণাটাকে। সেই ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে পপি দেখতে পেল লোকটাকে। লম্বা, পাতলা ছিপছিপে গড়ন, মাথায় টুপি নেই, পরনে ছেঁড়াখোঁড়া ফ্যানেলের ট্রাউজার্স, একটা ভাঁজ করা সস্তা টুইডের কোট বাঁ হাতের ওপর আলগোছে ফেলা। সেই পায়ে চলা পথ ধরে লোকটা এগিয়ে গেল ঝর্ণার কাছে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে ঝর্ণার জল খেতে লাগল দু'হাতে আঁজলা করে।

একটা বীচ গাছের গোড়ায় মাটি ফুঁড়ে ঝর্ণটা উঠেছে শামুকের খোলার পাঁকের মত ঢেউ খেলানো বালুপর ওপর দিয়ে তা বয়ে গেছে। বেত, কাঁটাগাছ,গঁদ আর সাইপ্রেসের ঘন ঝোপ ঝর্ণটাকে ঘিরে আছে, ˉর্যের অলো ঢোকেনা সেই ঝোপের ভেতরে। কাছেই কোথাও এক নাম না জানা পাখি তিনবার শিস দিয়ে ডেকে উঠে থেমে গেল। ঘাড় হেঁট করতে ঝর্ণার জলে লোকটা তার আঁজলা কবে জল খাওয়ার অসংখ্য প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। উঠে দাঁড়তে ঝর্ণার জলের ভাঙ্গাচোরা সেই প্রতিফলনের মধ্যে পপির খড়ের টুপিব প্রতিচ্ছবিও তার চোখে পড়ল, কিন্তু কোনও শব্দ শুনতে পেল না।

সামনের দিকে চোখ পড়তে ঝর্ণার ওপরে মুখোমুখি দাঁড়ানো লোকটাকে সে দেখতে পেল। স্বাভাবিকের চেয়ে অস্বাভাবিক খাটো আর বেখাপ্পা তার গড়ন, দু'হাত কোটেব দু'পকেটে গোঁজা, ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট। লোকটাব পরনে কালো রং এর স্যুট, ভেতরে আঁটো ওয়েস্ট কোট। ট্রাউজার্স-এর দু'পায়ের কাছটা গোটানো কাদা লেপটে আছে। কাদা লেগেছে তার দু'পায়ের জুতোতেও। লোকটার মুখের রং অদ্ভুত ফ্যাকাসে, দেখে মনে হয় যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই শরীরে, দিনের আলোয় অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় কাত করে পড়া তার খড়ের টুপি আর কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়ানোর ভঙ্গি সবই কেমন যেন কিম্ভূত ঠেকছে।

তার ঠিক পেছনে পাখিটা আবার গান গেয়ে উঠল, সেই একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি; অর্থহীন সে সুর মিলিয়ে যেতে না যেতে নেমে এল এক অদ্ভুত শান্তিপূর্ণ নীরবতা, সেই নীরবতা গোটা জায়গাটা ছেয়ে ফেলল আর তার পরমুহূর্তে কাছে রাস্তা থেকে একটা ছুটন্ত গাড়ির আওয়াজ ভেসে এল্। খানিক বাদে সে আওয়াজ মিলিয়েও গেল।

'কি হে, তোমার পকেটে পিস্তল আছে নাকি?' যে লোকটা খানিক আগে জল খাচ্ছিল সে ঝর্ণার পাসে হাঁটু গেড়ে বসে জানতে চাইল। 'এই যে তুমি,' অস্ত্র হিসাবে অনায়েসে ব্যবহার করা যায় এমন দু'টো কালো রবারের গাঁট হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ এক

দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল ' তোমায় বলছি, তোমার পকেটে কি আছে হে, কি রেখেছো ওখানে ?'

অন্য লোকটির কোট তখনও তার বাঁ হাতের ওপর আলগোছে ফেলা । এবারে সে তার সেই কোটের একদিকের পকেট থেকে একটা দোমড়ানো ফেল্ট হ্যাট বের করল, ' কোন পকেটের কথা বলছ ?'

' আমার ওসব বের করে দেখানোর দরকার নেই,' পপি বলল, ' মুখে বললেই হবে ।' ' দেখতেই পাচ্ছো ', অন্য লোকটি বলল ' এটা একটা বই ।' ' তাই বুঝি ?' জানতে চাইল পপি । ' তা ওটা কি বই ?' বলল পপি । ' বই মানে বই ' লোকটা জবাব দিল । ' যে বই লোকে পড়ে তেমনই একটা বই ।'

'ও', যেন ভারি অবাক হয়েছে এমনই গলায় বলল পপি, ' তুমি বই টই পড়ো বুঝি ?' কোনও জবাব না দিয়ে লোকটা ঠাণ্ডা চাউনি মেলে তাকিয়ে রইল, তার সিগারেটের ধোঁয়া পালকের মত আলতো ভাবে ছুঁয়ে যেতে লাগল পপির মুখের একদিক । মে মাসের বিকেল, চারটে বাজতে বেশি দেরি নেই । পুরো দু'ঘন্টা দুজনে তাকিয়ে রইল দু'জনের দিকে । এরই মধ্যে জলার ভেতর থেকে পাখিটা ঘড়ির ঘন্টার মত একেকবার ডেকে উঠতে লাগল । খানিক দূরে বড় রাস্তায় যাওয়া বার দুয়েক গাড়ি চলে যাবার আওয়াজ হল, কয়েক মুহূর্ত বাদে সে আওয়াজ আবার মিলিয়ে গেল, তারপরে পাখিটা আরও একবার ডেকে উঠল ।

' পাখিটার নাম যে তুমি জানো না তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' ঝর্ণার ওপারে দাঁড়ানো লোকটি বলল । ' খাঁচার ভেতরে থেকে গান না গাইলে নয়ত হোটেলে বসে তার মাংস না খেলে সে পাখির নাম তুমি জানবে তা আমি আশা করিনা ।' উবু হয়ে মাটিতে বসে পড়ল পপি, একটা কথাও না বলে শুধু ঝর্ণার জলে একরাস থুতু ছিটিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল । গাঢ় পাণ্ডুর তার চামড়ার রং, নাক কিছুটা টিকোলো হলেও চিবুক বা থুতনি বলে কিছুই নেই । মুখের ভাবটি মরা মানুষের মত নিস্প্রান, মাকড়সার জালের মত একটা প্ল্যাটিনামের চেন গলায় ঝুলছে ।

' ওহে শুনছো ! ' ঝর্ণার ওপারে দাঁড়ানো মুখোমুখি লোকটা বলল, ' আমার নাম হোরেস বেনবো, কিনস্টনে ওকালতি করি । থাকি সেই জেফারসনে, এখন ওদিকই যাচ্ছি । ধারে কাছে যাকে খুশি জিজ্ঞেস করলেই জানবে আমার ভয় পাবার কিছু নেই, আমি কারও ক্ষতি করি না । একটু জল খাব বলে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম । জল খাওয়া হয়ে গেছে, এবারে জেফারসন টাউনের দিকে পা বাড়াব, সন্ধের আগে ওখানে পৌছোতে হবে, তুমি এভাবে আমায় আটকাতে পার না ।' থুতু ছেটানোর মত পপি ঠোঁটে ধরা আধপোড়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝর্ণার জলে ।

' এভাবে তুমি আমায় রুখতে পারোনা,' বলল বেনবো ' ধরো আমি যদি এখন দৌড়ে পালাই, তাহলে ?'

' তুমি সত্যিই দৌড়ে পালাতে চাও ?' বেনবোর চোখের দিকে তাকিয়ে জানতে

চাইল পপি ।

'না,' জবাব দিল বেনবো ।

'তাহলে নাই বা দৌড়ালে,' বলল পপি । ঠিক তখনই পাখিটা আবার ডেকে উঠল, তার ডাক কানে আসতে পাখিটার নাম মনে করার একটা চেষ্টা করল বেনবো । কাজেই সড়কে আরেকটা গাড়ি চলে যাবার আওয়াজ ভেসে এল । সূর্য এতক্ষণে পশ্চিম দিগন্তে প্রায় বিলীন । পকেট থেকে একটা সস্তা দামের ঘড়ি বের করে চোখ বুলিয়ে পপি আবার রেখে দিল পকেটে ।

ঝর্ণার গা থেকে বেরোনো জলটা যেখানে বালু মাখা সরু খালটায় মিশিছে হালে কেটে ফেলা একটা গাছ সেখানে পরার ফলে এগোনোর জল বন্ধ হয়েছে । বেনবো আর পপি পায়ে মারিয়ে গাছটা পেরিয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে । পপি একটু এগিয়ে গেছে, নিচের দিকে তাকাতে রাস্তার বুকে গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পেল বেনবো । পেছন থেকে পপিকে দেখাচ্ছে ঠিক ল্যাম্পস্ট্যান্ডের মত ।

চারদিকে আঁধার নামছে । পেছন দিকে তাকিয়ে পপি বেনবোর উদ্দেশ্যে বলে উঠল 'পা চালাও গুরু ।' বালুর পরিধি শেষ হয়ে রাস্তা উঁকি দিচ্ছে, বোনবো বলল, 'এদিকে না এসে পাহাড় পেরিয়ে গেলে হত না ?' আপনমনে বলল উঠল বেনবো । 'ঐ বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ?' পাল্টা প্রশ্ন করল পপি, বেনবো কোনও মন্তব্য করল না । পপির হাঁটা কিছুটা টিমিয়ে এসেছে, এখন সে বেনবোর পাশাপাশি হাঁটছে । মাথায় টুপির ফাঁকে পপির বজ্জাতি মেশানো তোষামুদে চাউনি দেখতে পাচ্ছে বেনকে, পপির টুপিটা বেনবোর চিবুক বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছে ।

ঠিক তখনই সেই আলো আঁধারির মাঝখানে একটা বড়সড় পাখি পাখা উড়ে যাবার ফলে পাখার ঝাপটা লাগল তাদের দু'জনের মুখে, ঘাবড়ে গিয়ে পপি বেনবোর কোট চেপে ধরল শক্ত মুঠোয় ।

'আরে ও একটা প্যাঁচা,' আশ্বস্ত করার গলায় বলল বেনবো, 'ক্যারোলিনায় এর নাম সেডো প্যাঁচা ।' পপি তখনও তার কোট চেপে ধরে আছে শক্ত মুঠোয় । তার নিঃশ্বাসে একটা চেনা গন্ধ পেল বেনবো, গন্ধটা তার খুব চেনা ঠেকল; কনে বোভারির মাথা যখন সবাই তুলে ধরছিল তখন কালচে খানিকটা রস তার মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে মুখের ওপর বিয়ের ওড়নায় লেগে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছিল, এমনই ঠিক এই গন্ধই তখন পেয়েছিল বেনবো ।

আরও কয়েক পা যাবার পরে যেন দলাপাকানো কতগুলো গাছের পর্দা ভেদ করে বাড়িটা ফুটে উঠল তাদের চোখের সামনে ।

বাইরে থেকে বাড়িটা দেখতে রোগা, শুকনো, হাড় জিরজিরে অনেকদিন ছাঁটা হয়নি এমন কিছু সিডার গাছের দঙ্গলের ভেতর থেকে তা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পুরোনো ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে এ বাড়ির ইতিহাস খুব কম নয়, গৃহযুদ্ধের

ঢের আগে চারপাশে তুলোর ক্ষেত, লন, আর বাগানের মাঝখানে এক ফালি জমির ওপরে তা গড়ে উঠেছিল তখন থেকে এবাড়ি ওল্ড ফ্রেঞ্চম্যান প্লেস নামে পরিচিত ।

বারান্দার একধারে তিনজন লোক আলাদা তিনটি চেয়ার বসে । পাশে রান্নাঘরের উনুনের আগুনের আবছা আলোয় বিশাল হলের ভেতরটা আলোকিত । ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দায় পা দিয়ে পপি দেখল ভেতরের তিনজন লোক কৌতূহল মেশানো অদ্ভূত চাউনি মেলে তাকে আর তার সঙ্গিকে দেখছে । ' এই ফাকে আমার সঙ্গে উনি প্রফেসর,' বেনবোর উদ্দেশ্যে বলল পপি, আমার সঙ্গে এসেছেন । পপির কথা শুনে তিনজন লোকের চোখে মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটল না । রান্নাঘরের উনুনে চাপানো পাত্রে মাংস চাপানো হয়েছে, জল মরে সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে । উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে এক যুবতী তার পরনে সূতির তৈরী ঘড়োয়া ঢোলা জামা, বহুদিন ব্যবহারে জায়গায় জায়গায় সুতো ভিজে গেছে । যুবতীর পায়ে একজোড়া ছেলেদের জুতো, ফিতে না থাকায় হাঁটাচলা করার সময় চটর পটর আওয়াজ হচ্ছে । একবার পপির দিকে তাকিয়ে যুবতী আবার রান্নার দিকে মন দিল । রান্নাঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে পপি সিগারেট ধরালো, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ' তোমার হাতের নাগালে একটা পাখি এসে বসেছে ।'

' এসব আমাকে বলছ কেন ?' মুখ না তুলে যুবতী বলল, ' লীর খদ্দেরদের দিয়ে আমায় না হলেও চলবে । '

' উনি একজন প্রফেসর ,' পপি বলল।

' কি বললে? ' একটা বড়সড় লোহার কাঁটা হাতে ঝুলিয়ে বলল পপি, ' উনি একজন প্রফেসার, ' পপি বলল, ' ওর সঙ্গে এক খানা বই আছে । '

' ও এখানে কি করছে ? '

' জানি না, ' পপি বলল । ' জিজ্ঞেস করার কথা একবারও মনে আসে নি । হয়ত সঙ্গের বই খানা পড়ার বলেই এনেছে ।'

' ওকে পেলে কোথায় ?'

' ঝর্ণার কাছে ।'

' ও কি এই বাড়িটা খুঁজছিল নাকি ?'

' জানি না,' পপি বলল, ' জিজ্ঞাস করার কথা একবারও মাথায় আসেনি ।' লোকটা জেফারসনে যেতে চায় বলল । ভাবছি কোন একটা ট্রাকে চাপিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেব জেফারসনে।

'এসব কথা আমায় বলছ কেন ?' যুবতী জানতে চাইল ।

রান্নার পাট চট পট শেস করে বলল পপি ' ও ত খানিক বাদেই যেতে চাইব ।'

'তাত বটেই, খিদে পেলেই যেতে চাইবে,' বলতে বলতে যুবতী পপির সামনে থেকে সরে আবার উনুনের কাছে গিয়ে দাঁড়ল, সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের মনে ক্ষোভ মেশানোয় গলায় বিড়বিড় করে বলতে বলতে লাগল ' রান্নাও আমায় করতেই হবে ,

যত চোর ছ্যাঁচোর জেল পালানো বদমাস আর ভিতুর ডিম শয়তান এসে জুটেছে এখানে। এদেব গেলানোর জন্য রাঁধুনির কাজ আমায় চালিয়ে যেতেই হবে ।'

' অত বক বক করার কি আছে শুনি ?' দু'দিকের পকেটে দু'হাত গুঁজে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পপি বলল , ' বেশ বুঝতে পারছি এখানে থেকে রাঁধুনির কাজ করে প্রচুর বাড়তি চর্বি গজিয়েছে তোমার গতরে । ঠিক আছে তুমি সেজেগুজে তৈরী হয়ে থেকো, আসছে রোববার আমি তোমায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব মেমফিসের বস্তিতে ; ওখানে হাজার লোকের সঙ্গে দু'বেলা গাদাগাদি হুড়োহুড়ি করে থাকলেই তোমার গতরের সব চর্বি ঝরবে । আগে যেমন বস্তির শুঁটকো পেত্নীর মত দেখতে ছিলে সেই চেহারাটা তাতেই ফিরে আসবে ।

' চুপ কর খানকির ছাওয়াল । ' রান্নার খুন্তি তুলে ধমকে উঠল যুবতী ' বড্ড বাড় বেড়েছে তোর না ?'

' ঠিক বলেছো,' সায় দেবার গলায় বলল পপি, ' শহর থেকে এতদূরে লী গুডউইনের বাতিল জুতো পায়ে গলিয়ে রান্নার লকড়ি নিজে জোগার করা আর এর তার বিছানায় শুধু রাত কাটানো তোমায় এসব গুনের কথা আমি মরে গেলেও ম্যানুয়েল স্ট্রিটে রটিয়ে বেড়াব না, দিব্যি বলছি । লী গুডউইন পয়সাওলা লোক এর বেশি কিছু আমি বলবনা ।'

' চুপ কর ওরে বেজন্মা খানকির ছাওয়াল ' যুবতী আবার পপিকে ধমকে উঠল, ' আবার বলছি তুই থাম; মুখ বন্ধ কর ।'

' ঠিকই বলেছো' বলে পেছন দিকে তাকাল পপি । থপথপ আওয়াজ ভেসে এল বারান্দার দিক থেকে । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক খালি পায়ে সেদিক থেকে ঢুকলো ভেতরো । পরনে ঢোলা জামা লোকটা সামানের দিকে হাল্কা ঝুঁকে হাঁটছে । তার মাথার চুলে জট ধরে বিশ্রি দেখাচ্ছে । দু'চোখে ফ্যাকাসে হিংস্র চাউনি, চিবুক পর্যন্ত নেমে আসা একগোছা দাড়ির রং রোদে পোড়া বিশ্রি হলদে ।

' তোমার এখানে কি চাই ? ' যুবতী খেঁকিয়ে বলে উঠল, কিন্তু লোকটি জবাব দিলনা । আড় চোখে পপির দিকে হুঁসিয়ারি চাউনি মেলে ভালুকের মত পা ফেলে কিছুদূর এগোল, তারপর কাঠের মেঝের এক ফালি তক্তা তুলে একটা গ্যালন জগ বের করে আনল । একটি কথাও না বলে পপি হিংস্র চোখে দেখতে লাগল লোকটিকে । পপি যে তাকে পছন্দ করছে না বুঝি তা আঁচ করেই লোকটি সেই গ্যালন জগ সমেত ধীরে ধীরে পা ফেলে আবার ফিরে গেল বারান্দার দিকে ।

যুবতীকে লক্ষ করে বলল পপি, ' রুবি ল্যামার যে একটা ভিতুর ডিমের জন্যও এখানে রান্নবান্না করছে সেকথা আমি ম্যানুয়েল স্ট্রিটের লোকেদের মোটেও বলব না '।

'তোর বাপের ঠিক নেই রে ।'

আবার খেঁকিয়ে উঠল যুবতী, ' তুই একটা আস্ত বেজন্মা ।'

বাজে সস্তা কাঠের তক্তায় পেরেক ঠুকে তৈরী হয়েছে কাজ চালানোর গোছের

টেবল আর চেয়ার, খাবার ঘরে পাতা হয়েছে এরকম টেবল চেয়ার । পপি আর যে লোকটি খানিক আগে গ্যালন জগ বের করছিল তারা দু'জনেই বসেছে সেই টেবলের চার পাশে বসেছে পপির সঙ্গে যে এসে পৌঁছেচে সেই বেনবোও, টেবলের মাঝখানে জ্বলছে তেলের ল্যাম্প । এবারে থালাভর্তি রান্নাকরা মাংস নিয়ে যুবতী ঢুকল খাবার ঘরে, থালাটা টেবলের এক ধারে নামিয়ে বাড়তি প্লেট আর কাঁটা চামচ বের করে নামিয়ে রাখল বেনবোর সামনে ।

ঠিক তখনই এক টাক মাথা বেঁটে খাটো বুড়ো লোককে ধরে ধরে ভেতরে এসে ঢুকল গুডউইন । মাংসহীন রোগা ফ্যাকাসে মুখ, পাক ধরেছে দু'দিকের রগে, দাড়ি না কামানোর ফলে কালচে ছোপ ধরেছে দু'গালে । বেঁটে টাক মাথা বুড়ো লোকটার মুখের পাকা দাড়ি তার বুক ছুঁয়েছে । কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বেনবো বুঝতে পারল লোকটা অন্ধ আর কালা । সবার মত যুবতী বুড়ো লোকটির থালাতেও রান্নাকরা মাংস আর পাঁউরুটি কেটে কেটে পরিবেশন করল, অন্ধ লোকটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাংস তুলে পরিতৃপ্তি সহকারে চুষে চুষে খেল অনেকক্ষণ ধরে । খাওয়া শেষ হতে গুডউইন বুড়ো অন্ধ লোকটাকে আগের মতই ধরে ধরে বেরিয়ে গেল আবার ঘর ছেড়ে ।

খাওয়া শেষ করে সবাই আগের মত বারান্দায় এসে জমিয়ে বসল । এঁটো বাসনপত্র রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে যুবতী এবারে নিজের খাওয়া সারল । এঁটো বাসন গুলো ধুয়ে ল্যাম্পের আগুন থেকে সিগারেট ধরিয়ে তারিয়ে তারিয়ে টানল সে অনেকক্ষণ ধরে, তারপর ফিরে এল হলে, বারান্দায় না গিয়ে দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে ওপাশে বসা সবার কথাবার্তা শুনতে লাগল কান খাড়া করে ।

খোলা জানলার ওপাশে সে আঙ্গুর ঝোপ আর তার লাগোয়া বন পরিষ্কার চোখে পড়ত ক্ষনিক আগে যে লোকটি এসে মেঝের কাঠ তুলে গ্যালন জগ বার করেছে তার গলা স্পষ্ট ভেসে এল । তেমনই শীতের সময় চোখে পড়ত হ্যামক জাহাজের ঝোলানো বিছানা । এজন্য আমরা জানি প্রকৃতি হল মেয়ে মানুষ ।

বেনবোর গলা ভেসে এল যুবতীর কানে তেমনই শীতের সময় চোখে পড়ত হ্যামক জাহাজে অথবা দু'টি গাছে বাঁধা ঝোলানো শয্যা । আর হ্যামক যানে একটাই ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে — দু'টো গাছের মজবুত করে টাঙ্গানো সূতির বিছানায় নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ দু'টি নরনারী বয়স তাদের যতই হোক না কেন । আর ঠিক এই কারনেই প্রকৃতি যে মেয়েমানুষ সেকথা আমাদের আলাদা করে বলেদেবার দরকার হয় না । কাঁচা আঙ্গুরকে যা পাকিয়ে সুমিষ্ট করে, মে মাসের শেষ নাগাদ হ্যামকের আড়ালে ফুল ফোটানোর যে বন্য উদ্দাম নেশা কাঁচা আঙ্গুরকে পাকিয়ে সুমিষ্ট করে, রাঙা গোধুলির ছরা সোনা আলোয় মে মাসের শেষাশেষি সেই যেন নাম ধরে ডেকে আমায় বলত ' ও হোরেস, শুনতে পাচ্ছো ?' রূপসী তরুণীর নরম গলায় নাম ধরে ডেকে আমায় বলত, ' ও হোরেস, শুনতে পাচ্ছো ? যা আসলে বুনো আঙ্গুরের মর্মরধ্বনি ছাড়া কিছু নয় ।' বুঝলে কনে দেখা সাঁঝের আলোয় সাদা পোষাকে তাদের দু'জন

যেমন বিনীত তেমনই হুঁসিয়ার সেই সঙ্গে খানিকটা অধৈর্যও ।

'তা ও আজ সকালে না; চারদিন আগের কথা বলছি; ও স্কুল থেকে রওনা হয়েছিল বেস্পতিবার, তারপর আজ ছিল মঙ্গলবার।' আমি বললাম, 'সোনামণি, ট্রেনের ভেতরে প্রেমিকের সঙ্গে তোমার দেখা হলে সে সম্ভবত রেল কোম্পানীর সম্পত্তি হত, তুমি ওকে রেল কোম্পানী থেকে কখনোই হাতিয়ে নিতে পারতে না ।'

'ও তোমারই মত ভাল লোক ও টুলানে যায় ।'

'যেতে পারে সোনা,' 'আমি বললাম, তবে ট্রেনে চেপে ।'

'ট্রেনের চেয়েও বাজে জায়গায় আমি ওদের দেখেছি ।'

"আমি জানি" আমি বললাম, "কিন্তু ওদের বাড়িতে ফিরিয়ে এনোনা বুঝলে? ওদের জুতোর নিচে রেখে যা বলার বলো । দেখো তাই বলে নিজের জুতো যেন নোংরা কোরনা ।"

'ডিনার খেতে তখনও দেরি ছিল, আমরা লিভিং রুমে বসেছিলাম; শুধু আমরা দু'জনে । রূপবতী গিয়েছিল শহরে।'

"কে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে না আসে তা জেনে তোমার দরকারটি কি ? তুমি আমার বাবা নও, তুমি শুধু - শুধু- "

"কি ?" আমি বললাম "তুমি কি বলছ ?"

"তাহলে মাকে বলো সে কথা । ওকে বলে দাও এটা তোমায় করতেই হবে । মাকে বলে দাও ।"

"কিন্তু জেনে রাখো" আমি বললাম, "ঐ ছোঁড়া যদি কোনও হোটেলে তোমার কামরায় ঢোকে তাহলে আমি তাকে ঠিক খুন করে ফেলব, কিন্তু ট্রেনে এখন ভীষণ খারাপ লাগছে । এখনকার মত তাহলে ওর কথা বাদ দিয়ে আবার শুরু করা যাক ।" "তুমি হলে যাকে বলে একটি চিজ । ট্রেনে যাবার সময় বেছে বেছে একেকটা প্রসঙ্গ তুলবে । সত্যিই তোমার জবাব নেই ।"

"ওর মাথায় ছিট আছে ।" দরজার ওপাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে নিজের মনে মন্তব্য করল যুবতী ।

তারপর মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল, না ! না! বলে । দু'হাতে আমায় জাপটে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল । 'হোরেস ! হোরেস ! কি করছ , আমি এ চাইনি। আমি একবার ও এসব করতে বলিনি ।' মেয়েটার ঠিক মাথার পেছনে টাঙ্গানো আয়নার কাচে ওর কান্না ভেজা মুখের ছবি স্পষ্ট ফুটে উঠল, সেই সঙ্গে একরাশ নিহত ফুলের গন্ধ এল নাকে । আয়না একটা ছিল আমারও পেছনে, তার কথা আমার মনে ছিলনা । এ বারে দেখলাম সে উঁকি দেবার ঢংয়ে আমার পেছনের সেই আয়নার কাচে নিজের মুখ দেখছে, কিন্তু ক্ষনিক আগে কান্নায় ভেঙ্গে তার চাউনি দেখে এই মুহূর্তে তাকে নিবিড় ছলনার এক প্রতিমূর্তি বলে মনে হচ্ছে । প্রকৃতিকে নারী আর প্রকৃতিকে পুরুষ কেন বলা হয় তা এখন বুঝতে পারছি; প্রগতি হল আমার দেখা আঙ্গুর বন আর প্রগতি হল রেলের

কামরার এই আয়না । " ওর মাথায় ছিট আছে," দরজার ওপাশে দাঁড়ানো যুবতী কথাগুলো শুনে নিজের মনে মন্তব্য করল । একদম ছিটেল ।

" গোড়ায় ভেবেছিলাম হয় গরমকাল নয়ত তেতাল্লিশ বছরে পা দিয়েছে বলে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি । মনে হল কিছুক্ষণ পাহাড়ের ওপরে গা এলিয়ে শুয়ে থাকলে তবে সুস্থ হব । আমার মনে হচ্ছিল একটা পাহাড় পেলে বেঁচে যাই; আর যে চ্যাংড়া ছুঁড়ির কথা বলছি ও কিন্তু আমায় তাতায়নি , বুঝলে ত ? কেন তেতে উঠেছিল জানো ?"
" এ লোককে লীর ভেতরে নিয়ে আসাই— " দরজার ওপাশে দাঁড়ানো যুবতী আবার নিজে মন্তব্য করল ।

ওপাশে এক জনেরও মুখে টুঁ শব্দটি নেই, বেনবো বলতে লাগল, " রুজ মাখানো একফালি ন্যাকড়া আমায় তাতিয়ে তুলেছিল । ঐ ছুঁড়ির কামরায় ঢোকার আগেই ওটার হদিশ পাব তা আমি ঠিকই জানতাম । আর ভেতরে ঢুকে তাই পেলাম, আয়নার পেছনে দলা পাকিয়ে গোঁজা । আসলে ওটা ছিল রুমাল যা দিয়ে ও মুখ গাল নয়ত ঠোঁটের বাড়তি রং টুকু মুছে রেখে দিত ম্যান্টেলের পেছনে । ওটা তুলে নিয়ে আমার জামা কাপড়ের ব্যাগে ঢোকালাম । টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে । একটা ট্রাক আমায় খানিক দূর এগিয়ে দিল । আমার সঙ্গে একটা পয়সাও ছিল না, একটা চেক ভাঙানোরও অবস্থা তখন ছিল না । ট্রাক থেকে নেমে শহরে ফিরে গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আসা তখন আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা । উপায় না দেখে তাই আমি এরপরে হাঁটতে শুরু করলাম । করাত কলে গাদা করে রাখা কাঠের গুঁড়োর ওপর শুয়ে প্রথম রাত কাটল, দ্বিতীয় রাতটা কাটল এক ব্যাটা নিগ্রোর কাঠের কেবিনে শুয়ে, তৃতীয় রাতটা কাটল রেলের সাইডিং-এ রাখা মালগাড়ির কামরায় । পাহাড়, বুঝলে আমি শুধু শোবার মত একটা পাহাড় চেয়ে ছিলাম, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যেত । নিজের বউ এর পাশে যখন শোও, তখন তোমায় একদম গোড়া থেকে শুরু করতে হয়, যাকে বলে কেঁচে গণ্ডুষ । আর অন্যের বউ এর পাশে যখন শোবে তখন ব্যাপারটা দাড়াবে পুরোপুরি অন্যরকম । হয়ত সেখানে দশ বছর পিছিয়ে গিয়ে শুরু করতে হবে, হয়ত অন্য কারও কেঁচে গণ্ডুস থেকে শুরু করতে হবে । তা যা বলে ছিলাম, কিছুক্ষণ গড়ানোর জন্য একটা পাহাড় আমার বড্ড দরকার হয়েছিল ।

' গাধা ' দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে যুবতী আবার নিজের মনে মন্তব্য করল ' শুধু মাথায় ছিট আছে তাই না সেই সঙ্গে ও একটা আস্ত গাধা।' ঠিক তখনই পপি এসে ঢুকলো ভেতরে, একটি কথা না বলে যুবতীর পাশ কাটিয়ে সে চলে গেল বারান্দার দিকে ।

' এসো' বেনবোর গলা আবার যুবতীর কানে এল । 'চলো এটা লোড্ করে নিয়ে আসি ।' তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের তিন জনের চলে যাবার আওয়াজ যুবতী স্পষ্ট শুনতে পেল । খানিক বাদে বেনবো ফিরে এল । বারান্দা পেরিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো । যুবতী ঘাবড়ে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ।

তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেনবো বলল, " এভাবে বেঁচে থাকতে তোমার ভাল লাগে ? কেন এভাবে বেঁচে আছো, কি পাও এর মাঝে ? তোমার বয়স এখনও কম, ইচ্ছে করলে শহরে গিয়ে আরও ভালভাবে জীবন কাটাতে পারো । " যুবতী জবাব না দিয়ে আগের মতই দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দু'হাত বুকের ওপর আড়া আড়ি ভাবে ভাঁজ করে নিজের মনে বলল ।

' বোকা গাধাটা ঘাবড়ে গেছে । '

' বুঝলে' বেনবো বলল, ' আমার সাহস নেই । ঐ বস্তুটি আমায় ছেড়ে বহুদিন আগেই চলে গিয়েছিল । যন্ত্রপাতি সব এখানে ঠিক ঠাক আছে, কিন্তু তা চালু করা যাবে না । যুবতীর গাল আর চিবুক সে আলতো করে ছুঁল, বলল ' তোমার বয়স এখনও কম, যাকে বলে একদম ছেলে মানুষ ।' যুবতী একটুও নড়াচড়া না করে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল, বেনবোর হাতের আঙ্গুল যেন তার মুখের চামড়া, পেশী, হাড় মাংস ছুঁয়ে ভেতরের হাড়ের গড়ন পরখ করতে চাইছে ।

' সত্যি বলতে কি গোটা জীবন পরে আছে তোমার সামনে,' বলল বেনবো । 'বয়স ত ত্রিশও পেরোয়নি ।' তার কথাগুলো ফিসফিস করার মত শোনালো ।

' নিজের বউকে ছেড়ে চলে এসছো কেন ?' এতগুলো প্রশ্নের পরে গলা না নামিয়ে স্বাভাবিক সুরে জানতে চাইল যুবতী; আগে যেখানে ছিল এখনও ঠিক সেখানেই সে দাঁড়িয়ে । দু'হাত আড়া আড়ি ভাবে দু'টি স্তনের ওপর রাখা ।

' ও কুচো চিংড়ি খেত তাই, ' বেনবো বলল, ' এর বদখদ গন্ধ আমার মোটেও বরদাস্ত হয় না । সেদিনটা ছিল শুক্রবার, বুঝলে ? দুপুর বেলা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন থেকে কুচোচিংড়ির বাক্সটা নামিয়ে একবার এহাতে আর একবার ওহাতে নিয়ে একশো পা গুনে ওটা কিভাবে বাড়ি ফিরে আসব তাই ভেবেছিলাম , আর ওটা —

' এ কাজটা তোমায় রোজই করতে হত ? ' জানতে চাইল যুবতী ।

' না, হপ্তায় একদিন,' বেনবো বলল ' শুধু শুক্রবার । আমাদের বিয়ের পরে গত দশ বছর ধরে আমি এটা করে আসছি । এত দিন হয়ে গেল তবু কুচোচিংড়ির গন্ধ আজও আমার নাকে অসহ্য ঠেকে তবে নিজে না খেলেও কুচোচিংড়ি বোঝাই বাক্সটা বাড়ি বয়ে নিয়ে আসতে আমার অসুবিধা হয় না, গোটা বাক্সের ভেতর থেকে বরফের জল ঝরে ফোঁটায় ফোঁটায় । বাড়ি যেতে যেতে মনে হয় আমার ভেতরের ' আমিটা ' শরীরের বাইরে বেরিয়ে হোরেস বেনবোকে এক ভাবে দেখছে । দেখছে আমাকেও যে তার পেছন পেছন যাচ্ছে আর ভাবছে এখানে মিসিসিপির এই ফুটপাতে কুচোচিংড়ির দুর্গন্ধের ওপরে শুয়ে আছেন হোরেস বেনবো ।'

ওঃ, বলে যুবতী শ্বাস নিল। স্তনের ওপর থেকে হাত সরিয়ে এগিয়ে গেল। বেনবো তার পেছন পেছন এগোল। রান্না ঘরে এসে ঢুকল দুজনে, সেখানে অনেকসময় ধরে একটা ল্যাম্প জ্বলছে। সাজগোজ না করে এভাবে আছি বলে কিছু মনে করবেন না যেন ' বলে যুবতী উনোনের পেছন থেকে একটা বাক্স টেনে বের করে এনে তার

উপরে উঠে দাঁড়াল । দু'হাত পকেটের ভেতরে লুকানো । বেনবো ততক্ষনাৎ রান্না ঘরের মাঝ খানে এসে দাঁড়িয়েছে ।

'পাছে কখন ইদুঁর এসে কামড়ে দেয় সেই ভয়ে ওকে এই বাক্সের ভেতরে রাখছি,' বলল যুবতী ।

' কি, কার কথা বোলছো? ' বুঝতে না পেয়ে বেনবো ঝুঁকে উকি দিয়ে দেখল বাক্সের ভেতরে পুরু কাপড়ের গদিতে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে বছর খানেকের একটা বাচ্চা ছেলে ।

' ওঃ,' বলল ' বেনবো তোমার ছেলে বলে দুঃখ দারিদ্র পীড়িত সেই ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে কিছুক্ষন এক ভাবে সে তাকিয়ে রইল । যুবতী নিজেও তাকিয়ে রইল তার সন্তানের মুখের দিকে । খানিক বাদে পেছনের বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হতেই যুবতী হাঁটু দিয়ে ঠেলে বাক্সটা রান্না ঘরে এক কোনে সরিয়ে দিল । আর ঠিক তখনই গুডউইন ভিতরে ঢুকল ।

' ঠিকআছে,' বেনবোকে লক্ষ করে বলল গুডউইন, ' টমি তোমার ট্রাক পর্যন্ত এগিয়ে দেবে, এটুকু বলে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল ।

বেনবো তাকাল যুবতীর দিকে, যার দুহাত তখনও পোষাকের ভেতরে 'খাওয়ানোর জন্য ধন্যবাদ, ' বলল বেনবো, ' হয়ত কোন এক দিন জেফারসনে আমিও তোমার জন্য কিছু করব এর বিনিময়ে তোমার কাজে লাগবে এমন কিছু হয়ত পাঠিয়ে দেব......

পাহাড়ের উপরে সেই বাড়ি থেকে কৃষ্ণাঙ্গ টমি বেনবোকে জঙ্গলের ভেতরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সমতলে । জঙ্গলের বাইরে সড়কের ধারে ট্রাকটা যেন তাদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, দুজন লোক মাডগার্ডে বসে সিগারেট টানছে, আগুনের স্বল্প আভায় তাদের মুখের অল্পই দেখা যাচ্ছে । ওপারে গাছের ঘন ডালপালার ওপাশে অনেক দূরে জ্বলছে রাতের তারারা ।

'একটু জোরে পা চালিয়ে আসতে কি হয় ? লোকদু'টোর মধ্যে একজন টমিকে খেঁকিয়ে উঠল, ' এতক্ষণে আমি শহরের আদ্ধেক পথ পৌছে যেতাম । ঘরেত আমারও মেয়ে মানুষ আছে, নাকি । সেত আমারই সঙ্গে বাকি রাত রাতটুকু কাটাবে বলে বসে আছে । এ কথাটুকু একবারও ভাবোনা ।'

' হ্যাঁ ' পাশ থেকে তার সঙ্গি বলল বিদ্রুপ করে, ' বসে থাকতে থাকতে সে বেচারী যে হেদিয়ে উঠেছে তা একবারও ভাবোনা ।'

' আমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যত শীগগির পারি এয়েছি,' চোখ পাকিয়ে বলল টমি । ' কিন্তু তোমরা গাড়ির সামানে একটা লন্ঠন জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে রাখোনি কেন শুনি ? আমরা পুলিসের লোক হলে তোমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে ফাটকে ঢোকাতাম সে খেয়াল আছে ?'

' থাম, কেলে ভূত ! দ্বিতীয় লোকটি খেঁকিয়ে উঠল, ' পুলিশ না হয়ে তুই লেজ

লাগিয়ে গাছে উঠে বোস্ ব্যাটা কেলে বেজন্মা । ' তার কথা শুনে একটুও না রেগে চাপা গলায় হেসে উঠল টমি । বেনবো হাত বাড়িয়ে তার হাত মেলাল; ধাপে পা রেখে চালকের কেবিনে ঢুকল বেনবো, বসতে যেতেই চালকের সঙ্গি দ্বিতীয় লোকটি একটি শটগান ঠেস দিয়ে রাখল সিটে, তার নলের ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগল বেনবোর হাতে । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন চালু হবার শব্দে রাতের সীমাহীন নিস্তব্ধতা ভেঙ্গেচুরে সড়ক ধরে ট্রাক জেফারসন হয়ে মেফকিস শহরের দিকে ছুটে চলল ।

জেফারসন টাউন থেকে চার মাইল দূরে বেনবোব বিধবা বোনের শ্বশুর বাড়ি, পরদিন বিকেলে সে এসে হাজির হল সেখানে । পেল্লাই শ্বশুর বাড়িতে নিজের দশ বছরের ছেলে আর জেঠি শাশুড়ির সঙ্গে থাকে বেনবোর বোন । দৈহিক অক্ষমতার জন্য বোনের জেঠি শাশুড়িকে হুইল চেযারে বসেই কাটাতে হয়, এলাকার সবাই তাঁকে ডাকে মিস জেনি বলে । সূর্য ডুবতে এখনও দেরি আছে । ড্রইংরুমের খোলা জানালার সামনে হুইলচেয়ারে বসে মিস জেনি । খনিক বাদে বেনবো এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে । খোলা জানালার ওপাশে বাগানে অল্প বয়সী এক যুবকের সঙ্গে গল্প করতে করতে হালকা পা ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেনবোর বোন । দশ বছর হল সে বিধবা হয়েছে ।

' স্বামী মরার পরে ও আবার বিয়ে করলনা কেন তাই ভেবে পাই না,' বোনের উদ্দেশ্যে বলল বেনবো ।

' কথাটা আমিই তোমায় বলব ভাবছিলাম,' পাশ থেকে বললেন মিস জেনি, 'বিধবা হোক বা নাই হোক মরদ না হলে জোয়ান মেয়ে মানুষের দিন কাটে না ।'

বেনবোর বোনের পাশে যে ছেলেটি হাঁটছে তার পরনে সূতির ট্রাউজার্স, গায়ে তার নীল কোট । হয়ত মোটা সোটা গড়ন হবার ফলেই পা ফেলছে হাম বড়াই ঢং-এ, ছেলেটিকে দেখলে এখনও কলেজে পড়ে বলে মনে হয় ।

'ছেলেটিকে চিনতে পারছো ?'

মিস জেনি বলল, ' ও হল গাওয়ান স্টিভেনস, নামটা মনে ঠেকছে ?'

' হ্যাঁ' বলল বেনবো। ' এবারে মনে পড়েছে, গেল বছরের অক্টোবরেও ওকে এখানে দেখে ছিলাম । ' ' তার মনে পড়ল গত বছর অক্টোবর মাসে এপথ ধরে যাবার সময় এক রাতের জন্য ও এখানে বোনের শ্বশুরবাড়িতে উঠেছিল । সেদিনও অক্টোবরের বেলা শেষের বিকেলে সে বোনের সঙ্গে একেই এই বাগানে পাশাপাশি হাঁটতে দেখেছিল, তবে সেদিন ছেলেটির গায়ে ছিল বাদামি রং-এর কোট । হ্যাঁ আজকের মত সেদিনও মিস জেনি তার পাশে হুইল চেয়ারে বসেছিল ।

" গাওয়ানকে তোমার মনে রাখার কথাও না," বললেন মিস জেনি, ' তুমি যখন জেফারসন ছেড়ে চলে গেলে ও তখনও বিছানায় হিসি করছে ।'

' আস্তে,' চোখ পাকিয়ে মিস জেনিকে হুঁসিয়ার করল বেনবো, ' আমার কথা

যেন শুনতে না পায় ।’

বেনবো, ‘ আমার বোনের কানে যেন না যায় ,’ তার কথা শেষ হবার খানিক বাদেই গাওয়ানকে সঙ্গে নিয়ে বেনবোর বোন এসে ঢুকল ড্রইং রুমে, মিস জেনি হাত বাড়িয়ে দিতে গাওয়ান ঝুঁকে তাতে চুমু খেল ।

‘ দেখতে যেমন সুন্দর হচ্ছেন,’ মিস জেনির দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বলল গাওয়ান তাতে মনে হয় বয়স রোজ একবছর করে কমছে । নারসিসাকে ক্ষনিক আগে বলছিলাম, ‘ ঐ বদখত হুইল চেয়ারটা বরবাদ করে একবার উঠে দাঁড়ালে নারসিসার বদলে আমি আপনার সঙ্গেই প্রেম করতাম ।’

হোরেসের বিধবা বোন নারসিসার শরীরের গড়ন একটু ভারি তার চুলের রং ঘন কালো । চওড়া মুখখানা দেখলে বোকা মনে হলেও আসলে তা নির্মল প্রশান্তিরই অন্য রূপ। নারসিসার পরনে এখন ঘরোয়া ঢোলা সাদা পোষাক ।

হোরেস ভাই-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল নারসিসা, ‘ এ হল গাওয়ান, গাওয়ান স্টিভেনস, আর গাওয়ান এ আমার ভাই হোরেস ।’

‘ কেমন আছেন বলুন,’ বলে বেনবোর সঙ্গে করমর্দন করল গাওয়ান । ঠিক তখনই বেনবোর ভাগ্নে সারটোরিস এসে ঢুকল ঘরে ।

‘ এই যে, তোমারই কথা ভাবছিলাম,’ ছোট ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল গাওয়ান ।

‘ জানোত মামা,’ বেনবোকে তার ভাগ্নে বলল ‘ গাওয়ান ভার্জিনিয়ায় পড়াশোনা করছে ।’ হ্যাঁ, সায় দেবার ঢং-এ বলল বেনবো ‘ আমিও তাই শুনেছি ।’

‘ ধন্যবাদ ’ গাওয়ান বলল, ‘ কি আর করব বলুন সবাই ত আর হার্ভাডে গিয়ে পড়াশুনা করতে পারে না ।

‘ ধন্যবাদ,’ বেনবো বলল ‘ আমি অক্সফোর্ডে ছিলাম।’ গাওয়ান নিজেও ত প্রায়ই অক্সফোর্ডে যায়। বেনবোর ভাগ্নে বলল ‘ ওখানে ওর একজন ‘ ইয়ে ’ আছে, ওখানে গেলেই গাওয়ান তাকে নাচের আসরে নিয়ে যায় । গাওয়ান, ঠিক বলেছি কিনা ?’

‘ ঠিকই বলেছো হে ভোঁদা চন্দর,’ গাওয়ান লাজুক হেসে বলল । ‘ এতখানি যখন বললে তখন ওর চুলের রং লাল সেকথা চেপে গেলে কেন ?’

‘ কি হচ্ছে তোমাদের ?’ ছেলে আর প্রণয়ীকে চোখ পাকিয়ে ধমক দিল নারসিসা, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ভাইকে বলল ‘ এবারে তোমার খবর কি বলো, বড় গিন্নি আর ছোট গিন্নি কেমন আছে ?’ আরও কিছু বলতে গিয়ে সে কি ভেবে চুপ করে গেল । তারপর গম্ভীর মুখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল ভাইয়ের মুখের দিকে ।

‘ যদি তুমি ভেবে থাকো ও গিন্নিকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে,’ বললেন মিস জেনি, ‘ তাহলে একদিন না একদিন ও ঠিকই পালাবে । কিন্তু নারসিসার মন তাতেও ভরবেনা। কিন্তু মেয়ে আছে যার তাদের ভাই বন্ধু বিশেষ কোনও মেয়েকে বিয়ে করে ঘর সংসার করুক তা চায় না । কিন্তু সেই পুরুষটি তার গিন্নিকে ছেড়ে সত্যিই পালিয়ে এলে

দুনিয়ার সব মেয়ে মানুষ একসঙ্গে ক্ষেপে ওঠে ।'

' ঢের বাজে বকেছেন,' জেঠি শ্বাশুড়ির দিকে অপ্রসন্ন চাউনি হেনে নারসিসা বলল, ' এবারে দয়া করে চুপ করুন ।'

বেনবো দাঁড়িয়েছে মিস জেনির হুইলচেয়ারের ঠিক পেছনে দু'হাতে দু'দিকের হাতল ধরে । চেয়ারটা ঠেল নিয়ে যেতে তাকে সাহায্যে করতে গাওয়ান এগিয়ে আসতে বেনবো বাধা দিয়ে বলল ' আমি আজ এবাড়ির অতিথি, তাই একাজটা আমাকেই করতে দিল । আপনি অনুগ্রহ করে আমায় সাহায্য করতে আসবেন না ।'

' এই সেরেছে ।' হাসি মাখা গলায় বললেন মিস জেনি ।

' এ ত দেখছি আমার চেয়ার কে ঠেলবে তা নিয়ে দু'জনে ' ডুয়েল' না লড়ে ছাড়বে না । নারসিসা, ছাদে চলে যাও, ওখানে চিলেকোঠার সিন্দুক ঘাঁটলে সাবেক কালের এক জোড়া ডুয়েল পিস্তল ঠিক পাবে, পিস্তলের গুলিও ওখানেই আছে । ও দু'টো নিয়ে চটপট চলে এসো ।' নারসিসার ছেলের দিকে তাকিয়ে মিস জেনি বললেন 'এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে বাড়ির কাজের লোকেদের ডেকে ডুয়েলের বাজনা বাজাতে বলো গে, আর এক জোড়া গোলাপ ওদের তৈরী রাখতে বলো ।'

' কিসের বাজনা বাজাতে বলব জেঠি ?' জানতে চাইল নারসিসার ছেলে ।

' আমার টেবলে অনেক গোলাপ আছে,' নারসিসা বলল, ' ওগুলো গাওয়ান কিনে পাঠিয়েছে । দেরি না করে এবারে খাবেন চলুন ।'

গাওয়ান স্টিভেনসের সঙ্গে নারসিসা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে । নারসিসার পরনে সেই এক ঢোলা সাদা পোষাক । গাওয়ানের পরনেও সূতির ট্রাউজার্স, গায়ে গাঢ় নীল কোট । ড্রইংরুমের খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে বেনবো আর মিস জেনি তাকিয়ে আছে তাদের দিকে ।

' গাওয়ান বেশ মজার কথা বলতে পারে,' বললেন মিস জেনি, ' সে রাতে খেতে বসে কেমন মজা করছিল মনে আছে ? সেই যে ভার্জিনিয়া থাকার সময় ও শিখেছিল একটা ছারপোকাকে অ্যালকোহলে ছেড়ে দিলে সেটা গুবরে পোকা হয়ে যায় । তেমনই মিসিসিপির কোনও গাঁইয়াকে অ্যালকোহলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে সে আর গাইয়া থাকে না, আস্ত ভদ্রলোক হয়ে যায় । তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল নারসিসা তবে গাওয়ানের বদলে পেছনে পেছনে এসে ঢুকল ছেলে ।

' গাওয়ান আর থাকতে পারবে না,' বলল নারসিসা, ' ওকে আজ অক্সফোর্ড যেতেই হবে । এই শুক্কুরবার রাতে ইউনিভার্সিটিতে এক নাচের সময় ওকে যেতেই হবে, এক সুন্দরীর সঙ্গে ওর এনগেজমেন্ট আছে ।'

' ছেলেটা মদ গিলতে পারে বটে,' বলল বেনবো, ' ওখানে ভদ্রসমাজে ভদ্রলোকদের মত মদ গেলার এন্তার সুযোগ পাবে, আমার মনে হয় তাই ও এত আগে

ওখানে পাড়ি দিল '।

' সুন্দরী না হাতি,' বলল নারসিসার ছেলে, ' আমি জানি গাওয়ান একটা বুড়ির সঙ্গে নাচবে । আসলে এই শনিবার স্টার্কভিলে বেসবল ম্যাচ আছে, ও সেখানেই যাবে । ও আমাকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিল । কিন্তু তুমি ত আমায় ওর সঙ্গে যেতে দিল না ।'

রাতে খাওয়ার পাট চুকিয়ে শহরের বাসিন্দা নয়ত স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্ররা যখন বেড়াতে বেরোয় তখন সে সুশ্রী যুবতীটিকে মেয়েদের ডর্মিটরির ধারে তাদের চোখে পড়ে তার নাম টেম্পল । শহরের বাসিন্দারা রাতে বেলায় বেড়াতে বেরোন গাড়ি চেপে, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিজের গাড়ি চালানোর অনুমতি দেয়া হয় না । শনিবারের রাতে লেটার ক্লাবের নাচের আসরেও টেম্পলকে চোখে পড়ে, বাজনার আওয়াজ আর মদের গ্লাসের ঠোকাঠুকি যখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তখন সরু কোমর দুলিয়ে কোনও পার্টনারের সঙ্গে তাকে নাচে মেতে উঠতেও অনেকেরই চোখে পড়ে ।

নাচগানের পালা শেষ হতে হতে রাত কেটে গেল, ভোরের আলো আকাশে তখনও ফোটেনি এমন সময় টেম্পলের হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এল গাওয়ান স্টিভেনস। গাড়ির দরজা খুলে সামনে চালকের আসনে পাশাপাশি দু'জনে । তিনজন ছাত্র এতক্ষণ কাছেই দাঁড়িয়েছিল, গাওয়ান আর টেম্পলের উদ্দেশ্যে চাপা গলায় নানা রকম রসালো মন্তব্য করছিল নিজেদের মধ্যে, গাওয়ান তাদের শহরে পৌঁছে দেবে বলে গাড়িতে তুলে নিল ।

' আমি আগে কখনও এদিকে আসিনি ' এঞ্জিন চালু করে পেছনের ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলল গাওয়ান ।

' আমার কাছে মাল যেটুকু ছিল কাল রাতেই ফুরিয়ে গেছে,' সে বলল, ' বোতল একদম খালি ভেতরে ছিটেফোঁটা কিছুই নেই । ধারে কাছে কোথায় বোতল পাওয়া যাবে বলতে পারেন ?' ' অনেক দেরি করে ফেলেছেন,' প্রথম ছেলেটি বাকি দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল, ' এসময় কোথায় মাল পাওয়া যাবে তোমরা বলতে পারো ?'

' লুক-এর ঠেকে গেলে হয়ত মিলতে পারে,' বাকি দু'জনের একজন বলল ।

' ও থাকে কোথায় ?' জানতে চাইল গাওয়ান ।

' চালিয়ে চল,' প্রথম ছেলেটি বলল, ' সময় এলে ঠিক দেখিয়ে দেব ।'

প্রায় আধ মাইল পথ পেরোনোর পর প্রথম ছেলেটির নির্দেশে গাড়ি থামিয়ে হেড লাইটের আলো নেভালো গাওয়ান । ' একটু দাঁড়ান বলে প্রথম ছেলেটি নেমে গেল গাড়ি থেকে, পাশে পাঁচিলের মত উঁচু জমি দু'হাতে খিমচে ধরে সে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে গাড়ির ভেতরে বসে স্পষ্ট দেখতে পেল গাওয়ান ।

‘ লুক-এর মাল কি খুব ভাল ?’ পেছনের দিকে না তাকিয়ে প্রশ্ন করার ঢং-এ বলে উঠল গাওয়ান ।

‘ খাসা মাল,’ তৃতীয় ছেলেটি জবাব দিল, ‘ জবাব নেই ।’

‘ পছন্দ না হলে আপনি খাবেন না ’ বলল দ্বিতীয় ছেলেটি ।

‘ আপনি বাড়িতে যে মাল গেলেন,’ তৃতীয় ছেলেটি বলল । ‘ লুপ-এর গ্যাজানো মাল তার চেয়ে কোনদিক থেকে কম সেরা নয় ।’

‘ আপনি আসছেন কোথ থেকে ?’ জানতে চাইল দ্বিতীয় ছেলেটি । ‘ ভার্জিনিয়ে জেফারসন থেকে ,’ বলল গাওয়ান, ‘ ছোটবেলায় পড়াশোনা করেছি ভার্জিনিয়ার স্কুলে। মাল কিভাবে খেতে হয় তা ওখানে হাতে কলমে শেখে সবাই ।’ হয়ত তার মন্তব্য পছন্দ না হবার জন্যই বাকি দু’জন কিছু না বলে মুখ বুঁজে রইল । আরও খানিক বাদে প্রথম ছেলেটি ফলের রস খাবার বোতল হাতে ফিরে এল । প্রথম আর দ্বিতীয় ছেলেটির পরে গাওয়ান নিজেও বোতল উঁচু করে গলায় ঢালল, খেল না শুধু তৃতীয় ছেলেটি ।

‘ এই আপনাদের লুক-এর সেরা মাল ?’ বিতৃষ্ণা আর অতৃপ্তি মেশানো গলায় বলল গাওয়ান, এই রদ্দি মাল আপনারা তারিয়ে তারিয়ে খেলেন কি করে ?’

‘ আমরা ভার্জিনিয়ায় পড়াশোনা করিনি,’ তৃতীয় ছেলেটি রাগ রাগ গলায় বলল, ‘ তাই মাল কিভাবে খেতে হয় কেউ আমাদের হাতে কলমে শেখায় নি ।’

‘ অ্যাই উল্লুক মুখ বুজে থাক,’ দ্বিতীয় ছেলেটি ধমকে উঠল , ‘ একটা কথাও বলবি না বলে দিচ্ছি । কিছু মনে করবেন না ,’ গাওয়ান ঘাড় ফিরিয়ে অসন্তুষ্ট চোখে তৃতীয় ছেলেটিকে দেখছে দেখে সে বলল, ‘ আসলে কাল সারা দিন সারা রাত ও বেচারার পেট কামড়েছে কিনা, তাই মেজাজ গেছে বিগড়ে । দোহাই, আপনি কিছু মনে করবেন না । এই নে, দু’ঢোক মাল গলায় ঢেলে নে,’ বলে হাতে ধরা বোতলটা তৃতীয় ছেলেটির দিকে সে এগিয়ে দিল ।

‘ নাঃ নাঃ মাল খেতে আমার ভারি বয়ে গেছে।’ বলে তৃতীয় ছেলেটি খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল ।

শহরে ফিরে ছেলে তিনটের সঙ্গে এক ছোট রেস্তোরাঁয় ঢুকল গাওয়ান, কোকাকোলার সঙ্গে লুক-এর তৈরী চোলাই মদ মিশিয়ে খেল অনেকক্ষণ ধরে । অনেকটা নেশা হবার পর গাওয়ান ছেলে তিনটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এসে বসল গাড়িতে, নেশা আর প্রচন্ড ক্লান্তিতে তার হাত পা তখন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়তে চাইছে।

সকাল সোয়া ছটা বাজে । টেম্পলকে পাশে নিয়ে ঘন্টায় চল্লিশ মাইল বেগে আবার গাড়ি চালাতে লাগল গাওয়ান । খানিকদূর যাবার পরে টেম্পল টের পেল গাওয়ান বড্ড বেসামাল হয়ে গাড়ি চালাচ্ছে ।

‘ অ্যাই ধেড়ে শুয়োরের বাচ্ছা ।’ পাশে বসা গাওয়ানের জামার দোমড়ানো

কলার দু'হাতে চেপে ধরে তার কানের কাছে মুখ এনে বলতে লাগল টেম্পল। ' তুমি বড্ড বেশি নেশা করে ফেলেছ । তোমার সঙ্গে যেতে আমার আর একটুও ভরসা হচ্ছে না । ভাল চাও ত এক্ষুণি আমাকে অক্সফোর্ডে আমার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে চলো, নইলে ফল ভাল হবে না বলে দিচ্ছি ।'

কিন্তু তার হুঁসিয়ারিতে কান না দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল গাওয়ান । আরও কিছুদূর যাবার পরে রাস্তায় এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত পরে থাকা বিশাল গাছটাকে দেখতে পেল টেম্পল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই নেশায় মত্ত গাওয়ান গাড়ি নিয়ে প্রবল বেগে ধাক্কা মারল সেই গাছে, থমকে গিয়ে পিছিয়ে এসে প্রানপনে সে আবার ধাক্কা মারল গাছে, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা উল্টে পড়ল একপাশে । কি ঘটেছে বুঝে ওঠার আগেই একদিকের দরজা গেল খুলে আর সেই খোলা দরজা দিয়ে টেম্পল ছিটকে পড়ল বাইরে। নিজেকে সামলে নেবার আগেই টেম্পল দেখল খড়ের টুপি মাথায় ঢোলা জামা পরা একটা লোক সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে । লোকটার মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ আর হাতের মুঠোয় ধরা বন্দুক টেম্পলের নজর এড়াল না । লোকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে গায়েব ব্যাথা উপেক্ষা করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সে, ছুটে পালাতে যেতেই লতাপাতায় পা জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঝর্ণার জলে । ভেজা গায়ে টেম্পল উঠে বসল, দেখল ঢোলা জামা পরা সেই লোকটা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে, দাড়ি গোফওয়ালা মুখখানা ঝুঁকিয়ে লোকটা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে । আরেকটা লোক ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে উল্টে যাওয়া গাড়িটার ধারে, উল্টে যাবার পরে তার এঞ্জিন তখনও চালু আছে, ঝর্ণার পাশে বালুর ওপরে অসহায়ে ভাবে পড়ে থেকে সেই আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল টেম্পল । খনিক বাদে সেই আওয়াজ থেমে যেতে সে বুঝল এঞ্জিন থেমে গেছে, কিন্তু গাড়ির সামনের দিকের চাকা দুটো তখনও পাক খাচ্ছে ধীরে ধীরে ।

ঢোলা পোষাক পরা লোকটার পায়ে জুতো মোজা কিছুই নেই, হাতে ধরা বন্দুক খানা দোলাতে দোলাতে সে একবার ফিরিয়ে তাকাল গাওয়ানের দিকে । কেটে ছড়ে গিয়ে গাওয়ানের মুখ রক্তে মাখামাখি, পরনের জামা কাপড় ঝর্ণার জল কাদায় ভিজে সাৎসাৎ করছে । ওদিকে পায়ে হাইহিল জুতো থাকায় টেম্পলের হয়েছে মুসকিল। ঐ জুতো পায়ে অনেক চেষ্টা করেও সে বালুর ওপরে উঠে দাঁড়াতে পারছে না ।'

' উঠতে পারছোনা, কেমন ?' বন্দুক হাতে দাড়িওয়ালা লোকটা টেম্পলকে বলল, ' এক কাজ করো তোমার ঐ হাইহিল জুতো দুটো আমার হাতে দাও তারপরে দেখবে খালিপায়ে বালুর ওপরে উঠে দাঁড়াতে কোনও কষ্ট হবে না । খানিক ইতস্তত করে টেম্পল পা থেঁকে জুতো জোড়া খুলে তুলে দিল লোকটার হাতে ।

'দেখি একবার হাতে নিয়ে কেমন বাহারী জিনিস,' বলতে বলতে লোকটা পরম

আগ্রহে সেই জুতো জোড়া নিজের হাতে নিল । বাঁধা চামড়ার ফিতের ফাঁসে ডান হাতের আঙ্গুল গলিয়ে বাচ্চাদের খেলনার মত পাক দিল, তারপরেই অত্যন্ত বিতৃষ্ণায় হাতে ধরা সেই জুতো জোড়ার উদ্দেশে গলা নামিয়ে অশ্লীল গালি দিল । লোকটার চেহারায় ছিরি ছাঁদ কিছু নেই, খড়ের মত গজিয়ে ওঠা চুলগুলো মাথায় চাঁদির কাছে সবে বাকতে শুরু করেছে । 'মেয়েটা ঢ্যাঙ্গা আছে বটে ।' টেম্পলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে নিজের মনে মন্তব্য করল । হাতে পায়ে হাড়ের ওপর শুধু চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই । একদম আম শুঁটকি, শুধু বাতাস খেয়ে থাকে বলেই হয়ত গতরের এই হাল, ওজন বলে কিছু নেই,' ততক্ষণ টেম্পল বালুর ওপর উঠে বসেছে । লোকটার বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে জুতো জোড়া নিয়ে সে পায়ে গলাল ।

বসে থেকে নষ্ট করার মত সময় নেই, গাওয়ান নিজেও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, টেম্পলের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'গাড়ির দরজার হয়ে গেল । চলো পায়ে হেঁটে যতদূর পারি যাওয়া যাক তারপর মাঝখানে একটা গাড়ি জোগাড় করে নেওয়া যাবে । আজ রাতের মধ্যে যে ভাবেই হোক আমায় জেফারসন-এ ফিরে যেতেই হবে ।'

দাড়ি গোঁফওয়ালা লোকটা প্যাটপ্যাট করে তার খোলা উরুর দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়ে টেম্পল পরনের সার্ট টেনে নামাল; দাঁড়িয়ে উঠে গাওয়ানকে বলল 'ফিরে যাবার কথা ত শোনাচ্ছো কিন্তু রাস্তা ঠিক ঠিক চিনে ফিরে যেতে পারবে ত ?'

সেই পরন্ত বিকেলে ঝর্ণার অদূরে সিডার কুঞ্জের ওপাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো বাড়িটা যেন সেই মুহূর্তে তাদের চোখে পড়ল । বাড়িটার আশে পাশে ক্ষেত খামার বা কামারশালা কিছুই নেই একেবারে পরিত্যক্ত ধ্বংস স্তুপের মাঝখানে বাড়িটাকে টেম্পলের সমাধি স্তম্ভের মত বলে মনে হল । ঠিক তখনই বাড়িটার দিক থেকে ধেয়ে আসা এক ঝলক বিষ বাতাসের ছোঁয়া লাগতে তার গা এক অজনা অচেনা অস্বস্থিতে শিউরে উঠল । বন্দুক হাতে লোকটা সেই বাড়ির দিকে যাবার ইশারা করতে পা বাড়িয়েও নেমে গেল টেম্পল মুখ ফিরিয়ে গাওয়ানকে বলল, 'আমি ওখানে যাব না সোনা, আমি এখানেই আছি, তুমি বরং এগিয়ে দ্যাখো ফিরে যাবার কোনও গাড়ি পাও কিনা ।'

'চলে যাবে কিগো,' লোকটা টেম্পলের উদ্দেশ্যে বলল, 'ও যে তোমাদের দুজনকেই ভেতরে নিয়ে যেতে বলেছে ।'

'কে, কার কথা বলছ ?' লোকটা কার কথা বলছে নিমেষে মনে পড়ে গেলেও তার বলার ধরনে চটে গিয়ে টেম্পল বলল, 'তোমায় ঐ কেলো কি ভেবেছে ওর কথা মত আমায় চলতে হবে ?'

'আঃ, কি হচ্ছে টেম্পল !' চাপা ধমক দিয়ে গাওয়ান বলল, 'জায়গা বুঝে মুখ সামলে কথা বলো । ঐ বাড়িতে গুডউইন থাকে, চলো ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি একটা গাড়ি পাওয়া যায় কিনা । এদিকে সন্ধেও ত হয়ে এল ।' লোকটার দিকে তাকিয়ে সে বলল 'গুডউইনের বউও ত এখানেই আছে, তাই না ?' 'থাকার ত কথা,' নিস্পৃহ গলায় লোকটা জবাব দিল । বন্দুক হাতে দোলাতে দোলাতে সে তাদের বাড়িটার দিকে

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, গাওয়ান আর টেম্পল তার পেছন পেছন এগোল । বারান্দায় উঠে লোকটা বন্দুকে চাড় দিয়ে ভেজানো দরজা খুলে ফেলল তারপর টেম্পলের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে গাওযানকে বলল, ' গুডউইনের বউ ধারে কাছেই কোথাও আছে । তোমায় ঘাবড়ানোর কিছু নেই । গুডউইন তোমার বউ এর কোনও ক্ষতি করবে না । মনে হচ্ছে লী তোমাদেব শহরে পৌঁছে দেবে । ' লোকটার কথায় এতক্ষন আশ্বস্ত হল টেম্পল । শিশুর মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ' তোমার নাম কি ?'

' নাম ?' খানিক ভেবেচিন্তে লোকটা বলল, ' নাম ত একদিন একটা ছিল, কিন্তু - যাক। আমায় সবাই টমি বলে ডাকে । সবার মুখে শুনতে শুনতে এখন ওটাই আমার নাম হয়ে গেছে টমি । তার কথা শুনে গাওয়ানের নিজেরও এবারে অস্বস্তি হচ্ছিল, হয়ত তা টের পেয়ে টমি আশ্বস্ত করার গলায় টেম্পলকে বলল, ' তোমার সোয়ামিকে বলো ওর ভয় ডরের কিছু নেই ।' হলঘরের দরজা খোলা দেখে টেম্পল ভেতরে যাবার জন্য পা বাড়াল ।

' ও কি কোথায় যাচ্ছ ?' গাওয়ান চেঁচিয়ে বলল, ' তুমি আমার সঙ্গে এখানেই অপেক্ষা করোনা কেন ?' কিন্তু কোনও জবাব না দিয়ে টেম্পল হাঁটতে হাঁটতে হলের মাঝখানে পৌঁছে গেল, গাওয়ানের বকবকানি ছাড়া যে লোকটি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে তার গলা তার কানে এল । বেলা শেষের পড়ন্ত সূর্যের আলো দরজা দিয়ে এসে ঠিকরে পড়েছে পেছনের বারান্দায় । তার ওপাশে কিছুটা তফাতে আগাছায ভর্তি খানিকটা ঢালু জমি আর একটা ভাঙ্গা চোরা পরিত্যক্ত খামার তার চোখে পড়ল। এই মুহূর্তে সূর্যের মরা আলো পরে সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত প্রশান্তি । দরজার ডাইনে একটা কোনে তার চোখে পড়ল যা হয় এবাড়ির অথবা অন্য কোনও বাড়ির অংশ কিন্তু সামনের দিক থেকে কোনও শব্দ বা কারও গলার আওয়াজ তার কানে ভেসে এল না ।

ধীর পায়ে এগোতে এগোতে এক জায়গায় এসে থামল টেম্পল, সূর্যের আলো দরজার পাল্লার গায়ে একটা লোকের টুপিহীন মাথার ছায়া চোখে পড়তে পা টিপে টিপে এগিয়ে এল টেম্পল, দেখল টাক মাথা একজন বুড়ো মানুষ তার দিকে মুখ করে বসে আছে এক গদী ছেঁড়া চেয়ারে ।

' গুড আফটারনুন,' বলে বুড়ো মানুষটিকে অভিনন্দন জানালো টেম্পল কিন্তু লোকটি পালটা অভিনন্দন না জানিয়ে মড়ার মত বসে রইল । সাহস করে আরেকটু এগোল টেম্পল, আর ঠিক তখনই বারান্দাটা যেখানে ইংরাজি এল্ বা সমকোণ তৈরি করেছে সেদিক থেকে এক টুকরো সূতোর মত খানিকটা ধোঁয়া যেন উড়ে আসতে দেখল সে । দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো থামের গায়ে বাঁধা দড়িতে ঝোলানো তিনটে ভেজা জামাও দেখতে পেল টেম্পল, কৌতূহল ভরে এগিয়ে আসতে সেই জামাগুলোর মধ্যে মেয়েদের পরার ফিকে গোলাপি রং-এর একটি অন্তর্বাসও সে দেখতে পেল । সূতির অন্তর্বাস । নিখুঁত হাতে সেলাই করা । কাপড় ছেড়ে সবে এসে চেয়ারে

বসা বুড়ো মানুষটির মুখের দিকে আবার তাকাল টেম্পল । প্রথমে তার মনে হল লোকটার দু'চোখের পাতা বোঁজা, পরমূহূর্তে সে বুঝল লোকটি অন্ধ । চোখ বলে কিছুই তার নেই, দু'চোখেরই পাতার মাঝখানে হলদেটে নূড়ির মত দুটো পাথরের চোখ বসানো । গোড়ায় সাহস করে এগিয়ে এলেও দৃষ্টিহীন ঐ বুড়ো মানুষটিকে দেখে এতক্ষণ পরে তার অস্বস্তি হল, ' গাওয়ান' বলে জোরে চেঁচিয়ে উঠল সে । ঠিক তখনই খোলা দরজার ওপাশ থেকে কথা বলা ভেসে এল, ' ও তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে না, কি চাই তোমার ?'

সঙ্গে সঙ্গে এক পাক ঘুরে বুড়ো মানুষটির দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জোর কদমে এগোল টেম্পল। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই মেঝেতে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা ছাই গাদা হয়ে ফেলে রাখা টিনের পাত্রে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, কতগুলো এঁটো মাংসের হাড়ও তার হাতে ঠেকল । ছাইগাদার মধ্যে পড়ে বসেই টেম্পল দেখতে পেল পপি এককোণে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাব দিকে । পপির দু'হাত ট্রাউজারের দু'দিকের পকেটে গোঁজা, ঠোঁটে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট । সেই ফেলে দেয়া বাতিল টিনের পাত্রগুলো আঁকড়ে ধরেই কোন মতে উঠে দাঁড়াল টেম্পল, এরপর কয়েক পা এগোতে বুঝল সে যেখানে এসে পড়েছে সেটা রান্নাঘর, এককোণে বসে এক যুবতী সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকিযে আছে তার দিকে ।

বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে ব্যাজার মুখে গাওয়ান তার কেটে ছড়ে যাওয়া নাকে হাত বোলাচ্ছে, পপি দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, দাড়ি গোঁফওয়ালা তাদের পথ প্রদর্শককে বলল, ' এখানে সং-এর মত দাঁড়িয়ে না থেকে ওকে বাড়ির পেছনে নিয়ে যাও, নাকে মুখে লেগে থাকা ধুলোমাটি আর রক্ত সাবান জল দিয়ে ধুয়ে মুছে সাফ করে দাও । জবাই করা শুয়োরের বাচ্ছা দেখেছো ? এ লোকটাকে ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে ।' বলতে বলতে আধপোড়া সিগারেট খানা জঙ্গলে সে ছুড়ে ফেলে দিল তারপর সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে হাত ঘড়ির চেইনে আটা ক্ষুদে পেনসিল কাটার ছুরি দিয়ে জুতোয় জমে থাকা শুকনো কাদা একমনে চেঁচে সাফ করতে লাগল ।

পপির হুকুম তামিল করতে পথ প্রদর্শক লোকটি গাওয়ানকে নিয়ে এল বাড়ির পেছনে । আসবার পথে দৃষ্টিহীন বুড়ো মানুষটিকে দেখিয়ে পথ প্রদর্শক বলল, ' এ হল গে আমাদের বুড়ো বাবাজী, লোকটা চোখেও দেখেনা কানেও শোনেনা ।' এক পাশে কাঠের পাটাতনের ওপর টিনের তৈরী হাত মুখ ধোবার বেসিন । তার পাশে বালতি আর সাবান রাখা ।

' হাত মুখ ধোয়া এখন থাক,' গাওয়ান চাপা গলায় বলল ' মাল আছে, মাল ?'

নেশার ঘোরে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যা কান্ডটা বাধালে, 'পথ প্রদর্শক বলল, ' তাতেও নেশা মেটেনি ? এখনই আবার গেলার জন্য হাঁকপাঁক করছ ?'

' বাজে কথা রেখে যদি কোনোও এক আধ বোতল লুকানো থাকে ত এই বেলা বের করো, ' গাওয়ান বলল ।

' আমার হয়ত একটু থাকতে পারে ।' লোকটা বলল । ' কিন্তু দেখো যেন ঐ ব্যাটা পপি টের না পায় । জানতে পারলে ও আমায় ঠিক চেপে ধরে তুলো ধুনো করবে, তোমাকেও ছাড়বেনা । পা টিপে টিপে এসো আমার সঙ্গে,' বলে পথ প্রদর্শক এগিয়ে এল । এমন সময় টেম্পলের গলা ভেসে এল, চেঁচিয়ে সে গাওয়ানের নাম ধরে ডেকেছে । গাওয়ান দু'বার জোড়ে হাততালি দেবার সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল টেম্পলের চিৎকার । পরিত্যক্ত পুরানো খামারের ভেতরে ভাঙ্গাচোরা দেয়াল হাতড়ে গাওয়ানের প্রার্থিত বস্তুটি নিয়ে এল পথ প্রদর্শক লোকটি, দু'জনেই পাত্র থেকে খানিকটা গলায় ঢেলে খেল, তারপর পাত্রটা আবার আগের জায়গায় রেখে এসে লোকটি বলল, 'তোমায় খুব চেনা চেনা ঠেকছে, এর আগেও তোমায় আমাদের এখানে দেখেছি, তবে তোমার নামাট ঠিক মনে আসছে না ।'

' আমার নাম গাওয়ান স্টিভেনস, গত তিন বছর ধরে লীর কাছ থেকে মাল কিনছি । কিন্তু ও ফিরবে কখন ? আমাদের ত আবার সেই শহরে ফিরতে হবে । ও শীগগিরই ফিরে আসবে । তারপর যা বলছিলাম তোমায় আমার খুব চেনা ঠেকছে আগেও ক'বার এখানে দেখেছি । তিন চার দিন আগে রাতের বেলা জেফারসন থেকে আরেকটা লোক এখানে এসেছিল, সে ব্যাটার নামও মনে আসছেনা, লোকটার বড্ড বকবক করার ধাত, কিভাবে নিজের বউকে মেরে ধরে দূর করে দিয়েছে সেই এক গপ্পো শোনাচ্ছিল । লোকটার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল পপির গলা, 'জ্যাক হ্যায় এই জ্যাক, ঐ লোকটার মুখ সাবান জল দিয়ে ধুয়ে দিবি বলে তুই গেলি কোথায় ?'

লোকটা গাওয়ানের দিকে তাকিয়ে নির্বোধের মত হেসে বলল ' শুনলে পপি ব্যাটার কাণ্ড ? আমায় জ্যাক বলে ডাকছে । আরে আমার নাম যে টমি তা ভগবানও জানে । ভূতও জানে । জ্যাক নই, আমি হলাম গে টমি ।'

' চলে এসো জ্যাক, ' পপির ভরাট গলা আবার ভেসে এল । ' আমি জানি তুমি ওখানেই আছো ।'

' এই ত,' টমি সাড়া দিচ্ছে না বলে গাওয়ান বলে উঠল, ' আমরা এইত এসে গেছি, এক্ষুণি যাচ্ছি ।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পপি রাগ আর উত্তেজনা চাপতে সে দু'হাতের আঙ্গুলে হাত কাটা গেঞ্জি খিমচে ধরে আছে । সূর্য ডুবে গেলেও তার লালচে কমলা আভা ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে । এত দেরি করার জন্য টমিকে কষে ধমক দিল পপি, সেই ফাঁকে টেম্পল এগিয়ে এসে দাঁড়াল গাওয়ানের গা ঘেঁষে, মুখ তুলে তাকাতেই তার নাকে এল কড়া চোলাই মদের ঝাঁঝ । গাওয়ান ভিতু ভিতু গলায় বলল টেম্পল, এত বড় দূর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে তুমি ফের মদ গিলেছো ? কেটে ছিঁড়ে গিয়ে

যেটুকু রক্ত বেরিয়েছে তা এখনও পর্যন্ত ধুয়ে সাফ করল-- 'গাওয়ান,' বিশাল বাড়িটাকে ইসারায় দেখিয়ে টেম্পল কাঁপা গলায় বলল । 'বউ' রান্নাঘরের বউ আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে বলেছিল, বলতে বলতে এক অজানা ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে উঠল টেম্পলের মুখের রঙ, দম নিয়ে থেমে থেমে সে বলল, জানো এত বড় বাড়িটায় কোথাও এক ফোঁটা জল নেই, রাত দুপুরে আচমকা জলের দরকার হলে ওকে বালতি নিয়ে যেখানে আমি পড়েছিলাম সেই ঝর্নাটা পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয় । ওঃ গাওয়ান কি ফুটফুটে সুন্দর একটা বাচ্চাকে দেখলাম ওরা রান্না ঘরে উনুনের পেছনে একটা বাক্সের ভেতরে শুইয়ে রেখেছে, হুলো বেড়াল খেয়ে ফেলবে এই ভয়ে বেড়াল মা যেমন তার বাচ্চাকে ঝুড়ি নয়ত জুতোর ভেতরে লুকিয়ে রাখে ঠিক তেমনই, গাওয়ান, এত সুন্দর হয় ফুটফুটে বাচ্চা আর কোথাও আছে কিনা জানিনা নিজে চোখে না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না । জানো গাওয়ান, রান্নাঘরের বউটা বারবার বলছিল আমরা যেন সন্ধের পড়ে এখানে আর না থাকি । এ ভারি খারাপ জায়গা । বউটা বারবার লোকটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে, বলল ওর নিজের একটা গাড়ি আছে ।'

'কার কথা বলছ ?' টেম্পলের কথা বুঝতে না পেয়ে গাওয়ান বলল, কোন লোকটার সঙ্গে কথা বলার কথা বলছ ? টমি এতক্ষন হাঁ করে তাকিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল । গাওয়ান মুখ তুলে তাকাতে সে অন্য দিকে চলে গেল ।

যে কালো নিগ্রো লোকটা এই বাড়িতে থাকে বউটা তার কথা বলছিল, ' বলতে গিয়ে টেম্পলের গলা কেঁপে গেল, ' ব্যাটা বলল লোকটা আমাদের মাঝে ফিরে যাবার জন্য ওর গাড়িটা দিতেও পারে । চলো, এক বার গিয়ে দেখি, ' বলে গাওয়ানকে এক রকম টানতে টানতে বাড়ির লাগোয়া খোলা আঙ্গিনায় নিয়ে এল টেম্পল । সেই খোলা আঙ্গিনায় দাঁড় করান ছোট গাড়িটায় তখনই গাওয়ানের চোখে পড়ল । গাড়ির আশে পাশে বড় বড় আগাছা মাথা তুলেছে ।

এই গাড়িটা ঘন্টায় আশি মাইল স্পিডে ছোটে, গাড়ির দরজায় লোভীর মত হাত বোলাতে বোলাতে বলল টেম্পল । এ গাড়ি চালাতে পাড়ে এমন লোক এবাড়িতে অন্তত এক জন আছে আমি জানি । এক বার উঠে বসলে খুব শিঘ্রই আমরা কাছাকাছি কোনও না কোনও যায়গায় পোঁছাতে পারব । নয়তো কোনও রেলস্টেশানে, সেখান থেকে ট্রেনে চেপে দুজনেই যে যার বাড়ি ফিরতে পারব । জেফারসনের চেয়েও কাছে কোথাও আমরা পৌঁছাতে পারি । অ্যাই জানো কি মজা হয়েছে, রান্নাঘরের বউটা বারবার জানতে চেয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার সত্যিই বিয়ে হয়েছে কিনা । আমি কিন্তু কিছু না ভেবে বলে দিয়েছি আমি তোমার বিয়ে করা বউ ।'

' তোমার দৌড় বোঝা গেছে,' হতাশ গলায় গাওয়ান বলল, ' কোথাকার রাধুনি মাগী তার সঙ্গে এতক্ষন শুধু বাজে বকবক করে সময় নষ্ট করেছো । তাই গাড়ি দেখে কিনা তা জানতে আমায় পাঠাচ্ছ এই বারান্দাটার কাছে । চাইলেই ও ওর গাড়ি দিয়ে দেবে এটাই বুঝি ধরে নিয়েছো তুমি । তাই না ? আর তাই খুশিতে ডগ মগ হয়ে নাচতে

শুরু করেছো ? শোন, ঐ কেলে ভূতের সঙ্গে যাবার চেয়ে আমি বরং টানা এক হপ্তা এখানেই কাটাব ।'

'কিন্তু ঐ বউটা যে আমাদের চলে যাওয়ার কথা বলল,' কাতর চোখে গাওয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল টেম্পল ।

'তোমার মাথা একদম খারাপ হয়ে গেছে,' গাওয়ান গলা চড়ালো, 'এদিকে এসো, আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াও, ওসব আজে বাজে কথা মন থেকে ঘুঁচিয়ে ফ্যালো ।'

'তার মানে তুমি ওর কাছে যাবেনা ? গাড়ি পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইবে না ?' 'না, লী ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো আমার লক্ষী মেয়ে ; বিশ্বাস করো আমাদের সহরে ফেরার মত একটা গাড়ি লী ঠিক জোগাড় করে দেবে ।'

টেম্পল আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে রইল, গাওয়ান তাকে নিয়ে সেই পথ ধরে হেঁটে কয়েকপা এগোল । একটা থামে ঠেস দিয়ে সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছে পপি, এমন সময় গাওয়ানকে ছেড়ে পা চালিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল টেম্পল । অসহায় ভাবে বলল, 'তুমি নিজে কি গাড়ি চালিয়ে আমাদের শহরে পৌঁছে দিতে চাওনা ?'

জ্বলন্ত সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে পপি তাকালো তার দিকে । এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'না, চাই না।'

'কেন ঝামেলা করছো বাপু ?'

ব্যাকুল শোনাল টেম্পলের গলা, 'ঐ ও একটা প্যাকার্ড দাড় করানো আছে, ওটা চালিয়ে তুমি মাঝ রাতের আগেই আমাদের শহরে পৌঁছে দিতে পারবে, তুমি কি এমনি এমনি আমাদের শহরে পৌঁছে দেবে নাকি ? আমরা তোমায় ভাল পয়সা কড়ি দেব ।'

'এই যে সোনার চাঁদ,' হাতের মুঠোয় ধরা দেশলাই বাক্সটা গরম বিতৃষ্ণায় পথের এক পাশে আগাছায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গাওয়ানকে বলল পপি, 'তোমার ঐ পোষা খানকিটাকে সরে যেতে বলো । ওর একঘেয়ে প্যান প্যানানি শুনতে আমায় কিন্তু মোটেও ভাল লাগছে না ।'

'কিযা তা বলছ ?' পপির দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল গাওয়ান ।

'বুড়ো ধারি হয়েছো এখনো লোক বুঝে কথা বলতে শিখলে না ? কার সঙ্গে কথা বলছ জানো ? যা বলার বুঝে সুঝে বলো !' ধমক খেয়ে পপি একটা কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে একবার গাওয়ানকে দেখল, তার পরে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট টানতে লাগল ।

'তোমার স্যুটের কি হাল হয়েছে সে খেয়াল আছে ? দেখে ত মনে হচ্ছে কাদা জলে সাঁতার কেটে এসেছো !' গাওয়ানের দিকে তাকিয়ে আচমকা খেঁকিয়ে উঠল টেম্পল। গাওয়ান জবাব না দিয়ে আলতো হাতে থাপ্পর মারল টেম্পলের কোমরের

নিচে, ঐখানে হাত রেখে তাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল দরজার দিকে, টেম্পলের জুতোয় হিলের খট খট আওয়াজ হতে লাগল । থামে ঠেস দিয়ে ঘার ঘুরিয়ে তাদেব দেখতে লাগল পপি ।

' কি গো, ' টেম্পলকে ভোলাতে বলে উঠল গাওয়ান, ' শহরে পৌছাবার আগে এখানে একটু ছোট করে হবে নাকি--'

.' চোর ! বদমাস ! ' কান্না চাপা গলায় ধমকে উঠল টেম্পল । ' ইতর ছোটলোক কোথাকার ! তুমি একটা কথাও আমার সঙ্গে বলবে না ! '

' ঐ উল্লুকটার হাতে চর থাপ্পর খাবার সাধ হয়েছে, তাই না ? ' বলতে বলতে গাওয়ান টেম্পলকে ঠেলতে ঠেলতে জোর করে ঢুকিয়ে দিল বাড়ির ভেতরে ।

' বুঝেছি, ' টেম্পল বলল, ' ওর কথা শুনেই তুমি ঘাবড়ে গেছো তা বুঝতে আমার বাকি নেই ! ওর চর থাপ্পর খাবার ভয়ে তুমি ঘাবড়ে গেছো, তাও বুঝেছি ! '

' মুখ বন্ধ কর, ' গলা চড়িয়ে ধমকে উঠে দুহাতে টেম্পলের দু কাঁধ চেপে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলে উঠল গাওয়ান ।

' বন্ধ কর বলছি ! ' সেই ঝাঁকুনি খেয়ে টেম্পলের পা দুটো এমন ভাবে মেঝেতে ঘাটতে লাগল যার আওয়াজ শুনে মনে হল ওরা দুজনে নাচছে তিড়িং বিড়িং করে ।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য - ঝাঁকুনি খেয়ে একপাশে টাল খেয়ে দু'জনে এসে ধাক্কা খেল দেয়ালে ।

' আমার দোষ নেই,' টেম্পলকে দু'হাতে জাপটে ধরে গলা ছাড়িয়ে বলল গাওয়ান,' তুমিই কিন্তু আবার আমায় তাতিয়ে তুলছ ।' গাওয়ানের একথার মানে আঁচ করেই টেম্পল হাঁচোর পাঁচোর করে তার দু'হাতের বাঁধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়োতে লাগল সামনের দিকে, পেছনের দরজার পাল্লার গায়ে তার চলন্ত ছায়ার দিকে নির্বোধের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল গাওয়ান ।

দৌড়োতে দৌড়োতে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল টেম্পল । আলো না থাকলেও উনুনের আগুনের আভায় চারিদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । ঘুরে দাঁড়াতে টেম্পল দেখল গাওয়ান পায়ে পায়ে বাড়ির পেছন দিকে পুরোনো খামার বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে । যাচ্ছে আবার মাল খেতে, নিজের মনে বলল টেম্পল, এই নিয়ে আজকে একদিনে তিনবার হবে । খিদেয় টেম্পলের পেট জ্বলে যাচ্ছে, সারাদিন দানাপানি কিছুই পরেনি পেটে । খিদের জ্বালা যত বাড়ছে ততই কয়েকটি দৃশ্য ভেসে উঠছে তার মনে— রাতের বেলা তার বাবা বসে আছেন বারান্দায়, নিগ্রো বাগানের মালি লন মেজয়ার চালিয়ে সবুজ ঘাস ছেঁটে পুরো লনটাকে সাফ করছে, সাত সকালে নেড়া মাথার মত দেখাচ্ছে লনটাকে । বারান্দার রেলিং-এ পা ঝুলিয়ে লনের ঘাস মুড়িয়ে ছেঁটে ফেলার দৃশ্য আগ্রহে দেখছে সে নিজে । পা টিপে টিপে এগোতে যেতে রান্নাঘরে এক কোনে একটা বন্দুক দাঁড় করানো দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলল টেম্পল ।

কাঁদতে কাঁদতে কিছুক্ষণ পরে নিজেই শান্ত হল টেম্পল, কয়েক মুহূর্ত বাদে কে

বা কি একটা যেন এসে ঢুকল ভেতরে, ভয়ে পেয়ে গলা ফাটিয়ে প্রাণপ্রণে চেঁচিয়ে উঠল সে । পরমুহূর্তে টেম্পল দেখল সেই অন্ধ কালা বুড়োটা মেঝেতে লাটি ঠুকতে ঠুকতে বেরিয়ে গেল হলের ঘরের দিকে । দু'পা ফাঁক করে একটা লোক এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দায়, বুড়ো বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পা চালিয়ে এসে ঢুকল রান্না ঘরে, উনুনের পেছন থেকে বাক্সটা টেনে বের করে এনে দাঁড়াল টেম্পলের সামনে । যেমন বাক্সটা বা তার ভিতরে যা কিছু আছে সব টেম্পলের এমনি ভাবেই সেটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে । বাক্সের ভেতরে শুয়ে রাখা বাচ্চাটার মুখে আলতো করে হাত বোলালো টেম্পল । দু'হাতে সে বাক্সটা আঁকড়ে ধরল । ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও সেই মহান করুণাময়কে কি বলে ডাকবে তা তার মনে এলনা । তাই মনে মনে নামতা পড়ার মত ' আবার পিতা বিচার করেন ' বারবার এইটুকু মনে মনে আওড়াল সে । কয়েক মুহূর্ত পরে গুডউইন দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে তুলে ধরল উঁচুতে। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে বাঁহাতে টেম্পলের চিবুক আলতো করে তুলে খুঁটিয়ে তার মুখখানা দেখল সে পরম কৌতূহলে, তারপরে বাক্স বাঁচিয়ে বেড়াল বাচ্ছা তুলে ধরার মত তার পলকা ক্লান্ত শরীরটা মেঝে থেকে উঁচু করে তুলে ধরলেন ।

' তুমি কে গো ? এখানে আমার বাড়িতে কি করছ ?'

কমজোরি আলোয় প্রদীপ্ত হলঘরের কোনও এক জায়গা থেকে অনেকের গলা আর অট্টহাসি ভেসে আসছে, খুন্তি দিয়ে মাংস ভাজার ছ্যাঁক ছোঁক আওয়াজ মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে । ভারি জুতোর আওয়াজ কানে আসতে চোখ তুলে তাকাতে গাওয়ান আর খাকি ব্রিচেস পরা অন্য একটা লোক টেম্পলের চোখে পড়ল । গাওয়ান যে আবার মদ গিলেছে তার হাঁটা চলা আর দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে ।

' এ কি তোমার ভাই হয় ?' খাকি ব্রিচেস পরা লোকটি ইশারায় দেখিয়ে বলল টেম্পল ।

' কে ? কার কথা বলছ ?' অবজ্ঞা মেশানো গলায় কথাটা বলেই যুবতী খুন্তি দিয়ে মাংসটা নেড়ে চেড়ে উল্টে দিয়ে বলল, ' আমার কে হয় বলছ ?'

' এ তোমার ভাই হয় কিনা তাই জানতে চাইছিলাম,' একই রকম ইশারায় লোকটিকে দেখিয়ে আবার বলল টেম্পল ।

' কি বললে, ভাই ?' মাংসটা উল্টে দিয়ে যুবতী বলল, ' না, ও ভাই নয় ।' বলেই চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ' ভাগ্যিস নয় ।'

' আমার চারজন ভাই আছে,' অদ্ভুত সরল গলায় বলল টেম্পল, ' দু'জন উকিল, একজন খবরের কাগজে কাজ করে, আর সবার ছোটটা এখন ইয়েল- এ স্কুলে পড়ে । আমার বাবা জজ, ম্যাকসন টাউনের ড্রেক জজ নামে সবাই ওঁকে চেনে ।' বলতে বলতে

বাবার ছবিটা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে; সুতির স্যুট পরে বারান্দায় বসে তাল গাছের শুকনো পাতার তৈরী পাখা নেড়ে হাওয়া খেতে খেতেবাগানের ঘাস ছাঁটা তদারক করছেন ।

' বারবার তোমায় সূয্যি ডোবার আগে তোমাকে এখান থেকে চলে যাবার কথা আমি পইপই করে বলিনি তোমায় ?' টেম্পলের মুখের উপর ঝুঁকে চাপা ধমক দেবার গলায় বলল, ' দিনের আলো থাকতে থাকতে বিদেয় হতে বলিনি ?'

' কি করে যাব বলো ?' জবাব দিল টেম্পল, ' আমি অনেকবার বলেছি কিন্তু গাওয়ান কিছুতেই যেতে রাজি হল না ।'

উনুন বন্ধ করে টেম্পলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে যুবতী বলল, ' কি করে ফিরে যাবে বলছ ? রাতের বেলা আমরা দরকার হলে কিভাবে জল জোগাড় করি জানো ? হেঁটে ঝর্ণা পর্যন্ত যেতে হয়, কম করে এক মাইল, দিনে কম করে ছ'বার । ভেবে দেখ এবার এমন একটা জায়গায় থাকতে শুধু ভয় পেয়েছি বলেই নয়,' এটুকু বলে যুবতী পাশের টেবল থেকে প্যাকেট তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বের করল ।

' আমায় একটা দাওনা ? ' বলল টেম্পল । যুবতী প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রেখে গড়িয়ে দিলে তার দিকে । ল্যাম্প থেকে চিমনি খুলে পলতের আগুন থেকে যুবতী সিগারেট ধরালো, খাকি ব্রিচেস পরা অচেনা লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে গাওয়ান ততক্ষণে ঢুকে পরেছে বাড়ির ভেতরে । তাদের একটানা বকবকানি টেম্পলের কানে ভেসে আসছে ।

যুবতীর হাতের সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে এসেছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠল টেম্পল , ' বাড়ি ভর্তি এতগুলো লোক তার মধ্যে মোট চারবার মদ খেল গাওয়ান..... ' কান্নার মত শোনালো তার গলা ।

' বাড়ি- মানে ছোট ভাই হিউবার্ট ,' প্যান প্যানে গলায় যুবতীকে লক্ষ করে বলল টেম্পল, ' প্রায়ই বলে আমায় কোন মাতালের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখলে ও আর আমায় আস্ত রাখবে না । মেরে আমার ভূত ভাগিয়ে দেবে । গাওয়ানের মত এক মোদো মাতালের সঙ্গে আমায় দেখলে ও সত্যি সত্যি কি করে বসত কে জানে !' বাড়ির ভিতর থেকে অনেকগুলো নেশা জড়ানো গলা ভেসে আসছে । তার মধ্যে রান্না ঘরের যুবতীকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পটানোর চেষ্টা করে চলল টেম্পল । চোখ বড় বড় করে সহানুভূতি মেশানো গলায় বলল বলল, ' একদিন দু'দিন নয়, রোজ রাতে এতগুলো লোকের খাবার তোমায় একা হাতে তৈরী করতে হয়, এরা সবাই রাতের বেলায় ত এখানেই খাওয়ার পাট সারে । এই আঁধারে এতগুলো লোকের রান্নার কাজ একা হাতে সামলানো কি সহজ কথা ।' বলতে বলতে সিগারেটের পোড়া টুকরো ফেলে দিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে টেম্পল বলল, ' বাচ্চাটাকে একবার দাওনা গো, একটু কোলে নিয়ে বুকটা জুড়োই । ভয় নেই, আমি ওকে ঠিক আগলে চলব,' বলতে বলতে সে নিজেই এগিয়ে এসে দাঁড়াল উনুনের সামনে, হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে

বাক্স থেকে তুলে নিতে বাচ্চাটা ঠাঁই বদল হবার দরুন নাকি কান্না জুড়ে দিল ।

‘ ব্যস, ব্যস, আর কান্না না,’ বাচ্চাটিকে আলতো হাতে দোলা দিতে দিতে টেম্পল বলল, ‘ টেম্পলেব কোলে উঠলে আর কোনও চিন্তা ভাবনা নেই ।’ বলতে বলতে এগিয়ে এসে যুবতীর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল টেম্পল । মিষ্টি করে তাকে বলল ‘ হ্যাঁগো, ওকে মানে তোমার সোয়ামিকে একবার বলোনা, উনি একটা গাড়িতে করে আমায় কোথাও পৌঁছে দিতে পারেন । ওঁকে জিজ্ঞেস করব ? হ্যাঁগো, করেই দ্যাখোনা । আমায় যাতা মেয়ে বলে ভেবে বোসনা যেন; আমার বাবা জজ, আমি যেখানে থাকি সেখানকার রাজ্যপাল রাতের ডিনার খেতে আসেন আমাদের বাড়িতে তা জানো ? কত লোক আসে ওঁর সঙ্গে ভাবতে পারো ? আহা, বাচ্ছাটা কি খাসা দেখতে হয়েছে, চোখ মুখ কি দারুন মিষ্টি ।’

‘ তুমি, তোমারা কেমন মানুষ বলোত ?’ মাংসটা উল্টে পাল্টে দিয়ে যুবতী কৈফিয়ত চাইবার গলায় বলল, ‘ ভেবেছো তোমার মত সস্তা রাস্তার খানকিদের পেছনে ধাওয়া করা ছাড়া লী-র আব কিছু করার নেই ? সত্যি কথা বলোত বাপু, এখানে কি মতলবে এসেছো ?’

‘ বিশ্বাস করো,’ মিনতি ভরা গলায় বলল টেম্পল । ‘ স্টার্কভিলে যাবে বলে আমায় গাড়িতে তুলে নিয়ে রওনা হয়েছিল, ততক্ষণ ও প্রচুর মদ গিলেছে । আরও মদ খাবার জন্য এদিকে গাড়ি ঘুরিয়ে ছিল, মাঝখানে গাছে ধাক্কা মারতে গাড়ি উল্টে আমরা ছিটকে বাইরে পড়ে গেলাম । আমার এখন প্রোবেসান চলছে, সময়মত বাড়ি না ফিরলে আমার বাবা ঠিক মরে যাবেন ।’

‘ কেন, প্রোবেসানে কেন ?’ অবাক চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল যুবতী ।

‘ রাতের বেলা লুকিয়ে পালিয়েছি বলে, ’ বলল টেম্পল, ‘ কারণ শুধু শহরের ছেলেদের গাড়ি রাখার এক্তিয়ার আছে, শুক্কুরবার, শনিবার আর রোববার রাতে কোনও শহরের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করতে বেরুলে স্কুলের কোন ছেলে আর জেনে শুনে তোমার সঙ্গে প্রেম করবে না আর । ওদের গাড়ি নেই । তাই আমায় লুকিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে । আমায় দু’চক্ষে দেখতে পারে না এমন একটা মেয়ে ডীনকে সব বলে দিয়েছিল কারণ মেয়েটা যাকে পছন্দ করত সেই ছেলেটার সঙ্গে আমি প্রেম করতে বাইরে বেরিয়েছিলাম । সেই থেকে ঐ মেয়েটার ধারে কাছে আর ঘেঁষেনি ছেলেটা, তাই আমায় ওর সঙ্গে প্রেম করতে যেতে হত ।’ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টেম্পল বলল, ‘ গাওয়ান শহরের ছেলে নয় । ও এসেছে জেফারসন টাউন থেকে । ভার্জিনিয়ায় কিভাবে ও মদ খেতে শিখেছে সেকথা আসার পথে বারবার বলছিল গাওয়ান । আমার সঙ্গে মাত্র দুটো ডলার ছিল তাই কিছু টাকা ধার দিতে আর কোথাও নামিয়ে দিতে আমি কাকুতি মিনতি করেছি ওর কাছে, ভিক্ষে চেয়েছি কিন্তু ও —

‘ থাক বাছা, আর বলতে হবে না ।’ গম্ভীর গলায় যুবতী বলল, ‘ তুমি হলে গে তেমনই সচ্চরিত্র মেয়েমানুষ যে সবার চোখে চিরকাল ভাল আর সাধু সাজতে চায় ,

যারা সাধারণ পুরুষ মানুষ তাদের সঙ্গে কোনও ফস্টি নস্টি করতে তোমাদের মন চায়না । তুমি রাতের বেলা সবার চোখ এড়িয়ে চ্যাংড়া ছোঁড়ার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালাতে পারো কিন্তু কোনও পুরুষ মানুষ যখন তোমার কাছ থেকে কিছু খাবার জন্য এসে দাঁড়ায় তখন তাকে দু'হাতে উজার করে দিতেই তোমার যত আপত্তি. মাথা নিচু করে তাকে শোনাও, আমি ভাল মেয়ে, আপনি যা চাইছেন তা আমি আপনাকে দিতে পারব না ।' মাংসটা নেড়েচেড়ে বিষ ঢালা গলায় যুবতী আবার বলল ' বড়লোকের চ্যাংড়া ছোঁড়ার সঙ্গে বাড়ি থেকে পালাতে তার গাড়ির তেল পোড়াতে, তার পয়সায় খাওয়া দাওয়া আর মদ গিলে ফূর্তি করার সময় তোমার বাধে না, কিন্তু কোনও পুরুষ মানুষ যখন সরাসরি তোমার চোখের পানে তাকায় তখনই তোমার জজ বাপ আর চার ভাইয়েরা এসব পছন্দ করেনা বলে তুমি সাধু সাজো, কেমন ? তা ফূর্তি করতে বেরিয়ে বিপদে পড়ে যখন আমাদের কাছে এসে নাকিকান্না কাঁদছ কেন শুনি ? তোমার জজ বাপের জুতোর ফিতে বাঁধার উপযুক্ত যে আমরা নই এখানে পা দিয়েই ত তুমি তা বুঝেছো, তা হলে ?' ভেতরের সবটুকু বিষ উগরে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার রান্নায় মন দিল যুবতী । তার বাচ্চা এখন টেম্পলের কোলে, সেই বাচ্চার মাথার ওপর দিয়ে যুবতীর পিঠের দিকে টেম্পল একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ।

' আমার ভাই বলেছিল ফ্রাংককে ও নিজের হাতে খতম করবে, বলেছিল ফ্রাংকের সঙ্গে আমায় দেখলে ও চাপকে আমার ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নেবে, ' মুখ না ফিরিয়ে আক্ষেপের গলায় নিজের মনে বলতে লাগল যুবতী, বাবা রেগে মেগে আমায় ঘরের ভেতরে বন্ধ করে দরজায় তালা আঁটল তারপর ফ্রাংককে খতম করার মতলবে ফ্রিজের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল । মেয়েমানুষ হলেও সাহস আর হিম্মত , ভগবান দুটোই আমায় দিয়েছিল । জানালার বাইরে বৃষ্টির জলের নল বেয়ে দিব্যি নিচে নেমে এলাম তারপর ফ্রাংকের সঙ্গে দেখা করে বললাম, ঠিক করলাম দু'জনে একসঙ্গে পালাব, তারপর কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধব । জামা কাপড় গুছিয়ে নেব বলে ফ্রাংকের হলদে গাড়িতে চেপে বাড়িতে এলাম । বাবা বারান্দায় বসেছিল, আমাদের দেখেই বাড়ির ভেতর থেকে বন্দুক নিয়ে এল তারপরে কোনও কথা না বলে আমার দিকে বন্দুক তাক করল । ফ্রাংক এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বুক পেতে দিতে বাবা গুলি ছুঁড়ল। বুকে গুলি লেগে পড়ে গেল ফ্রাংক আর উঠল না । বাবা হাসতে হাসতে বলল ' অ্যাই খানকি, ভাল চাসত তোর জাম কাপড় নিয়ে এক্ষুণি বিদেয় হ নয়ত তোকেও খুন করব।' চোখের জল মুছে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম । নিজের জামা কাপড় সব সুটকেসে ভরে তখনই এক কাপড়ে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে ,' সেই থেকে এই পর্যন্ত আর কখনও চোখের জল ফেলিনি ।

'খানকি বদনাম আমাকেও শুনতে হয়েছে,' বাচ্চাটাকে আগের মতই কোলে জাপটে ধরে যুবতীর পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিসফিস করে বলল টেম্পল।

' কিন্তু তোমাদের মত মেয়ে মানুষেরা যারা নিজেদের ভালমানুষি বজায় রেখে

সস্তায় মজা লুটবার পেছনে দৌড়োও, তারপরে যখন হাতে নাতে ধরা পড়ো .... জানো তুমি কোথায় কোন নরকে এসে সেঁধিয়েছো ?' খুন্তি হাতে টেম্পলের কাঁধের ওপর দিয়ে খাবার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল,' ওখানে যারা বসে আছে ওরা কিন্তু ফস্টিনস্টি করার মত চ্যাংড়া ছোঁড়া নয় । যার গাড়িতে তুমি নিজে যেচে এসেছো আর ভাবছো সে তোমায় গাড়িতে চাপিয়ে শহরে পৌঁছে দেবে জানো সে কেমন লোক? ফিলিপাইনসে ফৌজে চাকরি করার সময় একটা কেলে নিগ্রো মাগির দখল নিয়ে ও আরেকন ফৌজিকে খুন করেছিল । লম্বা মেয়াদের সময় কাটাতে ওকে পাঠানো হয় লিভেনওয়ার্থের জেলখানায় । তারপর যখন মহাযুদ্ধ বাধল তখন সরকার ওকে সে যুদ্ধে লড়তে পাঠাল । যুদ্ধে হিম্মত দেখিয়ে ও দুটো মেডেলও পেয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পরে ওকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় লিভেনওয়ার্থের জেল খানায় । তারপর একজন উকিল কংগ্রেসের এক বড়কর্তাকে অনেক ধরাধরি করে ওকে খালাস করে আনেন জেল থেকে । ও খালাস পাবার পরে আমি সরে আসি ' জ্যাজ ' এর দুনিয়া থেকে ।

' জ্যাজ ?' যুবতীর কথা টেম্পলের অবিশ্বাস্য ঠেকল, ' তুমি জ্যাজ জানো ?'

' হ্যাঁ গো সুন্দরী ।' যুবতী বলল, ' নয়ত উকিলের খরচ জোগাতাম কি করে ?' তার মুখের সামনে দু'আঙ্গুলের তুড়ি মেরে যুবতী হিংস্র গলায় বলল, ' মুখ খানা দেখতে পুতুলের মত সুন্দর হলে কি হবে, আসলে তুমি একটা খানকি ছাড়া কিছু নও । আবার একঘর বোঝাই বদমাসের মাঝখানে যেতেও ভয়ে তোমার বুক ঢিবঢিব করছে, মুখ গেছে শুকিয়ে ।' সুতির জীর্ণ ঢোলা পোষাকের নিচে রাগ মেশানো চাপ উত্তেজনায় যুবতীর বুক ওঠানামা করছে, স্তন যুগল যেন ফেটে বেরিয়ে আসবে । দু'হাত কোমরের দু'ধারে রেখে যুবতী টেম্পলের দিকে গনগনে জ্বলন্ত চাউনি হেনে বলল, ' পুরুষ মানুষ নিয়ে ফূর্তি করতে বেরিয়েছো ? ছোঃ ! পিপে পিপে মদ গিললেই পুরুষ মানুষ হওয়া যায় নাকি ? খাঁটি পুরুষ মানুষ কখনও দেখনি তুমি । যাকে ছাড়া একজন খাঁটি পুরুষ মানুষের চলেনা, সে তার কামনার ধন, স্বপ্নের নারী, সেই মেয়েমানুষ কাকে বলে, কি করে তেমন মেয়ে মানুষ হয়ে উঠতে হয় তা তুমি জানো না । ভাগ্যিস জানোনা, নয়ত তোমার ঐ পুতুল পুতুল মুখের আসল দর কত, তা হাড়ে হাড়ে টের পেতে । আর যদি কেউ কখনও তোমাকে খানকি বলে থাকে তবে জেনে রেখো সে একজন খাঁটি পুরুষ মানুষ, তার মুখে ঐ আদরের ডাক সোনার জন্য তুমি ল্যাংটা হয়ে কাদায় গড়াগড়ি দিতে পিছুপা হতেনা । দাও, আমার বাচ্চাকে দিয়ে দাও,' বলে একরকম জোর করে নিজের বাচ্চাকে যুবতী ছিনিয়ে নিল টেম্পলের কোল থেকে ।

সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল, ' হিসি করে ফেলেছে ।' চেয়ারে বসে বাচ্চাকে উরুর ওপর চিত করে শুইয়ে যুবতী টেম্পলকে বলল, ' এক কাজ করো, সামনে তারের ওপর থেকে এর একটা শুকনো নেংটি আমায় এনে দাওত ।' টেম্পল রান্নাঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাল সামনের দিকে, ভয়ে ভয়ে ঠোঁট দুটো কাঁপতে

লাগল থরথর করে ।

‘ কি হল, ওখানে যেতে ভয় করছে ?’ বলতে বলতে যুবতী বাচ্চাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে ।

‘ না ’ টেম্পল বলল, ‘ আমি এখুনি গিয়ে নিয়ে আসছি ।’

‘ থাক, তোমায় আর যেতে হবে না, যুবতী বলল, ‘ যা করার আমিই করছি,’ বলে ফিতেহীন মোটা চামড়ার জুতো মেঝেতে ঘষটে যুবতী এগোল । আরেকটা চেয়ার এনে উনুনের কাছে এনে রাখল তারপর তারে টাঙ্গানো বাচ্চার শুকনো অন্তর্বাসগুলো তার ওপর নামিয়ে রাখল, ভেজা অন্তর্বাস পাল্টে বাচ্চাকে আবার উনুনের পেছনের কাঠের বাক্সে পাতা বিছায় সে শুইয়ে দিল । এরপর পুরানো আলমারি খুলে একটা প্লেট আর কাঁটা চামচ বের করে যুবতী এসে দাঁড়াল টেম্পলের সামনে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ সোনা, একটা গাড়ি জোগাড় হলে তুমি সত্যি সত্যি এখান থেকে চলে যাবেত ? চুপিচুপি পেছন দিকে গিয়ে গাড়িতে চেপে কেটে পরবে । ভুলেও আর কখনও ফিরে আসবে না এখানে, কেমন ?’

‘ হ্যাঁ’, ফিসফিস করে বলল টেম্পল। ‘ তাই হবে, যেখানে বলবে সেখানে যাব, যা বলবে তাই করব ।’ হিমশীতল চাউনি মাখানো দু’টি চোখ না সরিয়ে টেম্পলের পা থেকে মাথা কয়েকবার দেখল যুবতী । সে চাউনির সামনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল টেম্পল ।

‘ ভিতুর ডিম কোথাকার ।’ ঠান্ডা গলায় টেম্পলকে উপহাস করল, ‘ খেলা পেয়েছ তাই না ?’ উপহাস করল, ‘ জীবন নিয়ে খেলা করছ তাই না ?’

‘ না, না, তুমি ভুল করছ ।’ শিউরে উঠে বলল টেম্পল, না, ‘ আমি জীবন নিয়ে খেলিনি ।’

‘ ওখানে যে সব শুয়োরের বাচ্চা বসে আছে ’ চাপা গলায় যুবতী বলল । ‘তোমার ওপর কিন্তু ওদের নজর পড়ে গেছে ।’

‘ আমি চলে যাব, ‘ বিড়বিড় করে বলল টেম্পল, ‘ তুমি যেখানে বলবে আমি সেখানে চলে যাব, কিন্তু গাওয়ান — ’

‘ রাতের সিফটের ওয়েট্রেসের কাজ করতাম যাতে রবিবার দিন জেলখানায় গিয়ে ওকে দেখতে পারি । টানা দুটো বছর একটা ঘরে থেকে গ্যাসের নলের ওপর রান্না বান্না সেরে কি কষ্ট করে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম তা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না । এইভাবে খরচ কমিয়ে জমানো টাকা খরচ করে ওকে খালাস করে আনলাম জেলখানা থেকে আর এর প্রতিদানে কি পেলাম জানো ? জেল থেকে বেরিয়ে আমার কষ্টের কথা শুনে ও আমায় বেধরক মার মারল । আচ্ছা এবারে তোমায় সেখানে আসতে হবে যেখানে তোমায় কেউ চায়নি কেউ তোমায় আসতে বলেনি এখানে , তুমি ভয় পেলে কি ঘাবড়ে গেলে তা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই । ভয় পেয়েছো ? সত্যি সত্যি ভয় পাবার হিম্মতও তোমার নেই ।’

‘ আমি তোমায় পয়সা দেব, ‘ ফিসফিস করে বলল টেম্পল,’ যা চাইবে তাই পাবে, যত চাইবে তত পাবে । টাকাটা আমার বাবা আমায় ঠিক দিয়ে দেবেন ।’

‘ টাকা দেখাচ্ছো ?’ তার মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যুবতী বলল ।’

‘ হ্যাঁ তাই,’ টেম্পল জোর দিয়ে বলল, ‘ টাকা ছাড়া আমি তোমায় ভাল আর দামি জামাকাপড় পাঠাব । আমার একটা নতুন কেনা ফার কোট আছে, খ্রীসমাসের পর এখন পর্যন্ত একবারই ওটা পরেছি, ওটা দেখলে একদম নতুন কেনা বলে মনে হয় । ওটা আমি তোমায় পাঠিয়ে দেব ।’

‘ জামা কাপড় দেখাচ্ছো ?’ হাসতে হাসতে যুবতী বলল, ‘ এক সময় আমার তিনটে ফার কোট ছিল, একটা সেলুনের লাগোয়া গলিতে একটা বুড়ি বসে বসে ভিক্ষে চাইত, তিনটে ফার কোটের মধ্যে একটা তাকে দিয়ে দিয়েছিলাম । আমায় কাপড় দিতে চাইছো ? হা ভগবান ।’ আক্ষেপের সুরে বলেই সুর পাল্টে যুবতী বলল, ‘ গাড়ি একটা আমি জোগাড় করছি, তাতে চেপে তুমি বিদেয় হও, আর কোনও দিন ভুলেও এখানে আসতে চেয়োনা । কি হল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো ?’

‘ হ্যাঁ,’ ফিসফিস করে বলল টেম্পল, এই মুহূর্তে যেন সে নড়াচড়া করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে; যারা স্বপ্নের ঘোরে হেঁটে চলে বেড়ায়, তার চোখ মুখ ঠিক তাদের মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ।

যুবতী এবারে রান্নার পাত্র থেকে ভাজা মাংসটা একটা প্লেটে তুলে খানিকটা ঝোল তার ওপর ঢেলে দিল, উনুনে বসানো পাত্র থেকে কয়েকটা বিস্কুট তুলে অন্য একটা প্লেটে রাখতে একই রকম ফিসফিস করে টেম্পল বলল, ‘ আমি তোমায় সাহায্য করতে পারি ?’ যুবতী উত্তর না দিয়ে দু'হাতে প্লেট দু'টো তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে । টেম্পল এবারে এগিয়ে এল, টেবলে রাখা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে জ্বলন্ত ল্যাম্পের দিকে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল । ল্যাম্পের কালি উঠে কাচের চিমনির একটা পাশ কুচকুচে কালো হয়ে গেছে, সেই কালো জমির মাঝখানে চুলের মত সরু একটা রূপোলি চিড় তার চোখে পড়ল । ল্যাম্পের আগুনে সিগারেট ধরালো টেম্পল । তারপর তাকিয়ে রইল সেই আগুনের দিকে । ঠিক তখনই যুবতী ফিরে এল, টেম্পলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ এসো, তোমার খাবার খেয়ে নাও’ টেম্পল কিছু না বলে সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে রইল টেবলের ধারে । যে বাক্সে বাচ্চাটা শুয়ে আছে উনুনের ছায়া পড়েছে তার গায়ে, সেদিকে চোখ পড়তে ফিসফিস করে নিজের মনে টেম্পল বলল, ‘ বাচ্চাটাকে বাঁচানো যাবে না, শীগগিরই ও মরবে, আহা, বেচারা ।’ ওপাশ থেকে পুরুষদের সমবেত গলা ক্রমেই চড়ছে ।

‘ যাও, ওখানে গিয়ে তোমার খাবার খেয়ে নাও,’ টেম্পলকে আবার একইরকম গম্ভীর গলায় বলল যুবতী ।

‘ ওরা ত এখন খাচ্ছে ’ ভেতরের ভয় চাপা দিতে বলল টেম্পল । ‘ তুমি

এইবেলা গাড়ি জোগাড় করে দাও, ওদের খাওয়া শেষ হবার আগেই তাহলে আমি চলে যেতে পারি ।'

' কোন গাড়ির কথা বলছ ?' যুবতী বলল, ' গাড়ির কথা পরে হবে, আগে ওঘরে গিয়ে খেতে বসো । ভয় নেই, ওরা কেউ তোমায় ছোঁবে না ।

' আমি এখন যাব না,' ভেতরের ভয় চাপতে একগুঁয়ে গলায় বলল টেম্পল, 'আমার একটুও খিদে পায়নি ।'

' যাও ওঘরে গিয়ে খেতে বসো,' একই রকম গলায় আবার বলল যুবতী ।

' আমি পরে তোমার সঙ্গে খাব ' বলল টেম্পল ।

' যাও, ওঘরে গিয়ে খেতে বসো,' যুবতী বলল, আমার হাতে এখন অনেক কাজ জমে আছে, সেসব কাজ সেরে খেতে বসতে বসতে অনেক রাত হয়ে যাবে, যাও খেয়ে নাও ।'

খাবার ঘরে যারা এসে জুটেছে তাদের খুশি করার হাব ভাব চোখে মুখে ফুটিয়ে শান্ত পা ফেলে রান্না ঘরের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল টেম্পল, শান্ত পা ফেলে এসে দাঁড়াল খাবার ঘরে; টমির দিকে চোখ পড়তে যেন এতক্ষণ ধরে তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল এমনি ভাবে এগোতে গেল তার দিকে, আর ঠিক তখনই পাস থেকে একটা শক্ত হাত এগিয়ে এসে রুখে দিল তাকে । টমির দিকে চোখ রেখে টেম্পল সেই বাধা এড়িয়ে এগোতে যাবার চেষ্টা করল ।

' এই যে, আমি এখানে,' টেবলের ওপাশে বসা গাওয়ান চেয়ারে আওয়াজ করতে করতে বলল, ' তুমি এখানে আমার কাছে এসে বোস ।'

' তুমি যে বড্ড বেশি মাল টেনে ফেলেছ ভাই,' শক্ত হাত বাড়িয়ে সে টেম্পলকে রুখে দিয়েছে সে বলল, ' ওর দিকে হাত না বাড়িয়ে এইবেলা মানে মানে কেটে পড়ো । এইযে খুকুমণি, ' টেম্পলকে লক্ষ করে লোকটা বলল,' ঐ বেয়ারা মাতালটার কাছে না গিয়ে তুমি বরং আমার কাছে চলে এসো,' বলতে বলতে লোকটা অসভ্যের মত হাত বোলাল টেম্পলের পাছায় । তবু যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে টমির দিকে তাকিয়ে হাসল টেম্পল ।

' অ্যাই টমি ! যাঃ ভাগ, ফুটে যা বলছি । ' চাপা গলায় লোকটা টমিকে খেঁকিয়ে উঠল, ' বলি সভ্য ভব্য আর কবে হবি, কাটত ?' তার সেই ধমক শুনে চেয়ারের পায়া মেঝেতে ঘষটাতে ঘষটাতে শেয়ালের ডাকের মত ল্যাক ল্যাক করে হেসে উঠল টমি; লোকটা এরপরে শক্ত হাতে টেম্পলের কবজি ধরে টেনে আনল নিজের কাছে, ভয় মেশানো একরাশ কান্না গলার কাছে উঠে এলেও কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিল টেম্পল, লোকটার হাতে নিজের আঙুলের নখ বিঁধিয়ে দিতে লাগল বারে বারে ।

' ভ্যান, ওকে ছেড়ে দে, ' টেবলের এক পাশ থেকে গলা চড়িয়ে বলল গুডউইন।

' অনেক কাছে এসে গেছো খুকুসোনা ' টেম্পলের দিকে তাকিয়ে বলল ভ্যান ,
' ভ্যান, ওকে ছেড়ে দে বলছি ।' আবার ধমকে উঠল গুডউইন ।

' তুই বললেই ছেড়ে দেব ?' ভ্যান বলল, ' কার গায়ে তাকত বেশি ?'

' ওকে ছেড়ে দে ভ্যান,' গুডউইন আরও একবার বলার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান ছেড়ে দিল টেম্পলকে । ছাড়া পেয়েই পা টিপে টিপে পিছোতে লাগল টেম্পল । রান্নাঘরের যুবতী যে একটা ডিস হাতে খাবাব ঘরে ঢুকে পড়েছে তা দেখতে পায়নি সে । টেম্পলকে ঐভাবে পিছিয়ে আসতে দেখে যুবতী খাবার ভর্তি ডিস হাতে সরে দাঁড়াল এক পাশে । ভ্যান- এর শক্ত হাতের চাপে তার কব্জি এখনও টাটাচ্ছে, কিন্তু সেই টাটানি হাসি মুখে উপেক্ষা করে দু'পাক খেয়ে সে দৌড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল বারান্দায়। সেখান থেকে আবার দৌড়োবার সময় তার পা ঢুকে গেল আগাছার গভীরে, সেই আগাছার ঝোপ থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটতে লাগল টেম্পল, প্রায় পঞ্চাশ গজ দৌড়োনোর পরে আঁধারের ভেতরে একবারও না থেমে একবার পাক খেয়ে আবার সেই বাড়িতে ফিরে এল সে, এক লাফে বারান্দায় উঠে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে এমন সময় টমি ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ।

' ওহো তুমি এখানে বসে আছো ? নাও, যাও,' বলে অদ্ভুত ভঙ্গি করে সে একটা প্লেট তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল ' আমি জানি সেই সকাল থেকে তোমার পেটে দানাপানি কিছুই পড়েনি এতে তোমার খাবার আছে, ধীরে সুস্থে বসে খেয়ে নাও। আমি যতক্ষণ এখেনে আছি ততক্ষণ ঐ জাহান্নামের জীবগুলো তোমার পেছনে লাগতে আসবেনা , নাও, অনেক দৌড় ঝাঁপ করেছো এবারে শান্ত হয়ে খেয়ে নাও ।'

' উনি গেলেন কোথায়, মিসেস - ইয়ে - মিসেস - ?

' উনি তোমার খাবারটা পৌঁছে দিয়েই রান্নাঘরে ফিরে গেছেন,' বলল টমি । শুনেই টেম্পল পা চালিয়ে ভেতরে ঢুকে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে, তার খাবার ভর্তি ডিস হাতে নিয়ে বারান্দায় অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল টমি । ' জাহান্নামে যা হতচ্ছাড়া ।' ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল টমি । তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঘরের হতচ্ছাড়াগুলো এসে হাজির হল বারান্দায় ।

ঐ পুতুল সোনার খাবার হাতে নিয়ে টমিটা এক বুদ্ধুর মত দাঁড়িয়ে আছে, ভ্যান বলল ' ভাবছে পুতুল সোনা ওর জন্য খানিকটা ' জ্যাম ' চেয়ে আনবে রান্নাঘর থেকে,' বলেই সে টমির হাত থেকে খাবার ভর্তি ডিসটা ফেলে দিল । রান্না করা মাংস আর বিস্কুট ছড়িয়ে পড়ল বারান্দায় ।

' কেমন দিলুম বলো, মালখোরবাবু ? ' গাওয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল ভ্যান, ' তোমার ভারি মজা লাগছে, কেমন ?'

' মোটেও না,' চড়ানো গলায় বলল গাওয়ান, ' খাবারটা ওভাবে ফেলে দিয়ে তুমি কিন্তু খুব ভাল করলে না ।'

' বাপ্‌স ।' ভ্যান তড়পে উঠল ' এইটুকু মাল গিলেই এত রোয়াব । তা তুমি

আমার কি করবে শুনি ?'

' কি হচ্ছে ভ্যান , চুপ কর বলছি । ' ধমকে উঠল গুডউইন ।

' আমার কাজ পছন্দ না হলে তুমি কি করবে হে মালখোর ? ' গুডউইনের ধমক উপেক্ষা করে গাওয়ানকে বলল ভ্যান,' আমায় মারবে ?'

' হ্যাঁ, তাই মারব ।' গলা চড়িয়ে ধমক দিল গুডউইন, ' ও নয় আমি মেরে তোর সব চর্বি ঝরিয়ে দেব । তোর বড্ড বাড় বেড়েছে ।' গুডউইনের মারমুখো চেহারা দেখে ভয়ে কেঁচোর মত কুঁকড়ে গেল ভ্যান, সে এবারে গুটি গুটি পায়ে এসে ঢুকল রান্নাঘরে, টমি এল তার পেছন পেছন । ' চলো খুকুমণি একটু ঘুরে আসি,' চেযারের পেছনে দাঁড়ানো টেম্পলকে দেখে বলে উঠল ভ্যান ।

' বেরো, ভ্যান,' তাকে দেখেই শেষে যুবতী বলল ' কে তোকে ঢুকতে বলেছে এখানে ? যা দূর হ ।'

' এসোনা গো সোনামণি খুকুমণি ।' মিনতি ভরা গলায় টেম্পলকে বলল ভ্যান, ' বিশ্বাস করো আমি খুব ভাল দিলদরিয়া আদমি, তোমার এতটুকু ক্ষতিও করবনা ' যুবতীকে ইশারায় দেখিয়ে বলল ' এইত রুবি যাচ্ছে, ওকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো ।' ভ্যান, তুই ভালোয় ভালোয় যাবি নাকি আমি লীকে ডাকব ? যা ভাগ্ এখান থেকে ।' হাতের খুন্তি উঁচিয়ে ভ্যানকে আবার ধমক দিল রাঁধুনী যুবতী রুবি । ভ্যান-এর গায়ে ফৌজি হালকা খাকি সার্ট, পরনে ব্রিচেস, নরম লালচে সোনালি চুলের গা ঘেষে একদিকের কানের পিঠে আধপোড়া সিগারেট । তার খানিক তফাতে চেয়ারে বসে যুবতী রুবি, আর সেই চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে টেম্পল ।

মদের বোতল হাতে টমি বারান্দায় ফিরে গিয়ে গুডউইনকে বলল, ' হতভাগারা মেয়েটাকে এভাবে বিরক্ত করছে কেন, ওর পেছনে লেগেছে কেন ?'

' তার মানে ?' গুডউইন বলল, 'কে ওকে বিরক্ত করছে শুনি ? কে ওর পেছনে লাগছে ?'

' কেন, ভ্যান কিভাবে ওকে বিরক্ত করছে তা ত খানিক আগে নিজের চোখেই দেখলে,' বলল টমি ,' ওরা ওকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছেনা কেন ? মেয়েটা ঘাবড়ে গেছে ।'

' এ নিয়ে তোর মাথা না ঘামালেও চলবে !' শাসন করার গলায় টমিকে বলল গুডউইন, ' কেন ওরা মেয়েটাকে বিরক্ত করছে, কেন ওর পেছনে লাগছে তা নিয়ে তোর মাথা না ঘামালেও বুঝলি, কি বললাম ?'

মেয়েটার পেছনে ওদের এভাবে লাগা বন্ধ করতেই হবে । দেয়ালে ঠেস দিয়ে একগুঁয়ের মত বলল টমি ।

ওদিকে ভ্যান আর গাওয়ান দু'জনেরই অবস্থা শোচনীয়, বোতল থেকে বারবার মদ গলায় ঢালবার ফলে দু'জনের কারও এখন আর দাঁড়ানোর ক্ষমতাটুকু নেই, টলতে টলতে একজন আরেকজনকে শহরের মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করার গল্প শানাচ্ছে । বকবক করতে করতে তুচ্ছ কোনও কথায় একজন আরেকজনের ওপর চটে উঠল; ভ্যান জোরে

এক ধাক্কা দিতে গাওয়ান হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল দেয়ালে । কোন মতে নিজেকে সামলে সে বদলা নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভ্যান-এর ওপর। ভ্যান এর জন্য তৈরী ছিলনা, গাওয়ানকে নিয়ে এসে সে ছিটকে পড়ল টেবলের ধারে , গুডউইন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, এবারে এগিয়ে এসে সে দু'জনকে জোর করে দু'টো চেয়ারে বসিয়ে দিল, তারপর নিজেও এক পাশে বসল । যেন দারুণ ঝগড়াঝাঁটি করে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে এমন মুখ করে চুপ করে বসে রইল ভ্যান আর গাওয়ান ।

' মেয়েটাকে ছেড়ে দাও,' অনেক্ষণ চুপ করে মুখ বুঁজে থাকবার পরে আবার মুখ খুলল টমি, চাপা গলায় গুডউইন বলল, এই হতভাগা মাতালগুলো বেচারীকে জ্বালিয়ে শেষ করে ফেলবে ।'

' ফের তুই এ নিয়ে কথা বলছিস ।' টমিকে আবার ধমক দিল গুডউইন, 'করুক না ওরা যা খুশি তাতে তোর কি । সবাই মিলে ওকে ধরে --- এইটুকু বলেই থেমে গেল সে ।

' ওদেব হাত থেকে বেচারীকে বাঁচানো দরকার, ' ধমক খেয়েও নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল টমি । ঐ পরিবেশে অসহায়ের মত শোনাল তার গলা ।

দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়াল পপি, প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরিয়ে ফুঁকতে লাগল । বারান্দা থেকে উঠে দাঁড়াল টমি, এতটুকু আওয়াজ না করে পা টিপে টিপে বারান্দা থেকে নেমে এল খোলা জমিতে, সেই জমি ধরে অর্ধবৃত্তাকারে হেঁটে পাক খেল বাড়ির চারপাশে । এক তলার একটা জানালায় আলো জ্বলতে দেখে থমকে দাঁড়াল টমি; যে ঘবে কেউ থাকেনা সে ঘরের জানালায় আলো জ্বলছে দেখে টমি বুঝল কেউ আছে সে ঘরে হায় সে যে টেম্পল এবিষয়ে এতটুকু সন্দেহ রইল না তার মনে । পায়ে পায়ে সে ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়াল টমি, দেখল জানালার সাঁর্সির একটা কাচ উধাও, একটা মরচে ধরা টিনের পাত আঁটা হয়েছে সেখানে ।

টমির অনুমান নির্ভুল, ঘরের ভেতরে টেম্পল তখন খাটের ওপর পাতা বিছানায় বসে আছে পা মুড়ে, হাত দুটো কোলের ওপর রাখা, টুপিটা আবার পেছন দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে । খুব ছোটখাটো দেখাচ্ছে টেম্পলকে, মনে হচ্ছে তার বয়স সতেরোর পরে আর বাড়েনি । খাটের ওপর বসে থেকে থেকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে, দু'চোখে ছেলেমানুষি অসহায় চাউনি । ঘরের দেয়ালের পলেস্তারা জায়গায় জায়গায় খসে গিয়ে ভেতরের পুরু চাদর বেরিয়ে পরেছে । টেম্পলদার যে খাটে বসে আছে তার কাছেই দেয়ালের গায়ে একটি বর্ষাতি ঝুলছে, তার পাশেই ঝুলছে খাকি কাপড়ের মোড়া একটা জলের পাত্র যা সাধারণতঃ ফৌজিরা বয়ে বেড়ায় ।

এপাশে ওপাশে তাকাতে তাকাতে একসময় জানলার কাচের ওপাশে দাঁড়ানো টমিকে দেখতে পেল টেম্পল । খানিকক্ষণ তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে চোখ নামিয়ে নিল ।

' হতভাগারা জাহান্নামে যাক । জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় নিজের

মনে বললেও কথাগুলো সবই শুনতে পেল টেম্পল । টমির চোখের সামনেই টেম্পল নেমে দাঁড়াল খাট থেকে, পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দেয়ালে টাঙ্গানো পেরেক থেকে বর্ষাতিটা খুলে নিজের কোটের উপর জড়িয়ে নিল, মেঝেতে পড়ে থাকা তার দলা পাকানো পোষাকগুলো তুলে পাট পাট করে রাখল বিছানার উপরে । টমি জানে বর্ষাতি আর কোটের নিচে এই মুহূর্তে টেম্পলের পরনে শুধু অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছুই নেই । খাটে উঠে মাথা থেকে টুপি খুলে টেম্পল এক পাশে রাখল । তার পরে কোটের ভেতরের পকেট হাতড়ে বের করল একখানা খুদে কমপ্যাক্ট, তাতে প্রসাধন কর্মের যাবতীয় উপকরণ এমনকি একখানা খুদে আয়নাও আছে । সেই আয়নায় চোখ রেখে মুখে পাউডার বোলাল টেম্পল । গালে বোলাল রুজ - এর আলতো প্রলেপ, ঠোঁট রাঙ্গিয়ে চুল ফোলালো । সর্বশেষে কমপ্যাক্ট খানা আগের জায়গায় রেখে হাত ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে বর্ষাতির বোতামগুলো আঁটল সে, তার পরে বালিশে মাথা রেখে পায়ের নিচে রাখা লেপ খানা চিবুক পর্যন্ত ঢাকল । জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে টমি এই সবই দেখল । তার খানিক বাদেই চেনা গলার হৈ হল্লোর তার কানে এল । গলা ছাপিয়ে গুডউইনের কথা শোনা গেল অ্যাই তোরা থাম! বলছি !

সেই হল্লার ছাপিয়ে ভেসে এল গুডউইনের গলা, ' অ্যাই তোরা থাম ! থাম বলছি ! হল্লা থামা !' টমিকেজানালার বাহিরে দেখতে পেয়ে গর্জে উঠল গুডউইন, ' টমি তুই এখানে !' টমি কিছু বলার আগেই গুডউইন এসে দাঁড়াল তার পাশে, টমি দেখল ভ্যান আর পপি পাঁজাকোলা করে বয়ে এনেছে গাওয়ানকে ।

' দরজাটা খোল খুকুমনি !' পাল্লার গায়ে জোরে চাপড় মেরে গলা চড়িয়ে বলল ভ্যান ।

' দ্যাখো এসে, আমরা তোমার জন্য একজন ফূর্তিবাজ খদ্দের নিয়ে এসেছি !'

' অ্যাই, আস্তে !' ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে গুডউইন সবাইকে চুপ করতে বলল, 'সোন' দরজা ভেতর থেকে খোলা ঠেললেই খুলে যাবে । '

' খোলা ? খুব ভাল ! 'বলে দরজার পাল্লায় লাথি মারল ভ্যান, সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল দরজা । হল্লা শুনে খাট থেকে নেমে এসেছে টেম্পল, তার চোখের সামনেই গাওয়ানকে পাঁজাকোলা করে বয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে । খাটের কাছে এনে ভ্যান আর পপি গাওয়ানকে শুইয়ে দিল বিছানায় । গাওয়ান গোঙানির মত আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান ডান হাতের তেলোর উল্টো দিক দিয়ে টেনে এক থাবড়া মারল তার মুখে । সেই আঘাতে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এল ।

' চুপ করে শুয়ে থাক খানকির বাচ্চা ' হাতের মুঠো উঁচু করে ঘাওয়ানকে ধমকে উঠল ভ্যাসন ,' একটা কথা বললে মাথা ভেঙে দেব '

এদের সঙ্গে গুডউইনের স্ত্রী রুবিও ঢুকে পড়েছে ভেতরে দরজার চৌকাঠে ঠেস দিয়ে টমির গা ঘেঁষে সে দাড়িয়ে আছে ।

' ভ্যান, ' ভারি গম্ভীর গলায় বলল ওডউইন তুই বেরো এখান থেকে !'

' বেরো বললেই বেরোন যায় না কি ? আমি .... বলে মুখ তুলে ইশারায় টেম্পল কে দেখিয়ে কিছু বোঝাতে চাইল ভ্যান । আর তা বুঝতে এপরেই গুডউইন ঝাপিয়ে পড়ল তার উপর ।

বাঁচাও...... রক্ত মাখা ফাটা ঠোঁটে জিব বুলিয়ে কাতরাতে কাতরাতে বলে উঠল গাওয়ান । ' মেয়েটা বড্ড কচি, তোমরা ওর কোনও ক্ষতি কোর না । ' এরই মাঝে আচমকা গুডউইনের হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে এল ভ্যান । এসেই বিছানার উপর পড়ে থাকা টেম্পলের পোষাক তুলে উঁচু করে সবাইকে দেখাতে লাগল । সঙ্গে সঙ্গে যুবতী টেম্পলের পরনের সস্তার কোটের তলা থেকে রাত পোষাকটা খসে পড়ল তার পায়েব কাছে ।

' ভ্যান, ' গুডউইন আবার বলল, ' তোকে অনেক্ষন আগে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছি । ভাল চাসতো..... এটুকু বলেই থেমে গেল সে।

' হ্যাঁ, হ্যাঁ, ' ব্যাজার গলাই বলল ভ্যান, ' তোমার কথা আমার ঠিকই কানে গেছে, বলতে বলতে হাতে ধরা টেম্পলের পোষাকগুলো ঝাঁকিয়ে সে ছুরে ফেলে দিল, তার পরে চোখ তুলে তাকাল তার দিকে । টেম্পল গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক কোনে, দুহাতের আঙ্গুলে দু কাঁধ আড়া আড়ি ভাবে ধরেছে । গুডউইনকে এগিয়ে আসতে দেখে ভ্যান পা চালিয়ে দাঁড়াল খাটেব ওপাশে । যুবতী রুবি একপাশে আপন মনে সিগারেট টানছে পপি, আর এক পাশে দাঁড়িয়ে ভ্যানের দিকে দু চোখ পাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষছে টমি । তার চোখের সামনে ভ্যান টেম্পলের বর্ষাতি খামচে ধরে টেনে খুলে ফেলল, ঠিক তখনই গুডউইন লাফিয়ে গিয়ে পড়ল তার উপর, সঙ্গে সঙ্গে ভ্যান কবার পাক খেয়ে নিচু হয়ে তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাল । কিন্তু পর মুহূর্তে গুডউইন ভ্যানকে দুহাতে জাপটে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল ঘরের ঠিক মাঝ খানে। ভ্যান - এর খামচিতে ছিঁড়ে গেছে টেম্পলের ছেঁড়া বর্ষাতি, দু হাতে আঁকড়ে ধরে জল ভরা চোখে দেখছে দুজনের হাতা হাতি । টেম্পলের চোখের সামনে এক ধাক্কা মেরে ভ্যানকে মেঝেতে ফেলে তার বুকের উপর উঠে দাঁড়াল গুডউইন । দেখল পপি টেম্পলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছে, পপির দু ঠোঁটের মাঝখানে ঝুলছে জ্বলন্ত সিগারেট ।

' হুঁসিয়ার পপি, ' বুক কাঁপানো গলায় বলে উঠল গুডউইন, 'বাঁচতে চাসত মেয়েটাকে ছুঁসনা । তোর ডান পকেটের যন্তোরটাকে যে আমি ভয় পাইনা তা তোর চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না । '

ভ্যান- এর মাথা যেখানে পরে আছে তার কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে পপি তার ডান হাত ঢুকাল ট্রাউজার্সের ডান পকটে ।

' ফের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছিস পপি ? ' ধমকে উঠল গুডউইন, ' কি বললাম শুনতে পাসনি ? যা বেরিয়ে যা এঘর থেকে, সেই সঙ্গে এই ভ্যান হারামজাদাকেও বের করে নিয়ে যা । আমার মেজাজ তো জানিস, এক বার মাথায় রক্ত চড়ে গেলে আমি ওকে ঠিক খুন করে ফেলব । গুডউইনের কথার প্রতিবাদ না করে ট্রাউজার্সের পকেট

থেকে হাত বের করে আনল পপি । টমির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভ্যানকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে । বেহুঁস গাওয়ানের নাক ডাকা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সবাই ।

সঙ্গিনী রুবির পরনে ম্যাড়মেড়ে পুরোনো ছেঁড়া ঢোলা রাত পোষাকের দিকে তাকিয়ে গুডউইন বলল, ' এটা কি পরেছো ? ঘরে পড়ার আর কোনও ভাল জামা তোমার নেই ? '

' ছিল,' শক্ত গলায় পাল্টা জবাব দিল রুবি, ' আরো অনেকগুলো ছিল, গরিব নিগ্রো কাজের মেয়েদের বিলিয়ে দিতে এখন এই একটায় এসে ঠেকেছে । ছিঁড়তে ছিঁড়তে যা দশা হয়েছে, এখন কাউকে এটা দান করতে গেলে হো হো করে হাসবে । যাক, তবুও ভাল এতদিন তোমার নজর পড়ল যে ঘরে পড়ার মত কাপড়ও আমার নেই।'

' আমার চোখ সব দিকেই নজর রাখে রুবি,' গুডউইন হেসে বলল, ' তাই এই পসগুলো আমার কথার ওপর কখনও কিছু বলতে পারে না । ' রুবি কিছু না বলে চুপ করে রইল, তার কাঁধে হাত রেখে গুডউইন বলল, ' রাত বাড়ছে রুবি, যাও এবারে গিয়ে শুয়ে পড়ো ।'

' কি বোকা তুমি লী, ' আক্ষেপের গলার সুরে বলল রুবি, ' যে খেলা ভ্যান শুরু করেছিল তা ওকে শোধরাতে দিলে না কেন ?

' ঠিকই বলেছো, রুবি, আমি বড্ড বোকা,' সায় দিয়ে বলল গুডউইন, 'বাচ্চাদের তো খিদে পেয়েছে ! যাও, এবার গিয়ে শুয়ে পড়ো ।'

ঘরের ভেতরে কালিঢালা আঁধার ভেতর দরজায় গা ঘেঁষে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যুবতী রুবি, গাওয়ানের নাকের ডাক আর বাইরে বারান্দায় বাকি সবার হাঁটাচলা সবই তার কানে আসছে । খানিক বাদে বাইরে বারান্দায় চলাফেরার আওয়াজ থিতিয়ে আসতে আসতে এক সময় থেমে গেল । এখন গাওয়ানের নাকের ডাক আর একটানা গোঙানি ছাড়া আর কিছু তার কানে আসছেনা । আরও খানিক বাদে দরজার পাল্লা নিঃশব্দে খুলে গেল । পা টিপে টিপে কে যেন ঢুকল ভেতরে । আলো না থাকলেও সে যে গুডউইন নিকষ আঁধারে তা বুঝতে যুবতী রুবির এতটুকু ভুল হল না । টেম্পল তখনও বসে আছে খাটে । আন্দাজে ভর করে গুডউইন তার কাছে এসে বলল ' আমায় বর্ষাতিটা দাও,' ' বিছানায় উঠে আমার গা থেকে খুলে নাও ।' জবাব দিল টেম্পল । মসমস আওয়াজ তুলে গুডউইন তার বর্ষাতি টেম্পলের গা থেকে খুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল, তার খানিকবাদে চুলে মাখবার চেনা ক্রিমের গন্ধ নাকে আসতে বুঝল পপি ঢুকছে ভেতরে । পপির পেছন পেছন টমিও বেড়ালের মত পা টিপে টিপে এসে ঢুকল । জাহান্নামের এই জঘন্য জীবগুলোর সঙ্গে দিনরাত ওঠাবসা করতে করতে

নিকষকালো আঁধারে শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে তাদের চিনতে লী গুডউইনের যুবতী সঙ্গিনী রুবির এতটুকু কষ্ট হয় না। আঁধারে পপির দু'চোখ বেড়ালের মত জ্বলে, তাই রুবি দেখল ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পপি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিছানার দিকে যেখানে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে বেহুঁশা গাওয়ান। তার গা ঘেঁষে শুয়ে টেম্পল। টমি যে তার পাশে বসে হতাশা চোখ ফ্যালফ্যাল করে খাটের দিকে তাকিয়ে আছে ঘাড়না ফিরিয়েও তা দিব্যি টের পাচ্ছে রুবি। আরও খানিক্ষণ বাদে চুলে মাখার ব্রিলিযানিষের। চেনা গন্ধের ঝলক নাকে আসতে রুবি বুঝল পপি বেবিয়ে যাচ্ছে ঘব থেকে। টমি এখনও পাশে বসে আছে কিনা তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে রুবি এবারে এগিয়ে এসে টেম্পলকে ছুঁয়ে দেখল। টেম্পল এতক্ষণ ঘ্মোছিল। সেই ছোঁয়া লাগতে তার ঘুম গেল ভেঙ্গে। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, ' আমি বাবাকে বলে দেব, আমি বাবাকে ঠিক বলে দেব।'

' ধ্যাত বোকা মেয়ে!' চাপা গলায় তাকে ধমক দিল রুবি, ' চুপচাপ উঠে পা টিপে হাঁটতে পারবে?'

' হ্যাঁ, পারব ' প্রবল আত্মবিশ্বাসের গলায় বলল টেম্পল, ' তুমি আমায় এখান থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে?'

' পারব বইকি ' আশ্বাস দিয়ে রুবি বলল, ' তুমি এবারে চটপট উঠে পড়ো।' টেম্পল বালিস থেকে মাথা তুলে নামতে যেতেই তার মাথা গেল ঘুরে। টেম্পল পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু তাব আগেই যুবতী রুবি তাকে দু'হাতে ধরে বলল, ' নিজেকে শান্ত তোমায় রাখতেই হবে,' রুবি বলল, ' নয়ত চলবে না ' নিজেকে শান্ত করো অত উত্তেজিত হয়োনা।'

' আমার জামা কাপড় গেল কোথায়?' গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল টেম্পল, ' জামা কাপড় কিছুই যে আমার গায়ে নেই .... '

' আবার মাথা গরম করছ!' গলা নামিয়ে ধমক দিল যুবতী রুবি, ' তুমি সত্যিই তোমাব জামা কাপড় ফেরত চাও, নাকি এখান থেকে চলে যেতে চাও?'

তার ধমকে জাদুর মত কাজ হল, টেম্পল নিমেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ' হায় তুমি যা বলবে যেমন বলবে তাই করব, আমি যত শীগগির পারি এখান থেকে চলে যেতে চাই।'

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে রুবি, টেম্পল এল তার পেছন পেছন। খালিপায়ে আঁধারে তাদের ভূতের মত দেখাচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে রুবি টেম্পলকে নিয়ে এল খামার বাড়িতে। দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে কি একটা যেন দৌড়ে গেল টেম্পলের পায়ের ওপর দিয়ে, ভীষণ ভয় পেয়ে সে দু'হাতে আঁকড়ে ধরল রুবিকে।

' ভয় নেই।' আশ্বাস দেবার গলায় রুবি বলল, ' ওটা ইঁদুর, এখানে এমন আরও অনেকগুলো বাসা বেঁধেছে। মুসকিল হয়েছে এখানে খাট বিছানা কিছু নেই। এককোনে অনেকগুলো তুলো বিচির খোসা পড়ে আছে, তুমি আরামে তার ওপর শুয়ে পড়তে পারো।

‘ এসো, তোমায় ওগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি ।’ টেম্পল কিছু বলতে না পেয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রইল সেই আঁধারে ।

সকালবেলা বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে রুবি তাকে তার কাঠের বাক্সে পাতা বিছানায় শুইয়ে রেখে ব্রেকফাস্ট তৈরী করতে বসল । খানিকবাদে একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে আসতে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে পেল গাওয়ান বারান্দা পেরিয়ে এসে বাড়ির দরজার পাল্লায় ঘা দিচ্ছে । গাওয়ানের সুন্দর মুখে দু'তিন দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, ভ্যান্‌- এর হাতে বেধড়ক মার খেয়ে একটা চোখ বুঁজে আছে, দেখে মনে হচ্ছে গাওয়ান এক চোখ বুঁজে ঘুমোচ্ছে, কাটা ঠোঁটের ক্ষত শুকোলেই সেখান থেকে গড়ান রক্তের ছোপ লেগেছে শার্ট কোটের অনেক জায়গায় । গাওয়ান কি বলতে চাইছে বুঝতে পারল না রুবি, সে হাত নেড়ে বলল ‘ দাঁড়াও, আমি গামলা এনে দিচ্ছি, আগে চোখ মুখধুয়ে নাও ! ’

গাওয়ান এবারে আরও কি যেন বলতে চাইল । কিন্তু ফাটা ঠোঁটের ভেতর দিয়ে তার বক্তব্য বোঝা গেল না । না গেলেও সে যে টেম্পলের খোঁজ নিচ্ছে এটুকু রুবি ঠিকই বুঝতে পারল ।

‘ ও খামার বাড়িতে ঘুমচ্ছে,’ চেঁচিয়ে বলল রুবি, ‘ আমি অনেক রাত পর্যন্ত ছিলাম ওর সঙ্গে । ’

টেম্পল সুস্থ আছে জেনে গাওয়ানকে শান্ত দেখাল, এবারে ও জানতে চাইল ধারে কাছে কোথাও গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে কিনা ।

‘ এখান থেকে প্রায় দু মাইল দুরে টুলস -এর গারাজ । চেঁচিয়ে বলল রুবি, ‘ওরা গাড়ি ভাড়া দেয় । তুমি চোখ মুখ ধুয়ে এসে ব্রেক ফাস্ট খেয়ে নাও । ’

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল গাওয়ান, এসে দাঁড়াল রান্নাঘরের বাইরে । রুবি কে বলল, ‘ গাড়ি একটা জোগাড় হলে টেম্পলকে আজই ফিরিয়ে নিয়ে যাব । ওতো এখনও স্কুলে পড়ে, সবার চোখ এড়িয়ে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে স্কুল থেকে । ওর সঙ্গে পড়ে এমন কোনও মেয়েকে ধরে কায়দা করে আবার ওকে স্কুলে ঢুকিয়ে দিতে হবে, তাহলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে, কি বলো ?' বলতে বলতে সামনে টেবিলের উপর পড়ে থাকা প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বের করে ফাটা ঠোটে গুঁজল গাওয়ান । তার হাত থর থর করে কাঁপছে দেখে রুবি দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে দিল । কয়েকটা টান দিয়েই ধোঁয়া ছেড়ে গাওয়ান রুবিকে বলল, ‘ যাওনা, গাড়িটা যোগাড় করে দাওনা । ’

গাড়ির ব্যবস্থা হবে, রুবি বলল ‘ আগে কিছু খেয়ে নাও, তার আগে এক কাপ কফি করে দিচ্ছি, খেয়ে নাও । গরম কফি গলায় পড়লে অনেক ভাল লাগবে । ’

‘ ওসব পরে হবে, ’ বলে ঘুড়ে দাঁড়াল গাওয়ান, রান্না বান্না ছেড়ে আগে একটা

গাড়ি যোগাড় করে দাও ! হুকুম দেবার গলায় কথাগুলো বলে সে সরে এসে চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিল ।

' ব্রেকফাস্ট খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাওয়ান দেখল তার খোয়াড়ি এখনও কাটে নি । হাটতে গেলে পা টলছে, ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলো আবছা ভাবে মনে পড়ছে । হাঁটতে হাঁটতে সেই পথে গিয়ে পৌঁছোল সে সেখানে গাছের গায়ে ধাক্কা লেগে তার গাড়ি উল্টে গিয়েছিল । গাড়িটা এখনও সেদিনের মতই উল্টে পড়ে আছে পথের উপর । পাশেই ঝর্নার ঠান্ডা জলে চোখ মুখ ধোয়ার পরে গাওয়ান আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করল । ঝর্নার জলে নিজের মুখের প্রতিফলন দেখে সে হতাশ হল । সাত সকালে মদ গিলতে গুডউইন গাড়িতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে হল সঙ্গে সঙ্গে টেম্পলের মুখটা তার মনে পড়ে গেল, টেম্পল যে ওখানে এক পাল অমানুষের মধ্যে পড়ে আছে তা উপলব্ধি করল গাওয়ান ।

হাঁটতে গাওয়ান বড় রাস্তার কিছু দূরে পৌঁছে দেখল সূর্য অনেকটা উঠে এসেছে। গাড়ি ভাড়া করে আবার ফিরে এসে টেম্পলকে নিয়ে যাবে, এটাই ভাবল সে । যে, শহরে ফেরার পথে টেম্পলকে কি বলবে, কি ভাবে বোঝানোর ফাঁকে হাল্কা বকুনি দেবে, মনে মনে এসব ভাবতে লাগল গাওয়ান । ফাটা ঠোঁটের রক্তে ছোপ লাগা শার্ট আর কোটের কথা যত বার মনে পড়ল তত বাড় লজ্জা আর চাপা উত্তেজনায় মাটিতে মিশে গেল সে ।

কিন্তু টুলস-এর গ্যারাজের কাছাকাছি পোঁছে গাওয়ান দেখল টেম্পলকে নিয়ে আসার জন্য আবার এই বাড়িতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা তার কখন কোন ফাঁকে উধাও হয়ে গেছে উল্টো দিক থেকে গাড়ি আসতে দেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে থামাল গাওয়ান । এক বার আনুরোধ করতেই চালক তাকে শহরে পৌঁছে দিতে তুলে নিল ।

চালের ফাঁক ফোকর গলে সকালে রোদ চোখে মুখে পড়তেই টেম্পলের ঘুম গেল ভেঙে । দরজা খোলা পেয়ে পা চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, কয়েক পা এগোতে অন্ধ আর কালা বুড়ো টাকে দেখতে পেল টেম্পল, হাঁটতে গিয়ে লোকটার পরনের ট্রাউজার্স বার বার খসে খসে পড়ছে, এক হাতে লাঠি আর অন্য হাতে কোমড় চেপে ধরে পা ফেলছে । পাশকাটিয়ে বাড়ির বারান্দায় ওঠার পড়েও বুড়োর লাঠির ঠুক ঠুক আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল টেম্পল । কোটটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল সে, তার পরে পা চালিয়ে এসে দাঁড়াল হলের মাছখানে । দরজা খুলে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল টেম্পল। এক পাশে খাটের উপর পাতা বিছানা খালি, জায়গায় জায়গায় তালি মারা লেপটা গড়াচ্ছে তার উপর খাঁকি কাপড়ে মোড়া জলের বোতল আর তার নিজের এক পাটি চটি পড়ে আছে বিছানায় । তার জামা কাপড় আর টুপি

গড়াচ্ছে মেঝেতে। অনেক হাতড়েও বিছানার উপর আর এক পাটি চটি খুঁজে পেলনা টেম্পল। অনেক খোঁজা খুঁজি করার পরে নিখোঁজ আর এক পাটির হদিস পেল ফায়ার প্লেসে এক রাশ পোড়া কাঠের ছাই- এর ভেতরে। টেম্পলের মনে হল চটির এই পাটিটা কেউ যেন ইচ্ছে করেই ছুঁড়ে ফেলে ছিল ওখানে। ছাই ঝেড়ে এই পাটিটা সে বিছানার উপর রাখা অন্য পাটির পাশে রাখল। জলের বোতলটা দেওয়ালে যেখানে ছিল সেখানে টাঙ্গিয়ে রাখল। তার পরে কোট খুলে জামা কাপড় সব পড়ে ফেলল টেম্পল, আর রাখতে গিয়ে খাকি কাপড়ে একটা ফৌজি নম্বর তার চোখে পড়ল।

লম্বা সরু সরু দুটো ঠ্যাং, তেমনি রোগা দুটো হাত, আপেলের মত ছোট এক জোড়া নিতম্ব - এই দৈহিক বৈশিষ্ট্য ছেলে মানুষের মত দেখালেও টেম্পল এখন যেমন আর কচি মেয়েটি নেই, তেমনি পরিপূর্ণ নারীও তাকে বলা যায় না। এখন আর আমার কোন ভয় নেই, জামাকাপড় পড়ে মনে মনে ভাবল টেম্পল, যে কোন লোকের মুখো- মুখি হতে পারি, যেকোন কঠিন পরিস্থিতির মুখো- মুখি হতে পারি। এক পাটি মোজার ভেতর থেকে কালো ফিতে আঁটা এক খানা খুদে হাতঘড়ি বের করে চোখের সামনে নিয়ে এল টেম্পল কাঁটায় কাঁটায় নটা। চিরুনির তোয়াক্কা না করে আঙ্গুল দিয়ে মাথার চুল আঁচড়ে নিল সে, আর তার ফলে তিন চারটে তুলো বিজের খোসা ঝেড়ে ফেলল মাথা থেকে। টুপি আর কোট তুলে নিয়ে টেম্পল এসে হাজির হল পেছনের বারান্দায়। একটা গামলায় খানিকটা নোংরা জল পড়ে আছে, চিন্তা ভাবনা না করে তাই দিয়েই ঘষে ঘষে মুখ ধুয়ে ফেলল সে। কাছেই দেয়ালে আঁটা পেরেকে ঝুলছে ময়লা তোয়ালে।

প্রবল অনিচ্ছায় তাই দিয়ে ভেজা মুখ আর দুহাত মোছার সময় দেখতে পেল রান্নাঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে গুডউইনের সঙ্গিণী রুবি বাচ্চা কোলে নিয়ে তাকে লক্ষ্য করছে।

'গুড মর্নিং' বলে এগিয়ে এল টেম্পল, বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে, তাকে পিঠের উপর ফেলে রুবি রান্নাঘরে ঢুকল, টেম্পল এল তার পেছন পেছন। এককাপ কফি রুবি তুলে দিল তার হাতে দু টুকরো সেঁকা রুটি উনুন থেকে তুলে দিতে গেল রুবি, সঙ্গে সঙ্গে টেম্পল বাধা দিয়ে বলল। 'থাক, গত দু'দিন আমার পেটে কিছু পড়েনি তবু এখনও আমার খিদে পায়নি ভারি মজা না ?' সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভেতরে প্রবল প্রাকৃতিক নিম্মচাপ অনুভব করল টেম্পল।

বলল 'ইয়ে তোমাদের এখানে বাথরুমটা কোনদিকে বলোত ?'

'কি বললে, বাথরুম ?' বলে রুবি তার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকাল যেন এই পরিবেশে বাথরুম কোথায় জিজ্ঞাস করে টেম্পল মহা অন্যায় করেছে। একটা তাকে রাখা পুরানো বাতিল মেল অর্ডার ক্যাটলগ থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে তার হাতে দিয়ে রুবি নির্লজ্জের মত বলল পেট পরিষ্কার করতে হলে তোমায় আবার খামার বাড়িতেই যেতে হবে সোনা, আমরাও ওখানেই গিয়ে একাজ সারি।'

'আমিও যাব ?' ছেঁড়া কাগজগুলো মুঠোয় চেপে ধরে বলল টেম্পল, 'আবার

ঐ খামার বাড়িতেই ?'

' হ্যাঁ , তাই যাবে ' হুকুম দেবার গলায় বলল রুবি,' ভয় নেই, ওরা কেউ এখন ধারে কাছে নেই । সকালবেলায় ওরা তোমায় জ্বালাতে আসবেনা ।'

' খামার বাড়ি থেকে ফেরার পথে অস্বস্তি অনুভব করতে ঘাড় বেঁকাল টেম্পল, স্পষ্ট দেখতে পেল খানিক দূড়ে দাঁড়িয়ে কে যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে । অল্প কিছুক্ষণ আগে যে প্রবল আত্মবিশ্বাস আর সাহস অর্জন করেছে ভেবেছিল, লোকটাকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে তা নিমেষে উধাও হল, ভয়ে বাড়ির দিকে জোরকদমে পা চালল টেম্পল । বাড়ির কাছাকাছি এসে মুখ তুলতেই চোখে পড়ল সামনের বারান্দায় একটা ভাঙ্গা চেয়ারে বসে সেই অন্ধ কানা বুড়ো সূর্যের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে । জোরে দৌড়োতে দৌড়োতে বাড়িতে ঢুকে পড়ল আগে । দুই লাফে বারান্দা পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, রান্নাঘরে এসে দেখে; ঘুমন্ত বাচ্চাকে নিয়ে টেবলের ধারে বসে আপনমনে সিগারেট টানছে রুবি । টেম্পলের উত্তেজিত চোখমুখ দেখে অবাক হয়ে সে বলল, ' কি হল, তোমার, অত হাঁপাচ্ছো কেন ?'

' খামারবাড়ি থেকে ফেরবার সময় দেখলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে টেম্পল বলল, খানিক দুরে ঝোপের ভেতরে দাঁড়িয়ে কে যেন তাকিয়ে আছে আমার দিকে ।'

' কে লোকটা ?' কুতকুতে চোখ তুলে বলল রুবি । ' চিনতে পারলে ?'

' না,' ভয়ে ভয়ে বলল দরজার দিকে তাকাল টেম্পল আর সঙ্গে সঙ্গে রুবি নিজের বাচ্ছাটাকে কোলের ওপরে ধরেই অন্য হাতে চেপে ধরল টেম্পলের হাতের কব্জি । ঠিক তখনই রুবির পুরুষ সঙ্গি লী ও গুডউইনকে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখল টেম্পল । তাকে দেখতে পেয়েই উত্তেজিত হয়ে উঠল টেম্পল, ' ছাড়ো আমায় ছেড়ে দাও বলছি,' বলতে বলতে হ্যাঁচকা টানে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল রুবির হাতের শক্ত মুঠো থেকে, পরমুহূর্তে রান্নাঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে হলের ভেতর দিয়ে দ্রত পায়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়, সেখান থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে পৌঁছোল খামার বাড়ির কাছে । ভেতরে ঢোকবার পরে কাঠের মেঝের তক্তার ফাঁকে পা আটকে পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে । একরাশ ধুলো তাদের ফাঁকফোকর থেকে উড়ে এসে তার চোখে মুখে আর চুলে লেগে মাখামাখি হয়ে গেল । সে শুয়ে শুয়েই একরাশ তুলোচির খোসার মাঝখানে একজোড়া গনগনে খুদে চোখ দেখতে পেয়ে গোড়ায় চমকে উঠল টেম্পল, পরমুহূর্তে চোখ দুটো একটা ধেড়ে ইঁদুরের বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হল । হাতে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল টেম্পল । দরজার দিকে ছুটে যেতে যেতে ইঁদুরটাকে দেখার জন্য বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে সে তাকাতে লাগল ।

বাচ্চাকে কোলে জাপটে ধরে রান্নাঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে রুবি। এমন সময় গুডউইন এসে দাঁড়াল তার সামনে, চাপা গলায় বলল ' ওটা গেল কোন

দিকে ?'গুডউইনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা চোলাইয়ের উৎকট গন্ধে রুবির নাক জ্বলে গেল, ক্ষুব্ধ গলায় বলল, ' ও এখানেই নেই । ওকে তুমি আর খুঁজে পাবে না, ও চলে গেছে এখান থেকে ।'

গুডউইন তার কাঁধে হাত রাখতেই রেগে মেগে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সে হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, ' খবরদার ! আমায় একদম ছোঁবে না বলে দিচ্ছি । রুবির হাব ভাবে রেগে উঠল গুডউইন, রুবির কবজি মুঠোয় চেপে ধরে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল এক কোনে । ক্ষেপে উঠে রুবি সবজি কাটার ছুরি তুলে গুডউইনকে আঘাত হানতে গেল । কিন্তু তার আগেই রুবির কবজি শক্ত মুঠোয় চেপে ধরায় সেই ছুরির ঘা থেকে বেঁচে গেল গুডউইন । ছুরি দিয়ে আঘাত হানতে না পেরে তার দু'গালে ঠাস্ ঠাস্ করে দু'বার দুটো থাপ্পর মনের সুখে মারল গুডউইনকে, বদলা নিতে গুডউইন পাল্টা থাপ্পর মারল রুবিকে । পাছে ঘুমন্ত বাচ্চার গায়ে চোট লাগে এই ভয়ে রুবি তাকে আগের মতই উনুনের পেছনে কাঠের বাক্সে পাতা বিছানা থেকে তুলে রুবি রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ।

খামার বাড়ির মেঝেতে দাঁড়িয়ে হাঁ করে গুডউইনের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে টমি, অন্ধ বধির বুড়োটা আগের মতই সামনের বারান্দায় ভাঙ্গা চেয়ারে বসে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে । ঘুমন্ত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রাস্তার সেই জায়গায় যেখানে গাওয়ানের ওল্টানো গাড়িটা এখনও পড়ে আছে গোটা পথ জুড়ে । আরও প্রায় একশো গজ হেঁটে রুবি পৌছোল ঝর্ণার কাছে, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে কোলের বাচ্চার মুখে রোদ এসে পড়ছে, সেই রোদ ঢাকতে পরনের সুতোর কোর্ট তুলে বাচ্চার মুখ ঢেকে দিল রুবি ।

কাদামাখা জুতো পায়ে পপি বেরিয়ে এল ঝোপের ভেতর থেকে, রুবিকে দেখতে দেখতে সাবধানে পা ফেলে এসে দাঁড়াল ঝর্ণার ওপাশে । কোর্টের একদিকের পকেটে হাত গলিয়ে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজল পপি, দু'আঙ্গুলে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল গুডউইনের বাড়ির দিকে, তারপরে চোখ নামিয়ে রুবিকে শুনিয়ে চাপাগলায় বলল, ' এখান থেকে দেখে ওটাকে ভূতের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে । বুঝলে কিনা ক'দিন আগে এক শুয়োরের বাচ্চা এখানে এসে বলল ও নাকি উকিল, বেনবো না কি যেন নাম বলল । খানকির বাচ্চা জানতে চাইল আমি বইপত্তর পড়ি কি না ?' রুবি কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল ।

' আমি কেটে পড়ছি এখান থেকে, বুঝলে ?' রুবির মাথায় সোনো বনেটের দিকে তাকিয়ে আবার একই গলায় বলল পপি, ' এখানে ঢের হয়েছে, আর না । দেখি শহরে গিয়ে বরাত ফেরানো যায় কিনা ......' রুবি এবারেও আগের মতই জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল । রুবি তাকে পাত্তা দিচ্ছেনা দেখে পপি এবারে সত্যি সরে গেল সেখান থেকে । কাছেই জলার ভেতর এক নাম না জানা অচেনা পাখির মিষ্টি গলার গান ভেসে এল ।

গুডউইন বাড়িতে ঢোকার আগে পপি রাস্তার একপাশে একটা কাঠের চালের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। কিছুদূর গিয়ে পপি দেখল একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গুডউইন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে খামারবাড়ির দিকে। কাঠের ঢালুপথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল পপি। দেশলাই জ্বালানোর আওয়াজ কানে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকাল গুডউইন, পপি এবারে এসে দাঁড়াল তার পিছনে, গর্তের মত নাকের ফুটো দিয়ে একরাস ধোঁয়া ছেড়ে বলল ' আমি এখান থেকে কেটে পড়ছি, বুঝলে ?' মুখ না তুলে বাপ মা তুলে তাকে গালি দিল গুডউইন। ' বলছি আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, লী বুঝলে কি বললাম ? ' গুডউইন আগেরমত খামার বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে আবার গালি দিল তাকে। আর কিছু না বলে পপি এবারে পা বাড়াল গুডউইনের বাড়ির দিকে, কয়েক পা এগিয়ে দেখল দৃষ্টিহীন বধির বুড়ো মানুষটা অন্ধচোখে সূর্যের দিকে মুখ তুলে বসে আছে বারান্দায়। বাড়িতে না ঢুকে লনে এসে দাঁড়াল পপি, সারি সারি গাছের আড়ালে আড়ালে হেঁটে আগাছার জঙ্গল মাড়িয়ে পেছন দিক দিয়ে ঢুকল খামার বাড়িতে।

দরজার পাশে উবু হয়ে বসে আছে টমি, চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে আছে গুডউইনের বাড়ির দিকে। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রাগ রাগ চোখে কিছুক্ষণ তাকে দেখল পপি, তারপরে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টমির নজর এড়িয়ে সে ঢুকে পড়ল ভেতরে, চালের নিচে ফসল রাখার জন্য টানা লম্বা কাঠের তাক আছে, জানালার চৌকাটে পা রেখে সেই তাকে দিব্যি উঠে পড়ল পপি, গাদা করে রাখা ফসলে গা ডুবিয়ে শুয়ে পড়ল দরজার দিকে পেছন ফিরে। টমি তখনও তাকিয়ে আছে গুডউইনের বাড়ির দিকে, পপিকে তখনও তার চোখে পড়েনি।

খামারবাড়ির ভেতরে টানা হলঘরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে তা টমির নিজেরও খেয়াল নেই। একসময় ডাকবার দরজা খুলে ভেতর থেকে মুখ বাড়াল টেম্পল। টমিকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোড়ায় চমকে উঠল সে, তারপরেই খুশি মেশানো এক আস্থা পেয়ে বসল তাকে, একবার ঘুরে ছুটে এসে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরতে যেতেই চোখ পড়ল খিড়কির দরজার দিকে। টেম্পল দেখল খিড়কির খোলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে লী গুডউইন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। গুডউইনকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল টেম্পল ' ঈ — ঈ — ঈ ....' গোছের একে ভীত চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। টমিকে ছেড়ে আবার পা চালিয়ে ডাকার জন্যে ভেতরে ঢুকতে গেল টেম্পল, আর তখনই কানে এল টমির গলা, ' ভয়ের কিছু নেই, লী বলছে, ও তোমায় মারবেনা, শুধু তোমার পাশে শুয়ে আজকের রাতটুকু কাটাতে চাইছে ও, তুমি ওর কথায় রাজি হয়ে যাও, তাহলেই

দেখবে আর ভয়ের কিছু নেই । বলতে বলতে টেম্পলের উরুতে হাত বোলালো টমি । আশ্বস্ত করার গলায় আবার বলল, ' আমায় বিশ্বাস করো, বলছিত লী তোমার কোনও ক্ষতি করবেনা, শুধু আজকের রাতটুকু তুমি ওর পাশে .... ' ।

' থাক বুঝেছি,' টমির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল টেম্পল, ' তুমি ঐ লোকটাকে ভেতরে ঢুকতেই দেবেনা বলে দিচ্ছি ।' ' শুধু ওকে একা ?' টেম্পলের হুকুম দেবার গলা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল টমি, ' ওর বাকি যে ক'জন দোস্ত আছে তাদেরও ঢুকতে দেবনা বলছ ?'

' বাকিগুলো ইঁদুর, ছুঁচো ছাড়া কিছু নয়,' আচমকা সাহসে ভর করে বলে ফেলল টেম্পল ,' আমি ওদের একটাকেও আর ভয় পাইনা । তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে নজর রাখো, একটাকেও ভেতরে ঢুকতে দিওনা ।'

' তবে তাই হোক,' তার কথায় সায় দিয়ে বলল টমি, ' আমি এখানেই রইলাম, দেখব যাতে ওরা কেউ তোমার নাগাল না পায় ।'

' হ্যাঁ, সেই ভাল ' টেম্পল গলা নামিয়ে বলল ' তুমি দরজা বন্ধ করে দাও, ওদের একটাকেও ভেতরে ঢুকতে দিও না ।'

' তাই দিচ্ছি,' বলে টমি সত্যিই বাইরে থেকে দরজা এঁটে দিল । ভেতরে দরজার বন্ধ পাল্লায় ঠেস দিয়ে টেম্পল তাকিয়ে রইল গুডউইনের বাড়ির দিকে । লোকটার মেজাজ জানতে তার বাকি নেই । পাছে টমিকে চড় থাপ্পর মেরে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে এই ভয়ে সে ভেতর থেকে বন্ধ দরজার পাল্লায় পিঠ দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে রইল । লী বলছে ও তোমায় মারধর করবে না, শুধু আজকের রাতটুকু ও তোমার পাশে শুয়ে কাটাতে চাইছে .... ' খানিক আগে টমির বলা কথাগুলো ভেঙ্গিয়ে ভেঙ্গিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল টেম্পল, তারপরে বলল, ' আহা কি কথার ছিরি । চাইলেই পাশে শুতে দেব ভেবেছে নাকি ? বিছানায় আমার পাশের জায়গাটা কি ওর বাপের জমিদারী ?'

বাইরে থেকে ছিটকিনি এঁটে দরজা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল টমি, গলা অল্প চড়িয়ে বলল, ' দরজার ছিটকিনি এঁটে দিয়েছি ।' এবারে আর কেউ ভেতরে তোমার কাছে যেতে পারবেনা, আমি এখানেই আছি ।'

টেম্পল ভেতর থেকে সাড়া দিলনা । বন্ধ দরজার ওপাশে আগের মতই হাঁটু মুড়ে একরাশ তুলোবীচির খোসার ওপর উবু হয়ে বসে দূরে গুডউইনরে বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল টমি । খানিকবাদে গুডউইনকে আবার খামার বাড়ির খিড়কির দরজার বাইরে এসে দাঁড়াতে দেখল সে । তাকে দেখেই তার দিকে ঘুরে বসল টমি, তার কটমটে চোখের চাউনি দেখে গুডউইন ভেতরে ঢোকার সাহস পেলনা । খানিক বাদে গুটি গুটি পায়ে সে আবার ফিরে গেল বাড়ির দিকে ।

বন্ধ দরজার একপাশে তুলোবীজের খোসার গাদার ওপর বসে আছে টেম্পল, আচমকা সে দেখতে পেল ওপরে ফসল রাখার টানা কাঠের তাকের ভেতর থেকে ট্রাউজার্স পরা দুটো পা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসছে । খানিক বাদে গোটা শরীর

নিয়ে পপি লাফিয়ে নেমে দাঁড়াল তার সামনে, বন্ধ দরজার এপাশে । রক্ত লোলুপ হিংস্র শ্বাপদ বা বিষধর সাপের মুখোমুখি হলে সব সাহস যেমন নিমেষে উড়ে যায়, টেম্পলের সব সাহসও তেমনি উধাও এল । কিন্তু পপি তাকে ছুঁলনা, যেন তার ওপর কোনও আসক্তি নেই এমন ভাব চোখের চাউনিতে ফুটিয়ে সে বন্ধ দরজার পাল্লা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল, ওপাস থেকে টমি চেঁচিয়ে উঠল, ' কে ?'

'তোর বাবা ।' গম্ভীর গলায় বলল পপি, ' ভারি আমার মাগির পাহারাদার হয়েছে । দরজা খোল্ । খোল্ বলছি ।'

কোনও প্রতিবাদ না করে ওপাশ থেকে দরজা খুলে দিল টমি, হেসে বলল, 'তুমি ভেতরে আছো টের পাইনি ।' সঙ্গে সঙ্গে পপি টমির ছোটখাটো কচি মুখে জোরে এক থাপ্পার মারল । তার পাশ পাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে খানিক দূরে গুডউইনের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, ' শুয়োরের বাচ্চা; তোকে না আমার পিছু নিতে মানা করেছিলুম তবু তুই ফের আমার পিছু নিয়ে এখানে এসে জুটেছিস ?'

' আমি তোমার পিছু নিতে যাব কোন দুঃখে শুনি ?' টমি গুডউইনের বাড়ির দিকে মাথা হেলিয়ে বলল, ' আমি ঐদিকে তাকিয়েছিলুম ।'

' ওদিকেই তাহলে তাকিয়ে থাক ।' পপি একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কোটের একদিকের পকেট থেকে তার ডান হাত খানা ধীরে ধীরে বের করে আনল, টমি আবার আগের মত উবু হয়ে বসে আগের মত খানিক দূরে গুডউইনের বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। যে দরজা বন্ধ করে টমি নিজের হাতে ছিটকিনি এঁটে দিয়েছিল খানিক আগে পপির ধমক খেয়ে সেই দরজা সে নিজে হাতে খুলে দিয়েছে । দরজার ওপাশে তুলোবীজের খোসার ওপর বসে টেম্পল এতক্ষণ পপি আর টমির কথা কাটাকাটি শুনছিল,এবারে বারবার দু'বার দেশলাই কাঠি জ্বালানোর মত পলকা দুটো আওয়াজ কানে আসতে সে চমকে উঠল । টেম্পল দেখল পপির ডানহাতের মুঠোয় ধরা পিস্তলের নলের মুখ থেকে হাল্কা হাল্কা ধোঁয়া বেরোচ্ছে; সামনের দিকে চোখ পড়তে টেম্পল দেখল টমির দেহটা অসহায় ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে । তার রক্তে লাল হয়ে উঠেছে কাঠের মেঝে । পিস্তলটা পকেটে গুঁজল পপি, টমির প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহটা লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে সে এগিয়ে এল টেম্পলের দিকে । তাকে দেখে ঐ মুহূর্তে কি একটা যেন ঘটে গেল টেম্পলের মাথার ভেতরে টেম্পল দেখতে পেল ' এরা আমার মহা সর্বনাশ না করে কিছুতেই ছাড়বেনা গো, ' বলতে বলতে সে যেন ছুটে চলেছে গুডউইনের বাড়ির দিকে । বাড়ির সামনের বারান্দায় দৃষ্টিহীন বুড়োটা তখনও সূর্যের দিকে মুখ তুলে বসে, তাকে শুনিয়েই যেন চেঁচাচ্ছে সে-, ' এরা আমার সর্বনাশ করে ফেললে গো ।' অন্ধ বুড়ো মানুষটা কানে শুনতে না পেলেও যেন শুধু অনুভূতির জোরে তার উপস্থিতি টের পেল, আর টের পেয়েই হয়ত সূর্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল, আর টেম্পল হয়ত তখনও পাগলের মত চেঁচাচ্ছে — ' এমন কিছু একটা যে ঘটবে তা আমি আগেই তোমায় বলেছিলাম ! হুঁশিয়ার করেছিলাম ।

আরও কিছুক্ষণ পরের ঘটনা — বাচ্চার দুধের বোতল নিতে রুবি তাকে কোলে নিয়েই পায়ে হেঁটে ফিরে আসছে বাড়ির দিকে, ঠিক তখনই পপির গাড়িটা তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। যাবার সময় ঘাড় না ফিরিয়েও গাড়ির সমানের সিটে পপির পাশে টেম্পলকে স্পষ্ট দেখতে পেল রুবি। গাড়ি চেপে যাবার সময় জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে টেম্পল লক্ষ করল মুখ না ফিরিয়েও আড়চোখে রুবি তাকে ঠিকই দেখতে পেয়েছে। গাড়িটা কিছু দূরে যাবার পরে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রুবি ঢুকল বাড়িতে, শোবার ঘরে ঢুকে দেখল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গুডউইন, দাড়ি কামানো শেষ করে যত্ন করে একটা সূতো বের করা টাই বাঁধছে গলায়।

'ব্যাপার কি? এত সাজগোছ করে চললে কোথায়?' জানতে চাইল রুবি।

'পায়ে হেঁটে আগে যাব টুলস - এর গ্যারেজে, টাই -এর শেষে ফাঁস দিয়ে আয়নার কাচের ভেতরে রবির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল গুডউইন। 'ওখান থেকে টেলিফোন করে শেরিফকে খবর দিতে হবে।' একটু থেমে সে আবার বলল 'বারান্দায় বাবাজী একা বসে আছে, ওর খাবার ব্যবস্থা ত কিছু করতে হবে। এক কাজ করো, রান্নাঘরে উনুনের ওপর কয়েক টুকরো বাসি ঠাণ্ডা পাঁউরুটি পড়ে আছে দেখছি, একটু সেঁকে নিয়ে ওকে দিও। বাবাজী ভালমানুষ বাসি পাঁউরুটি দিলেও ও দিব্যি খেয়ে নেবে তুমি তাহলে থাকো। আমি চললাম।'

'চলো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে,' রুবি বলল, গুডউইন কোনও প্রতিবাদ করতে পারলনা। বাচ্চা কোলে নিয়েই রুবি তার জীবনসাথী লী গুডউইনের সঙ্গে হাটতে হাঁটতে কিছুদূরে টুলস -এর গ্যারাজে এসে পৌছল। টুলস পরিবারের সদস্য তখন গ্যারেজের কর্মচারিদের নিয়ে দুপুরের খাওয়া খেতে বসেছে। গ্যারেজের মালিকের কাছ থেকে নম্বর নিয়ে রুবি শেরিফের হদিসে টেলিফোন করে টমির খুনের খবর দিল।

উকিল হোরেস বেনবো যখন তার বোনের বাড়িতে এসে পৌছোল বিকেল শেষ হতে তখনও দেরি আছে, জায়গাটা জেফারসন থেকে প্রায় চার মাইল দূরে। হোরেসের বোন তার চেয়ে সাত বছরের ছোট, একই পৈতৃক বাড়িতে জন্মেছে দু'জনে। মিচেল নামে একজনের ডিভোর্সি বউকে বিয়ে করে কিনস্টনে বাড়ি করেছে হোরেস, এতেই তার ছোটবোন রেগে গিয়ে পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু হোরেস বাড়ি বিক্রি করতে রাজি হয়নি। কিনস্টনে বাংলো ধাঁচের নতুন বাড়ি তৈরী করতে হোরেসের প্রচুর ধার দেনা হয়েছে, সেই ধার শোধ করতে প্রতিমাসে আসলের ওপর চড়া সুদ দিতে হচ্ছে তাকে।

রুবির বিবৃতির ভিত্তিতে টমির হত্যাকারী সন্দেহে শেরিফ আগেই গুডউইনকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরেছিলেন, এবারে তিনি তাকে বিচারাধীন আসামী হিসেবে নিয়ে

এলেন শহরের জেলখানায় । যে সেল -এ গুডউইন আছে তার কাছাকাছি অন্য একটি সেল -এ রাখা হয়েছে এক নিগ্রোকে, দাড়ি কামানোর ক্ষুর দিয়ে বউ -এর গলা কেটে খুন করার অভিযোগে বিচারক তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন । ফাঁসির দিন যত ঘনিয়ে আসছে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নিগ্রোটি ততই মানসিক দিক থেকে ভেঙ্গে পড়ছে; নিগ্রো সমাজের সদস্যরা প্রায়ই এসে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে ঈশ্বরের নাম গান শোনাচ্ছে । কিন্তু নামগান শুনেও সেই নিগ্রো আদৌ চাঙ্গা হতে পারছেনা, রোজ রাতের বেলা বাইরে রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের দিকে তাকিয়ে হতভাগ্য লোকটি অসহায় ভাবে আপন মনে বিড়বিড় করে ' আর মাত্র ক'টা দিন, তারপরেই সব যেন খতম হবে । স্বর্গে, নরকে কোথাও আমার ঠাঁই হবেনা ! হা ভগবান !'

গুডউইনের হয়ে মামলা লড়ার দায়িত্ব নিয়েছে হোরেস, জেলখানায় এসে মক্কেলের সঙ্গে দেখা করল সে । ঘটনাচক্রে গুডউইনের জীবনসঙ্গিনী রুবিও কোলেব বাচ্চাকে নিয়ে এসেছে তার কাছে ।

' এখন প্রশ্ন হল লোকটার হাতের টিপ কি এতই নির্ভুল যে জানালার বাইরে থেকে গুলি ছুঁড়ে টমিকে খুন করে ফেলল ?' মক্কেলকে প্রশ্ন করেন হোরেস ।

' আজ্ঞে, আপনি কার কথা বলছেন ? ' বুঝতে না পেরে পাল্টা প্রশ্ন করল গুডউইন ।

' কার আবার,' হোরেস বলল, ' আমি পপির কথা বলছি ।'

' খুনটা কি তাহলে পপিই করেছে বলছেন ?' বলল গুডউইন ।

' তুমি কি বলছ ও করেনি ?' বলল হোরেস ।

' আজ্ঞে আমার যেটুকু বলার সব আপনাকে বলেছি, ' হতাশা ফুটে বেরোল গুডউইনের গলায়, ' বিবেকের কাছে গোপন করার মত কিছুই আমার নেই । এরপরে ওরা আমায় ফাঁসিতে ঝোলাবে কিনা তা পুরোপুরি ওদেরই ওপর নির্ভর করছে ।'

' এসব কথা যখন বলছ তখন উকিল তোমার কি কোন কাজে লাগবে ?' প্রশ্ন করল হোরেস, ' আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও তুমি ?'

' আমার বাচ্চাটা বড় হলে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে আপনি যতদূর সম্ভব সাহায্যে করবেন, এটুকু কথা আপনাকে দিতে হবে আমায় । ' অন্য দিকে তাকিয়ে বলল গুডউইন, ' বাচ্চার মা, মানে রুবিকে নিয়ে আমার কোনও ভাবনা নেই, ও ঠিক থাকবে। কি গো, তাই ত ?' বলে পাশে বসা রুবির মাথার চুলে আদর করে ঘেঁটে দিল সে, রুবির কোলে শোয়ানো তার ঘুমন্ত বাচ্চাকে দেখে কষ্ট পেল হোরেস, প্যারি শহরের পথেঘাটে যেসব মন্দ ভাগ্য নারী পুরুষ কোলে বাচ্চা নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় ঘুমন্ত বাচ্চাটিকে ঠিক তাদের মত দেখাচ্ছে বলে তার মনে হল ।

বাচ্চা সমেত রুবিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল হোরেস । পথে এক বোতল দুধ, টিনের কৌটোয় ভর্তি কিছু খাবার আর সেই সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসও কিনে আনল দোকান থেকে । এরপরে পাবলিক বুথ থেকে বোনকে টেলিফোন করে

তার গাড়িও সে আনিয়ে দিল। রাতেরবেলা খেতে বসে নিজের ছোট বোন আর তার জেঠি শাশুড়িকে এসব জানিয়ে রাখল। খুনের মামলার বিচারাধীন বন্দীর বউ আর বাচ্চাকে হোরেসের নিজের বাড়িতে এনে আশ্রয় দেবার ব্যাপারটা তার বোন মেনে নিতে পারলনা, খোলাখুলি ভাবেই বলল, তুমি ব্যাপারটা নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করছ। একটা খুনির বউ, সে যে একটা রাস্তায় মেয়েছেলে তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা। তুমি কি মনে করো তোমার চেয়ে ভাল উকিল লাগানোর মত পয়সাকড়ি ঐ মেয়ে মানুষটার হাতে নেই ?' বললেন হোরেসের বোনের জেঠিশাশুড়ি মিস জেনি।'

'ব্যাপারটা যেচোখে আপনি দেখছেন তা কিন্তু নয়,' মিস জেনির কথার ধরনে ক্ষুব্ধ বোধ করল হোরেস। জবাব দিতে গিয়ে সে বলল, 'আমার চেয়ে অনেক অনেকগুন ভাল উকিল লাগানোর ক্ষমতা সেই বিচারাধীন লোকটির অবশ্যই আছে; আসলে —'

'হোরেস,' তার বোন বাধা দিয়ে বলল 'ঐ মেয়ে মানুষটাকে কি তুমি আমার বাড়িতে এনে তুলেছো ?' একটু বুঝে কথাবার্তা বলো নারসিসা, চাপা গলায় ধমক দিল হোরেস, 'তোমার নিজের বাড়িটা যে আমারও নিজের বাড়ি সেকথাটা দয়া করে মনে রেখো।' কিনস্টনে নিজের বাড়ি তৈরী করার পরে গত দশ বছর পৈতৃক বাড়িতে থাকেনা হোরেস, তার অনুপস্থিতির সুযোগ ছোটবোন যাতে তার অংশে ভাড়াটে বসাতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই পৈতৃক বাড়িতে নিজের অংশ তালাবন্ধ করে রেখেছে হোরেস।

'ওদের আমি এনে আমার নিজের অংশে আশ্রয় দিয়েছি,' বোনের দিকে তাকিয়ে বলল হোরেস। 'আমার নিজের অংশ যতক্ষণ ফাঁকা আছে ততক্ষণ যাকে খুশি আমি রাখতে পারি সেখানে,' গলা অল্প চড়িয়ে বলল হোরেস।

'তাই বলে তুমি যা খুশি তাই করবে নাকি ? খ্যানখ্যানে গলায় প্রতিবাদ করল হোরেসের বোন, 'আমার পৈতৃক বাড়ি যেখানে আমার মা বাবা কাটিয়েছেন সেখানে ঐরকম একটা মেয়েমানুষ তার বাচ্চাকে তুমি কোনও মতেই আশ্রয় দিতে পারবেনা। আজ রাতেই তুমি ওদের বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দাও।'

'দূর দূর করে তাড়িয়ে দেব ? শাবাস!' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল হোরেস, 'বেশ তাহলে আজ রাতটুকুর মত ওরা থাকুক আমার বাড়িতে, আগামীকাল সকালেই আমি ওদের কোন সস্তার হোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলব। কিন্তু নিজে মেয়েমানুষ হয়ে এমন নির্দয় তুমি হচ্ছ কি করে ? এমন একটা ঘটনা যদি তোমার নিজের বেলায় ঘটত তাহলে তুমি কি করতে ? ধরো খুন না করেও তোমার স্বামী নিজে যদি খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত আর বোরিকে কোলে নিয়ে তুমি অসহায় ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে, তাহলে তখন কি হত ?' 'সে তুমি যাই বলো না কেন হোরেস,' হোরেসের বোন নারসিসা একগুঁয়ে গলায় বলল, 'তোমার ঐ মেয়েমানুষটাকে নিয়ে আমি কিছু ভাবতে রাজি নই। আমার ভাই হয়ে এমন একটা কাজ তুমি কি করে করতে পারলে তাই আমার মাথায় ঢুকছেনা, যে বাড়িতে আমি জন্মেছি সেখানে একটা খুনির বউ, একটা

খুনে রাস্তার মেয়েমানুষকে কি করে তুমি এনে তুলতে পারলে তাই আমি ভেবে পাচ্ছিনা ।' তোমার জায়গায় আমি হলে আজ রাতেই ওদের কোনও হোটেলেও থাকার ব্যবস্থা করতাম না বাপু,' বললেন নারসিসার জেঠিশাশুড়ি মিস জেনি ।

বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে হোরেস বেনবো দেখল রুবি তখনও জেগে বসে আছে, তার বাচ্চা বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে ।

' আমি উনুন ধরিয়ে রাতের খাবার কিছু তৈরী করে নিয়েছি,' হোরেসকে দেখে বলল রুবি । ' এখন মনে হচ্ছে আমি হয়ত একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি ।'

' বাড়াবাড়ি মোটেও নয়,' হোরেস বোঝাতে চাইল, ' এটা নিছক আইনগত সতর্কতার ব্যাপার । আমাদের মামলার স্বার্থ যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেকথা মনে রেখে আমদের বরং সাময়িক ভাবে একটু কষ্ট স্বীকার করা ভাল বলে আমি মনে করছি মানে লীকে খুনের দায়ে আটকে রাখা যে খুব অনুচিত কাজ হচ্ছে এটাই আমি সবাইকে এমনকি জজসাহেবের চোখও আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চাই ।'

' আপনি কি জেফারসনে থাকেন ?' জানতে চাইল রুবি ।

' না, আমি কিনস্টেনে থাকি,' বলল হোরেস ' তবে আমি এখানে প্রাকটিস করেছি । শোনো, এখানে তোমার থাকাটা হয়ত ঠিক হবে না, তার চেয়ে চলো তোমাকে আর তোমার বাচ্চাকে থাকার একটা মোটামুটি ভদ্র গোছের হোটেলের ব্যবস্থা করা যাক । আজকের রাতটা ভালভাবে ঘুমিয়ে নাও, আমি কাল সকালেই চলে আসব, চলো বেরিয়ে পড়া যাক । নারসিসা আগেই গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল, বাচ্চা সমেত রুবিকে পেছনের সিটে বসিয়ে সামনের চালকের পাশে বসল হোরেস, চালক ইসোমকে একটা মোটামুটি ভদ্রলোকের হোটেলে নিয়ে যেতে বলল হোরেস ।

সরু রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে চলল । রাতের নির্জন রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হোরেসের মনে পড়ে গেল হারানো শৈশবের কথা, তারা দু'ভাইবোন যখন ছোট ছিল তখনও এ রাস্তা বাঁধানো হয়নি, অল্প বৃষ্টি হলেই গোটা রাস্তা খালের চেহারা নিত । তারা দু'ভাই বোন নিজেদের পোষাক কষ্ট করে দু'আঙ্গুলে তুলে ধরে দেখে শুনে সেই খালের জল পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকত । খানিকদূরে যাবার পরে রুবি বলল, ' গাড়ি এখানে থামাতে বলুন ।'

' কেন ?' বুঝতে না পেরে হোরেস তাকাল তার মুখের দিকে ।

' বলছি হোটেলে পৌছোনোর আগে পথে ঘাটে এমন অনেক লোক নিশ্চয়ই আপনাকে চেনে, আপনার সঙ্গে আমাকে এক গাড়িতে দেখলে তারা হয়ত আপনাকে ভুলও বুঝতে পারে । তার চেয়ে আপনি গাড়ি থামান, আমি এখানে মেমে অপেক্ষা করছি । আপনি হোটেলে ঠিক করে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন । আমি আমার বাচ্চাকে নিয়ে সেখানে গিয়ে ঠিক পৌছে যাবে ।'

' ওসব করার কিছু দরকার নেই ,' বলল হোরেস, 'যে যা ভাবতে চায় ভাবতে পারে, তুমি আমার সঙ্গেই হোটেলে যাবে ।'

হোটেল ঠিক করে রুবিকে তার বাচ্চা সমেত সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিল হোরেস, পরদিন সকাল বেলা আসবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে বিদায় নিল। গাড়ির চালক ইসোম বাড়ি ফেরার পথ ধরতে হোরেস বলল, ' একি, কোথায় নিয়ে চললে আমায় ? '

' মিস নারসিসা আপনাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন, ' মুচকি হেসে বলল ইসোম ।

' তাই নাকি ? ' মাঝ পথে গাড়ি থমিয়ে নেমে পড়ল হোরেস, ইসোমকে বলল, ' যাও ফিরে গিয়ে নারসিসাকে বোল যে মক্কেলের বউকে আমি আমার বাড়ি থেকে ওর ইচ্ছে মতই সরিয়ে দিয়েছি । হ্যাঁ, সেই সঙ্গে এও বোলো যে মক্কেলের বউ এর উপর আমার কোনও মোহ নেই ।

হরেক রকম গাছের ঝরা পাতার গন্ধে ভরে উঠেছে জেলের আঙ্গিনা । সেই অপূর্ব গন্ধে রাজত্বে বেমানান ঠেকে সাধারণ কামরার চুনকাম করা চারটে সাদাদেওয়াল । নোংরা হাতের ছাপ থেকে শুরু করে পেনসিল আর ব্লেড- এর ধারালো ফলায় খোদাই করা অসংখ্য নারীপুরুষের নাম আর অশ্লীল গালিগালাজে দেওয়াল চারটে বহু দিন ধরে কলঙ্কিত । সেই ঘরেরই এক দেওয়ালের গায়ে কাঁটাতারের বেড়া বসান পাল্লা বিহিন খোলা জানালা, প্রাণদন্ডে দন্ডিত নিগ্রো আসামিটি রোজ রাতের বেলা শুতে যাবার আগে সেই জানালায় ঝুঁকে তাকিয়ে থাকে সামানের পথের দিকে, কখনও নিজের মনে গেয়ে ওঠে দুঃখের গান যার কথাগুলো এরকম ।

স্বর্গে তোমার নেইকো ঠাঁই

নেই কো ঠাঁই মোটে জাহান্নমে

সাদামানুষের জেলেও তোমার থাকার জায়গা নেই ছোঁবে সেখানেই তোমায় কোন যমে ? তাহলে কোথায় কোন চুলোয় তুমি যাবে হে নিগ্রো । একটু জায়গা তোমার কোথায় মিলবে ভাই ?

ওদিকে রোজ সকালে হোরেস তার গাড়ির চালক ইসোমের হাত দিয়ে এক বোতল দুধ রুবির বাচ্চা খাবার জন্য হোটেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে ।

' গুডউইন, মানে আমার মক্কেল, ' বোনের জেঠি শাশুরি মিস জেনির সঙ্গে দেখা হোতে হোরেস বলল, ও আমার কাছে একদম মুখ খুলতে চাইছে না, বার বার বলছে আমায় সাজা দেবার আগে খুনটা যে সত্যিসত্যি আমি করেছি এটা ওদের প্রমান করতে হবে । সেই সঙ্গে এও বলেছে যে বাইরে থাকার চেয়ে ও জেলের ভেতরে অনেক সুখে আছে, আমার মনে হয় এটা ঠিক, সত্যিই বাইরের তুলনায় জেলের ভেতরে আমার মক্কেল ঢের ভালা আছে । বাইরে গিয়েই বা বেচারা কি করবে,ওর যে চোলাই মদের কারবার ছিল তাতো আগেই বন্ধ হয়ে গেছে । শেরিফ যেদিন লোকজন নিয়ে ওর

আড্ডায় খানাতল্লাসি কবতে হানা দিলেন ওর চোলাই মদের কারবার সেদিনই বন্দী হয়ে গেছে। ওব চোলাই মদ তৈবিব যন্ত্রপাতি যত ছিল সব শেরিফের লোকেরা তুলে নিয়ে গেছে। আমি খবব পেয়েছি গুডউইন যে এলাকায থাকত সেখানকাব গির্জার পাদ্রিরাও খুব চটে আছে ওর উপর, ওদের চোখে ও শুধু খুনি নয ব্যভিচারীও বটে । পাদ্রিরা গুডউইন আব রুবিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে পারলে ভারি খুশি হয়, তাতো হবার নয় ।

' গুডউইন টাকাকড়ি কেমন জমিয়েছে খোঁজ বাখো ?'

' তেমন কিছু জমাতে পারে নি ' বলল হোরেস, ' একটা টিনের কৌটো শেরিফের সামনে গুডউইন খামাব বাড়ির মেঝেব তলা থেকে বের করেছে, তাব ভেতরে শদেড়েক ডলারেব কিছু বেশি ছিল শুনেছি । যত দিন না মামলার ফয়সলা হচ্ছে ততদিন ঐ টাকাতেই রুবি আব তাব বাচ্চাকে নিয়ে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতে হবে, হয়তো আদালতের খরচও মেটাতে হবে এই টাকা থেকে । '

' ভাগ্যিস নারসিসা এই মামলার জুরীদেব মধ্যে ঠাই পাইনি, ' বলল মিস জেনি, আর ঠিক তখনি নাবসিসা এসে ঢুকল ভিতবে ।

বড় ভাই হোরেসকে দেখে তার মুখের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল । ' আমরা খুন খারাপি আর অন্যান্য অপবাধের প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলে ছিলাম, ' বললেন মি'স জেনি, জান হোরেস,' নারসিসার নিজেরও অনেক দুঃখ জমে আছে তাই না নরসিসা ? '

' তাই নাকি ?' বলল হোরেস ।

' তা দুঃখগুলো কেমন শুনি ? '

' নারসিসাকে ওর প্রেমিক ঠকিয়েছে, ' বললেন মিস জেনি, তাব পবে ও একদম বেপাত্তা হয়ে গেছে ।

' বোকাব মত কথা বলো না। '

জেঠিশাশুরি মন্তব্যে তাঁর উপর যে চটেগেল এমনিতেই । ভাইয়ের উপর থেকে তার রাগ এখনও যায় নি । তার উপর প্রেমিকের প্রসঙ্গ টেনে আনায় সে তাঁর উপব ক্ষুব্ধ হল ।

' বিশ্বাস করা না করা আপনার উপর, ' বললেন মিস জেনি, তবে গাওয়ান স্টিভেন্স নারসিসার সঙ্গে যা করেছে তাকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না । ওখান থেকে গাড়ি ভেঙে চুরে ফিরে আসার পরে এক বারও নারসিসার সঙ্গে দেখা করেনি । ও ব্যাচারি কেমন আছে সেই খোঁজটুকু নেবার প্রয়োজনও বোধ করে নি ।'

' দেখ না করুক ' বলল হোরেস ' কিন্তু ইতিমধ্যে দু'এক খানা চিঠিও লিখতে পারে? '

' হাঁ তা লিখতে পারে বই কি' বলেই নারসিসা মিস জেনিকে বলল । ' মিস জেনি, আমাকে গাওয়ানের লেখা চিঠিটা নিয়ে এসে আমার উকিল ভাইকে দেখাল । মি'স জেনি হুইলচোরে বসেই ভেতরে চলে গেলেন, খানিক বাদে ফিরে এসে এক খানা মাঝারি আকারের পাতা তুলে দিলেন হোরেসের হাতে'।

হোরেস সেই কাগজ বের করে দেখল গোটা গোটা হরফে তাতে নারসিসকে

উদ্দেশ্যে ছোট একটি চিঠি লেখা হয়েছে যার ভাষা এরকম ।

" আমার প্রিয় নারসিসা,

এ চিঠিতে কোনও তারিখে হয়ত ইচ্ছে করেই আমি বসাইনি । তোমায় সঙ্গ দেওয়া আমার মনপ্রাণ যদি এই কাগজের মত সাদা হত, তাহলে যদি এ চিঠি লেখার দরকার বোধহয় হতনা, যে নিদারুণ সত্যি লিখতে গিয়ে আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে ছিড়ে পড়তে চাইছে হাতের আঙুল । তাহল এই যে আর কোন দিনও তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না । আমরাই নিজের বোকামির জন্য এমন এক বিশ্রি ঘটনা ক'দিন আগে ঘটেছে আমার জীবনে যার কথা মনে পরার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস আমি হারিয়ে ফেলছি । অন্ধকারে যখন একা বসে ভাবি তখন বেশ বুঝতে পারি এ বোকামির ফলে আমার নিজেরই ক্ষতি করেছি, যে ক্ষতি অপূরনীয় । এত দিন অন্তরঙ্গ মেলা মেশা করে এটুকু বেশ বুঝতে পারছি সে বোকামির কথা জানতে পারলেও আমার সম্পর্কে তোমার ধারনা কখনোই খাটো হবে না । তবু তোমায় মিনতি করছি দোহাই সে বোকামিব কথা কখনো জানতে চেও না বা জানার চেষ্টা কোর না ।

ভবিষ্যতে আর দেখা না হলেও আমায় কখনো মন থেকে মুছে দিতে পারবে না এটুকু বিশ্বাস বুকের ভেতরে রেখেই এই চিঠি শেষ করছি ।

তোমার গাওয়ান ।"

মন দিয়ে চিঠি খানা খুঁটিয়ে পড়ল হোরেস, তার পরে নিজের মনে বলে উঠল, ' হা ভগবান ! এ ত রীতি মত জ্ঞান পাপী । আমি ওকে আগে এক সাধারণ ফালতু লোক ভেবে ছিলাম ।'

' তোমার জায়গায় আমি হলে -' এটুকু বলেই চুপ করল নরসিসা । এক মুহূর্ত পড়ে বলল হোরেস, ' এসব আর কতদিন চলবে বলতে পারো ?'

' কিন্তু করার থাকলে আমি কিআর চুপ করে বসে থাকতাম ?' বলল হোরেস । ' তেমন কোন পথ থাকলে আগামী কালই ওকে জেল থেকে খালাস করে আনতাম .... ।

' একটাই পথ আছে ' বলে বড় ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল নরসিসা, তারপরেই দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ' আমার ছেলেটাকে নিয়ে হয়েছে মহা ঝামেলা,— একটু বাদে যেতে দেব জেনেও ও কোথায় যেন বেরোল । ' বোরি ! অ্যাই বোরি গেলি কোথায় ?' বলতে বলতে নরসিসা ছুটে গেল দরজার দিকে ।

' নরসিসা কোন পথের কথা বলছে তা তুমি ঠিকই জানো, হোরেস,' বললেন মিস জেনি, ' অবশ্য সে পথে এগোতে গেলে যথেষ্ট সাহস আর মনের জোর দরকার । জানি না তোমার তা আছে কিনা ।'

' আগে বলুন পথটা কি,' হোরেস বলল. ' তারপরে ভেবে দেখব যথেষ্ট সাহস আর মনোবল আমার আছে কিনা ।'

'অনেক রাত হল হোরেস,' মিস জেনি বললেন, 'বউ তোমার পথ চেয়ে বসে আছে, এবারে বাড়ি যাও ।

বউ খুনের মামলার নিগ্রো কয়েদীকে শনিবাব সকালে ফাঁসিতে ঝোলানো হল। তার লাশ নিতে কেউ এলনা তাই জেলেরই ভেতর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা কয়েদীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় কোন জাঁকজমক না করে তাকে কবর দেওয়া হল । ফাঁসি আগে লোকটা চেঁচামেচি করে রোজই জ্বালাতন করলেও জেল-এর ভেতর এত দিন যে ছিল লী গুডউইনের একমাত্র সঙ্গি; তার ফাঁসি হয়ে যাবার পরে স্বাভাবিক ভাবেই গুডউইন এবারে একা হয়ে পড়ল । আগে নিগ্রো কয়েদিটি রোজ রাতে কাঁটাতার ঘেরা খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে বকবক করত, হা হুতোশা করত, গান গাইত, সে চলে যাবার পরে সেখানে এসে দাঁড়ায় গুডউইন । জেলের আলো নিভে যাওয়ার পরেও সেল-এর সেই জানলার সামনে এসে দাঁড়ায় সে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে সামনে রাস্তার দিকে । তার জামিনের জন্য আবেদন করেছিল কিন্তু জজ তা খারিজ করে তাকে বিচারাধীন বন্দী হিসেবে পড়িয়েছেন এই জেলে; এই জুন মাসে তার মামলা বিচারের জন্য আদালতে উঠবে । অদ্ভুত লোক এই লী গুডউইন, টমি খুন হবার সময় পপি যে হাজির ছিল সে কথা একবারও হোরেসের কাছে স্বীকার করছে না ।

'আপনাকে সাফ বলে দিচ্ছি, আমায় ফাঁসানোর মত কোনও প্রমান ওদের হাতে নেই,' হোরেসের জেরার জবাবে বারবার এই একটা কথাই সে বলছে । প্রমাণ নেই এ সম্পর্কে এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে ? ' নিজের ওকালতির অভিজ্ঞতার সাহায্যে হোরেস তাকে বোঝাতে চেয়েছে । 'তুমি যার সঙ্গে লড়াই করছে তাকে ভুলেও কমজোরি ভেবোনা ।'

'টমির লাশটা খামারবাড়িতে পাওয়া গেছে,' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর গলায় বলেছে গুডউইন । পেছন থেকে তাকে বারবার দু'বার গুলি করা হয়েছে । যে পিস্তলের গুলিতে সে খুন হয়েছে শেরিফ আগে ওটা খুঁজে বের করুক । দেখুক তাতে আমার আঙ্গুলের দাগ আছে কিনা । আমি খুনি হলে ত আগেই পালিয়ে যেতাম, কিন্তু তা না করে আমিই নিজে ক'মাইল দূরে গিয়ে টেলিফোনে শেরিফে খবর দিয়েছি । এসব ত সাধারণ বিচার বুদ্ধির ব্যাপার, যে কোনও সুস্থ মাথার লোক একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে খুন আর যেই করুক, আমি করিনি ।'

'তোমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছি,' হোরেস বলছে, ' কিন্তু মুসকিল হল সাধারণ বিচার বুদ্ধি যাদের আছে তারা কিন্তু তোমার বিচার করছেনা, যারা করছে তারা হল জুরি ।' 'তাহলে ওরা যা ভাল বোঝে তাই করুক,' যেন আর কিছু বলার নেই এভাবে দু'হাত উল্টে বলল গুডউইন, ' যে খুন হয়েছে তার লাশটা এখনও পড়ে আছে যথাস্থানে খামার বাড়িতে, কেউ ওটা ছোঁয়নি; খুনের সময় বাড়িতে ছিলাম আমি নিজে, আমার

বউ আর ঐ বুড়ো বাবাজী যে চোখে দেখে না কানেও শুনতে পারে না, বাড়ির ভেতরের একটি জিনিসেও কেউ হাত দেয়নি। বউকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে আমার বউ নিজে টেলিফোনে শেরিফকে খুনের খবর দিল, না, না আমি জানি এসব ভেবে দেখলে আমি একটা সুযোগ ঠিকই পাব, কিন্তু অন্য একজনের স্বার্থ দেখতে গেলে সে সুযোগের ভরাডুবি ঘটবে। আমি কি পাব তা আমার জানা আছে।'

' কিন্তু গুলির আওয়াজ তোমার কানে এসেছিল ' হোরেস বলল ' তুমি নিজে মুখে শেরিফের কাছে এই বিবৃতি দিয়েছো।'

' না,' জোরগলায় বলল গুডউইন, ' বলিনি, কোনও আওয়াজ আমার কানে আসেনি। এ সম্পর্কে কিছুই আমার জানা নেই। ইয়ে ..... রুবিকে দু'টো কথা বলব, আপনি দয়া করে একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান হোরেস। গুডউইনের সঙ্গে কথা বলে মিনিট পাঁচেক বাদে বাইরে এল রুবি। জেলের বাইরে আসার মুখে হোরেস বলল, ' গোটা ব্যাপারটার এমন কিছু আছে যা এখনও পর্যন্ত লী বা তুমি কেউই আমায় জানাওনি। হয়ত আমায় বলতে লীও তোমায় মানা করেছে, কেমন, তাই ত ?' ঠিক এই সময় বাচ্চাটি ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদতে শুরু করল, তাকে শান্ত করতে রুবি তাকে অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে একাঁধ থেকে ওকাঁধে কয়েক বার নিল, হাতে নিয়ে দুলুনিও দিল। কিন্তু তাতে শান্ত না হয়ে বাচ্চাটা একঘেয়ে কান্না কেঁদে চলল।

' ওকে হোটেলে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলেই ত পারতে,' বিরক্ত চোখে রুবির বাচ্চার দিকে চেয়ে বলল হোরেস।

' আমার মনে হচ্ছে কি করতে হবে লী তা ঠিকই জানে,' বলল রুবি, সেই গলা শুনে হোরেসের মনে হল তার কথাগুলো রুবির ভাল লাগছেনা।

' তুমি মনে যাই ভাবোনা কেন,' হোরেস বলল ' ভুলে যেয়োনা আমি তোমাদের পক্ষের উকিল, গুডউইনকে বাঁচানো ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই। আর উকিল হিসেবে সবকিছু সবকথা আমার না জানলে চলবেনা। তুমি আর তোমার সোয়ামি আদালতে দাঁড়িয়ে কি বলবে আর কি বলবেনা তা আমিই বাতলে দেব। তা যদি না হয় তাহলে তোমাদের জন্য আমি মিছিমিছি কেন খেটে মরছি। রোগ বাঁধিয়ে ডাক্তার দেখাতে এসেছো, ডাক্তার যখন সব খুঁটিয়ে দেখতে চাইছেন তখন তাঁর কথা না শুনে চুপ করে বসে আছো,' উষ্মা ছড়ানো গলায় বলল হোরেস, ' তুমি আর লী দু'জনেই ঠিক তেমনই আচরণ করছ আমার সঙ্গে, এটা ঠিক করছ না,' রুবির হাবভাব বোঝা যাচ্ছে না, বাচ্চার কান্না থামাতে সে তার বুকে মুখ গুঁজে আদর করে চলেছে। ঐ ভাবে সে যে তার কথাগুলো শুনেও শুনছেনা তা বেশ বুঝতে পারছে হোরেস। ' আমাদের আইনে একটা কথা আছে ' ওবস্ট্রাকটিভজাস্টিস,' বলল হোরেস, যার মানে হল আইনকে তার নিজের পথে এগোতে বাধা দেয়। লীর মামলা শুরু হবার পরে তেমন কিছু যদি ঘটে যায় তাহলে সেটা হবে খুব খারাপ, ব্যাপারটা কেমন জানো ? ধরে আদালতে

দাঁড়িয়ে লী শপথ নিয়ে বলল, যে টমি খুন হবার সময় তার আশেপাশে অন্য কেই ছিল না। এর পরে সাক্ষ্য দিতে এসে আর কেউ যদি বলে টমি খুন হবার আগে বা পরে সে ঘটনাস্থলে পপিকে দেখতে পেয়েছে অথবা তাকে গাড়ি চালিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। এমন কিছু ঘটলে তখন কিন্তু বিচারক বা জুরিরা কেউই লীর দেখা বিবৃতিকে আর সত্যি বলে বিশ্বাস করবে না। তার প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এর ফলে। রুবি এবারেও কোনও মন্তব্য করল না। জেল থেকে বেরিয়ে তারা হোটেলের কাছে পৌঁছে গেছে, হাতল ধরে সদর দরজার একদিকের পাল্লা হোরেস টেনে খুলতে ' আমার মনে হয় কি বলতে হবে লী তা জানে,' বলতে বলতে রুবি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। শিস দেবার আওয়াজ করে রুবি তার বাচ্চার কান্না থামানোর চেষ্টা করছে দরজার পাল্লা ভেজিয়ে দেবার এটুকু স্পষ্ট শুনতে পেল হোরেস।

এসব ক' দিন আগের ঘটনা। বউ খুনের আসামি নিগ্রো কয়েদীটা তখনও বেঁচে; রাতের বেলা ছোটবোন নারসিসা আর তার জেঠি শ্বাশুড়ি মিস জেনির সঙ্গে একই টেবলে ডিনার খেতে বসেছিল হোরেস, খেতে খেতে গুডউইনের মামলার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করছিল নারসিসা। খাওয়া শেষ হতে টেবল ছেড়ে ওঠার সময় বলেছিল, ' আচ্ছা, বউ খুনের আসামি ঐ নিগ্রোটার ফাঁসি ত হবেই, এক কাজ করলে হয় না, ওর পাশে তোমার মক্কেল ঐ গুডউইনকেও একই সঙ্গে ফাঁসিতে লটকে দেয়া যায় না, হোরেস ? নিজের নিষ্ঠুর রসিকতায় নিজেই হেসে উঠে বলেছিল নারসিসা, এমন ঘটনা ত কতই ঘটে শুনেছি, তাইনা হোরেস ?' ছোটবোনের নিষ্ঠুর রসিকতার জবাবে কোনও মন্তব্য না করে টেবল ছেড়ে উঠে পড়েছিল হোরেস।

ঠাণ্ডা তেমন না পড়লেও সেরাতে লেপ পেয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে ছোট ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করেছিল হোরেস। পৈতৃক বাড়ির বেশির ভাগ অংশই এখন তালাবন্ধ থাকে, নিজের অংশে শুধু একটা ঘরে শোবার আর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছে হোরেস, দিনের বেলা হোটেলে খায়। রাতের ডিনার খায় বোনের শ্বশুরবাড়িতে। পোষাক পাল্টে বই নিয়ে বিছানায় উঠল সে, বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে বই খুলে বসল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পড়ায় মন বসাতে পারল না। বই বন্ধ করে ফায়ার প্লেসের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে হোরেস আগুনের আঁচ ঢিমে হয়ে আসতে শুনতে পেল বাইরে শহরের বড় ঘড়িতে রাত বারোটার ঘন্টা বাজছে। বইটা একপাশে সরিয়ে বালিশে মাথা রাখতে রাখতে হোরেসের মনে পড়ে গেল গুডউইনের সঙ্গে সেই হত ভাগ্য নিগ্রো কয়েদীর জীবনের আজই শেষ রাত, পরের দিন সকাল বেলা তাকে জেলে ভেতরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। কেন কে জানে, হঠাৎ হোরেসের মনটা ভারি অস্থির হয়ে উঠল। নিজের মনেই সে বলে উঠল, পারছিনা আর এক দম সইতে পারছিনা ! ' আমার একটু ঠাঁই বদল দরকার। এবার ঝামেলা মিটে গেলেই একবার ইউরোপ ঘুরে আসব। '

পরের দিন খুব সকালে সদর দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ কানে যেতেই হোরেসের

ঘুম ভাঙ্গল। খাট থেকে নেমে সিঁড়ি বেয়ে সে এক তলায় নেমে এল, দেয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে দেখে সাড়ে ছটা বেজে গেছে। দরজা খুলতেই হোরেস দেখল রুবি যে হোটেলে উঠেছে সেখানকার নিগ্রো পোর্টার দাঁড়িয়ে।

' গুডমর্ণিং স্যার,' হোরেস প্রশ্ন করার আগেই সে বলল, ' মিসেস গুডউইন এক বার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন।'

' ঠিক আছে,' হোরেস বলল, ' তুমি গিয়ে ওঁকে বোলো আমি দশ মিনিট বাদেই যাচ্ছি।'

পোশাক পাল্টে দশ মিনিট বাদে হোটেলে ঢোকার মুখে এক ডাক্তারি ব্যাগ হাতে একজন মাঝবয়সী লোক হোটেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তার গা ঘেঁষেই হোরেস ঢুকল ভেতরে। রুবির ঘরে ঢুকে দেখল তার বাচ্চাটা ক্রুশবিদ্ধ হবার ভঙ্গিতে হাত দুটো দুপাশে মেলে শুয়ে আছে, শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে অল্প সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে।

' কাল সারা রাত ও খুব কেশেছে, ' ইশারায় ঘুমন্ত বাচ্চাকে দেখিয়ে বলল রুবি, কাশির দমকে বার বার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। একটু জ্বরও হয়েছিল, ডাক্তার খানিক আগে দেখে ইঞ্জেকসান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে গেলেন, বলেছেন কেমন থাকে জানাতে।' হোরেস একটু কথা না বলে ঘুমন্ত বাচ্চার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষন পড়ে রুবি বলল, ' আপনি ঠিকই ধরেছেন, একটা ব্যাপার আপনাকে বলা হয় নি। টমি খুন হওয়ার সময় একটা মেয়ে ওর কাছাকাছি ছিল খুব কম বয়েসি বাচ্চা একটা মেয়ে।'

' অশেষ ধন্যবাদ, ' রুবির মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প হেঁসে বলল হোরেস এমনই একটা কিছু আমিও ভেবেছিলাম। এই মেয়েটির সম্পর্কে যত টুকু জান খুলে বলো।

পপির গাড়িতে সামনের সিটে তারই পাশে বসেছে টেম্পল, টমির খুনের ঘটনা যে তার মনে কোন গভীর প্রভাব ফেলতে পারেনি তার চোখ মুখের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। উদ্বেগ আর আশংকার কোন ছাপ ফুটে ওঠে নি সেখানে। গাড়ি চলার ফাঁকে ঝাঁকুনি পেলেও টেম্পল যেন তা দিব্যি উপভোগ করছে এমন ভাবেই সামনের দিকে চোখ মেলে সে বসে আছে। লী গুডউইনের চোলাইয়ের ঠেকে আসবার মুখে পথে পড়ে থাকা বিশাল গাছের গুঁড়িটা একই ভাবে পড়ে আছে, যার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গাওয়ানের যে গাড়িটা উল্টে পড়েছিল এখনও সেটা আগের জায়গাতে পড়ে আছে। খুব সাবধানে এ জিনিস দুটো পাশ কাটিয়ে পপি তার গাড়ি নিয়ে এল বড় রাস্তায়।

মে মাসের রোদ ঝলমলে দিন, ওপারে নীলাকাশে জায়গায় জায়গায় থক থকে ক্রিমের মত দলা দলা সাদা মেঘ আপন মনে ভেসে বেড়াচ্ছে। গাড়িতে বসে হাত বাড়িয়ে মেঘ গুলোর নাগাল পেতে টেম্পলের ভারি সাধ হল, যে লোকটা খানিক আগে তারই চোখের সামনে জলজ্যান্ত অন্য একটা লোককে গুলি চালিয়ে খুন করেছে তার পাশে বসতে তার ভয় বা অস্বস্তি হচ্ছে না। পপির গাড়িতে চেপে তারই সঙ্গে কোথায় কোন দিকে সে চলেছে তা এখনও জানেনা টেম্পল, এই বিচ্ছিরি বাড়িতে এই ক দিন থাকতে থাকতে যখনই তার মন প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে, সেখানকার দুপেয়ে অমানুষ

গুলো তাকে নিয়ে ইচ্ছে মতন যা খুশি করতে চলেছে এই আশংকা সত্যি হয়ে ওঠার ভীতি যখনই উকি দিয়েছে মনের কোনে, তখনই শহরে ফিরে যাবার, জন্য একটা গাড়ি চেয়ে কাকুতি মিনতি করেছে যে গুডউইনেব মেয়ে মানুষটার কছে যে দুবেলা ঐ দুপে অমানুষগুলোর জন্য খাবার তৈরি করে, আবাব বাচ্চাও সামলায়। একবার গুডউইন সেই মেয়ে মানুষটাকে রুবি নাম ধরে ডাকছে তাও তার কানে এসে ছিল । শহরে পৌছে দেবার জন্য গাড়ি জুটিয়ে দেবে বলে সেই রুবিও কম আস্বাস দেয়নি তাকে, কথা শুনে টেম্পলের মনে হয়েছে তাকে তুলে নেবার জন্য গাড়ি বুঝি সত্যি বাইরে অপেক্ষা করছে । কিন্তু ঐ আশ্বাস দেয়া পর্যন্তই, শেষ পর্যন্ত সেই গাড়ি আর চোখে দেখেনি সে । তার পরে টমি খুন হবার পরে সত্যিই একটা গাড়িতে চেপে বসতে পেরেছে সে এই ভেবে টেম্পলের বেশ খুশি খুশি লাগছে।

গাড়ি চালানোর ফাঁকে কোন এক সময় পপির বাঁ হাতটা যে স্টেয়ারিং হুইল ছেড়ে তার কোমড় জাপটে ধরেছে তা টেরই পায়নি । টেম্পল পরনের স্কার্টটা তার হাঁটু থেকে অনেকটা উপরে উঠে এসেছে যার ফলে কোমরের নিচের ভাগ এখন স্পষ্ট খোলা । আচমকা মাথায় কি খেয়াল চাপতে বাঁ হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে টেম্পলকে এক হ্যাঁচকা টান মারল আর ঠিক তখনই প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা নেচে উঠল, পপির বাঁ হাতের আঙ্গুলের বড় নখের আঁচড় লাগল টেম্পলের সেই খোলা উরুতে । ভীষন ভয় পেয়ে চেঁচিযে উঠল টেম্পল, মাত্র একটি মুহূর্ত, তার পরে সামলে নিয়ে আবার গাড়ি ছোটাল পপি । কোমর থেকে এবারে তার বাঁ হাতটা উঠে এল টেম্পলের মাথার ঠিক নিচে । বলিষ্ঠ দুটি আঙ্গুলে তার পেছন থেকে গলা চেপে ধরে পপি বলল, ' আমি কতটা খারাপ লোক তাত্রে নিজের চোখেই দেখছ ! আর এক বার চেঁচালে তোমায় গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব মনে রেখো ! ' বলেই গলা ছেড়ে বাঁ হাতটা আবার নিচে নামিয়ে আনল পপি, তার খানিক বাদে তল পেটে সুড় সুড়ি লাগতে টেম্পল বুঝল পপির বাঁ হাতের একটা আঙ্গুল ঢুকে পড়েছে তার তল পেটে, সেখনে সুড় সুড়ি দিতে দিতে আঙ্গুলটা আরো নিচের দিকে নামতে চাইছে ।

' অ্যাই ! ' মুখ ফিরিয়ে দুচোখ পাকাল টেম্পল ' কি হচ্ছে কি এসব ? এমন বিরক্ত করলে আমি কিন্তু এবারে সত্যিই চেঁচাব, তখন দেখবে মজা ! '

' আবার কথা ! ' বাঁ হাত নিমেষে সরিয়ে এনে স্টিয়রিংএ রাখল পপি, তার দিকে না তাকিয়ে বলল ' যত ন্যাকামি আর ভদ্রতার ভড়ং আমার বেলায় কেমন ? এমন নামি জজের মেয়ে হয়ে স্কুল থেকে পালিয়ে ঐ মাগনুরের ছোঁড়ার সঙ্গে লীর চোলাই-এর ঠেকে রাতের পর রাত কাটানোর সময় ত এসব একেবারেও চোখে পড়েনি। তোমার মত নষ্ট আর নচ্ছার মেয়েদের আবার লজ্জা বলে কিছু আছে নাকি ? '

' তুমি চুপ করবে ? ' পপির গালি শুনতে খরাপ লাগলেও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেল না টেম্পল । সে যে সত্যিই এক নামি জজের মেয়ে তাও বদমাসটা ঠিক খুঁজে বের করেছে দেখে তার ভারি কান্না পেল, অনেক করে সেই কান্না চেপে টেম্পল

বলল, ' এমনি করে কষ্ট দেবে বলেই আমায় নিয়ে এসেছো নাকি ? জান, এই কদিন তোমাদের জ্বালায় আমার কিছু খাওয়া হয় নি ? খিদেই পেটের ভেতরে আগুন জ্বলছে !'

' খিদে পেয়েছে ? ' টেম্পলের কথায় কান্নার আভাস পেয়ে অপ্রস্তুত পপি বলল, ' আর কিছুক্ষন খিদেটা চেপে রাখো, শহরে পৌঁছেই তোমায় খাওয়াব কথা দিচ্ছি । '

বড় মাঝারি আর ছোট অসংখ্য শেভ্রলে আর ফোর্ডের পাশাপাশি আবার গাড়ি নিয়ে এগোল পপি । মাল পত্রে গাদাগাদি সারি সারি ট্রাকের পাশ কাটাতে লাগল সাবধানে । বেশ কিছুক্ষন পরে শহরের কাছাকাছি পৌঁছোতে খাবার জন্য আবার প্যান্‌প্যানানি শুরু করল টেম্পল ।

এতক্ষনে পপির নিজেরও খিদে পেয়েছে । একটা পেট্রল পাম্প চোখে পড়তেই সে গাড়ি দাঁড় করাল, লম্বা পথ পাড়ি দেয় এমন সব গাড়ির চালক আর তার যাত্রির জন্য নানা রকম চটজলদি খাবার এসব পেট্রল পাম্পে বিক্রি হয় তা জানে পপি । ডান দিকের দরজা খুলে সে নেমে এল, জানালা দিয়ে ভেতরে মুখ বাড়িয়ে বলল ' হুঁসিয়ার, বাইরে বেরিওনা যেন, ভিতরেই থেক, ' বলে সতর্ক করল টেম্পলকে । মুখ বের করার আগেই বলল, ' তুমি - ইয়ে বাথরুম করবে ? '

' না, ' হাত নেড়ে বলল টেম্পল । তেল ভরার টাকা কাউন্টারে জমা দিয়ে যেখানে খাবার বিক্রি হচ্ছে সেদিকে এল পপি, দুজনের খাবার জন্য কিছু স্যান্ডউইচ আর মিস্টি কিনে ফিরে আসতেই জোর চমক - অবাক হয়ে পপি দেখল গাড়ির সামনের সিটে টেম্পল নেই, নেই পেছনের সিটেও ।

' আমি এখানে ! ' টেম্পলের মেয়েলি গলা কানে আসতে পেছন ফিরে দাঁড়াল পপি, দেখল পেট্রল পাম্পের অফিসের বাইরে দেওয়ালের পাশে এক গাদা খালি তেলের পিপে, রবারের পাইপ আর এক কাঁড়ি বাতিল লোহা লক্করের উপর বসার ঢঙে বসে আছে টেম্পল । তাকে ওখানে এভাবে বসে থাকতে দেখে রেগে গেল পপি । পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ধমক দিয়ে বলল, ' এখানে ঢুকেছ কেন ? '

' না ঢুকে কি করব,' মুখ তুলে বলল টেম্পল, ' ওযে আমায় দেখতে পেয়েছে ! '

' কে দেখতে পেয়েছে,কার কথা বোলছ ?'

' আমাদের স্কুলের একটা ছেলে ওপাশের রাস্তা ধরে আসছিল, যেন সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছিল এমন ভাবে বলল টেম্পল, দূরথেকে আমায় দেখতে পেয়ে রাস্তা পেরোবার জন্য এগিয়ে এল । ও আমায় চিনতে পেরেছে তা ওর চাউনি দেখে বুঝেছি । ও রাস্তা পেরিয়ে এদিকেআসার আগেই আমি আমার দিকের দরজা খুলে বেড়িয়ে এলাম । তারপর এখানে এসে লুকিয়ে পড়লাম । ছেলেটা রাস্তা পেরিয়ে এপারে এসে গাড়ির ভেতর আমায় খুঁজছে এখানে বসেই তা আমি দেখেছি । আমায় না পেয়ে চলে গেল । কি মজা ! ' বলে বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে টেম্পল হেসে উঠল খিলখিল করে।

' নাও ভারি কাণ্ড করেছো । ' বিরক্তি মেশানো গলায় বলল পপি । ' এবারে

এসে গাড়িতে ওঠো ।'

আমি যে উঠতে পারছিনা ।' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল টেম্পল, 'এখানে লোহা লক্কড়ের মাঝখানে আটকে গেছি ।'

লোহা লক্কড় খানিকটা সরিয়ে টেম্পলকে টেনে তুলল পপি। গাড়িতে এসে বসার পরে প্যাকেট খুলে দু'টো স্যাণ্ডউইচ আর মিষ্টি তুলে দিল তার হাতে । শিশুর মত কৌতূহলী চোখ নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে খেতে লাগল টেম্পল । এই ফাঁকে এঞ্জিন চালু করল পপি । গাড়ি ছুটল মেমফিস শহরের দিকে । আবার কিছুদূর যাবার পরে আবার পপির বাঁ হাতখানা সরে এল । পেছন থেকে টেম্পলের ঘাড়ে হাত বোলাতে লাগল পপি ।

' হালকা খাবার খেয়ে টেম্পলের পেটের জ্বালা কিছুটা মুড়িয়েছে, দু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে সে সামনের দিকে । ঘাড়ে পপির হাতের আঙুলের ছোয়াঁয় গোড়ায় অস্বস্তি লাগলেও এখন তা সয়ে গেছে । পেট্রল পাম্প ছেড়ে বেশ কিছুদূর আসার পরে ছেলে মানুষি ভরা গলায় সে বলে উঠল ' গির্জা ! ঐ দ্যাখো একটা গির্জা, যাবে ভেতরে ?'

' গির্জায় গিয়ে আমায় বিয়ে করবে বলে যদি কথা দাও শুধু তাহলেই ওখানে যাব,' মুখ টিপে হেসে বলল পপি ।

' বিয়ে !' তার কথা শুনে অবাক হল টেম্পল । দু'চোখ কপালে তুলে বলল 'তুমি ত একটা খুনী, আমার সামনে নিজের হাতে টমিকে খুন করেছো । আমার বাবা জানতে পারলে তোমায় ঠিক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবেন । ওঁর মেয়ে হয়ে আমি তোমার বিয়ে করব একথা শোনার পরে গুডউইনের বাড়ির চোলাই- এর ঠেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতাম, হাত পা বেঁধে কোমরের বেল্ট খুলে ছাল চামড়া তুলে তারপর তুলে দিতাম জানোয়ার ভ্যানে র হাতে । কিন্তু তোমায় বড্ড ভাল লেগে গেছে সেসব করব না । তোমার জন্য ওষুধ গো সোনা । চলো, যেখানে তোমায় মানবে তোমায় সেখানে নিয়ে যাই ,' বলে টেম্পলের দিকে অবহেলায় চাউনি ছুঁড়ে জোরে গাড়ি ছোটাল পপি। বিকেল ফুরিয়ে আসছে এমনই সময় সে গাড়ি ফিরে এসে পৌঁছোল পুরোনো শহর মেমফিসে । বড়রাস্তা না ধরে বন্দরের কাছেই একটা সরু গলিতে গাড়ি ঢোকাল পপি, খালাসী মহল্লা, সস্তা বার, হায় পরিত্যক্ত মাল গুদাম পেরিয়ে গলির শেষমাথায় কাঠের তৈরী এক পুরোনো তেতলা বাড়ির সামনে সে গাড়ি দাঁড় করল । হাত ধরে টেম্পলকে বাইরে বের করে আনল সে, তারপরে টানতে টানতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল ওপরে । সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে এক কমবয়সী নিগ্রো যুবতী কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকে চলেছে আপন মনে, ঘাড় ফিরিয়ে একবার হাসিমুখে টেম্পলের দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল । সেদিকে ঢোকার ইশারা করল । পপির সঙ্গে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল টেম্পল, দেখল সামনে নিচু খাটে আধশোয়া হয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে এক মাঝবয়সী যুবতী, পরনের কালো রেশমী ঢোলা গাউন হাতে মাথায় আর করে বসানো ফুলের কাজ করা টুপি দেখে টেম্পল বুঝল মহিলা অল্প কিছুক্ষণ হল

ফিরেছেন গির্জা থেকে। খানিক আগে গলায় রঙিন ফিতে বাঁধা যে কুকুর দুটো দেখেছে টেম্পল, তাদের একটা কোন ফাঁকে খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। যুবতীর কোলে চড়ে আদর করে জিভ দিয়ে তার গাল গলা চেটে দিচ্ছে সে। যুবতীর একহাতে কাঠের জপের মালা,অন্য হাতের মুঠোয় ধরা মগভর্তি বিয়ার। জপ করার ফাঁকে থেকে থেকে সে মগের বিয়ারে চুমুক দিচ্ছে।

' তোমার কাছে একে নিয়ে এলাম,' পপি ইশারায়ে টেম্পলকে দেখিয়ে সেই যুবতীকে বলল মাসি, ' একদম আনকোরা মাল। একে ঘষে মেজে তৈরী করে আমার মনের মত করে বানিয়ে দেবার সব দায়িত্ব তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, আজ থেকে তুমি একে রাখবে; খাওয়ার ব্যাপারে আদর যত্ন করে কায়দা কানুন সব শেখাবে। মেয়েটা এখনও একটু ছেলেমানুষ আছে বটে। তা কথা না শুনলে মাঝে মধ্যে ঘা কতক দিয়ো। স্কুল পালানো মেয়ে মাঝে মধ্যে একটু আধটু ধোলাই না খেলে এরা কিছু শিখতে চায় না। এই নাও ওর খরচাপাতি বাবদ। এগুলো এখন রাখো' বলে একগোছা নোট পার্স থেকে বের করে যুবতীর হাতে দিয়ে পপি বলল, ' আমি তাহলে এসে খোঁজখবর নিয়ে যাব। দেখো ওর ঘরে আমি ছাড়া অন্য খদ্দের যেন না ঢোকে।'

' সেদিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। পপি সোনা,' আশ্বস্ত করার ঢং- এ হাত তুলে যুবতী বলল, ' ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোমার মনের মত করে তোলার সব ভার আজ থেকে আমিই নিলাম। ' আহা কি মিষ্টি কচি মুখ, দেখলেই মায়া হয় নিজের আগের জীবনের কথা মনে পড়ে যায়। এসো ত সোনা, আমার পাশটিতে এসে বোসত,' বলে হাত ধরে টেম্পলকে নিজের পাশে বসিয়ে যুবতী নিজের মনে বলতে লাগল, 'আমি হলাম গে রেবা রিভার্স। তা তুমি আমায় মিস রেবা বলেই ডেকো। বুঝলে সোনা। এই মেমফিস শহরে বড়লোক ছোটলোক ধনী গরিব উকিল, ডাক্তার, পুলিশ, জজ, চোর, ডাকাত, খুনে রেবা রিভার্সকে সবাই এক ডাকে চেনে। তোমরা আসার খানিক আগেই পুলিশের দুই অফিসার আমার সঙ্গে ঠাণ্ডা বিয়ার খেয়ে সময় কাটিয়ে গেছে। মেমফিসের খোদ পুলিশ কমিশনার কাল রাতেই আমার মেয়েদের একজনের সঙ্গে রাত কাটিয়ে গেছে। রেবা রিভার্সকে ওরা সবাই জানে, চেনে, মানে। এখানে এসে দু'হাতে জলের মত পয়সা ওড়ায়। এত বড়বড় খানদানী মানুষ আমার খদ্দের আমি কিন্তু এদের কারও সঙ্গে বেইমানি করি না, একজনের হাঁড়ির খবর আরেকজনের কানে তুলে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিয়ে দু'জনের কাছ থেকে পয়সা খাইনা,' বলতে বলতে বিয়ারের মগটাকে সে আরেক চুমুক দিল। মাসির হাতে তাকে গছিয়ে দিয়েই কেটে পরেছে পপি। এবারে এদিকে ওদিকে তাকাতে রেবার ডানহাতের আঙ্গুলে বসানো আংটির বড়সড় হলদে হিরে তার নজরে পড়ল।

' পপি কি বলে গেল নিজে কানেই ত তা শুনলে,' টেম্পলের গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল রেবা, ' এখন থেকে তুমি এখানেই আমার কাছে থাকবে, তোমায় আদর আর শাসন করা, দু রকম অধিকারই সে দিয়ে গেছে। আমার লক্ষী

মেয়ের মত যেমনটি বলব তেমনটি চললে ভয় নেই, জাম কাপড়, হিরের গয়নায় তোমার গা ভরিয়ে দেব। কিন্তু কথা না শুনলে কিন্তু রক্ষা নেই, চাবকে গায়ের ছাল চামড়া সব ছাড়িয়ে নেব আগেই বলে রাখছি। ওরে বাবা রে। আর পারছিনা, আমি গেলাম এবারে সত্যিই গেলাম, উঁ-হু ' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ' বলল সত্যিই মরে গেলাম, উঁফ - উঁফ ' বলে মুখ বন্ধ করে এক অদ্ভুত আওয়াজ করল রেবা। সেই আওয়াজ শুনে আর তার চোখমুখের ভাবভঙ্গি দেখে প্রচণ্ড হাসিতে পেট ফেটে গেলেও খুব কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল টেম্পল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আরেক চুমুক বিয়ার খেয়ে রেবা বলল, ' হাঁপানির টানটা হঠাৎ এত বেড়েছে। এবারে দেখছি ডাক্তার না ডেকে উপায় নেই। ওফ! ওফ! খক্! খক্! খক্! খক্! খ্যাক! খ্যাক। খ্যাক! হুঁ - উ - ম - ফ! উ - ম - ম! ওফ! ফোঃ! ' প্রবল হাঁপানিব টানের দমবন্ধ আর্তনাদের সঙ্গে কাহিল রেবা এবারে বাহিশে মাথা দিয়ে এলিয়ে পড়ল। এমনই বিতিকিচ্ছিরি কিম্ভূত আওয়াজ শুনে খানিক আগে ভেতর থেকে উপছে ওঠা হাসির বেগ বহুকষ্টে দমন করেছিল টেম্পল। এবারে রুমালে মুখ চেপে সেই হাসির রাশ আবার কণ্ঠ করে চাপল সে।

' পপি আমাদের হিরের টুকরো ছেলে,' হাঁপের টান কিছু কমতে টেম্পলের উদ্দেশ্যে বলল বেবা, ' আর কারও জায়গায় ফেলে না দিয়ে আমার কাছে তোমায় এনে উচিত কাজে করছে সে। তোমার মত একটা ছোট টুকটুকে মেয়েকে নিজে হাতে মনের মত করে গড়েপিটে তোলার সাধ আমার বহুদিন আগেই ছিল, সে সাধ মেটাতে কত বছর ধরে পপির পায়ে আমায় তেল মাখাতে হয়েছে জানো? জানো না তা তোমার চোখের চাউনি দেখেই আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। আরে বাপু বাইরে বদমায়েসিই করুক না কেন আসলে পপি একটি মানুষ। রক্ত মাংসের তরতাজা পুরুষ মানুষ। ওর মত কোনও পুরুষ মানুষের কি মেয়ে মানুষ ছাড়া চলে? ' একদমে এতগুলো কথা বলে হাঁপাতে লাগল রেবা। কুকুর দুটো কোলের ওপর লাফিয়ে উঠল। আবার রেবার গাল গলা চেটে আদর করতে লাগল। ' মিস রেবা, মিঃ বিন ফোর্ড,' কুকুর দুটোর নাম ধরে গম্ভীর গলায় ডেকে বলল রেবা ' অনেক আদর করেছো আমায় আর না, এবারে আদব করার নতুন সোনামণি এসেছে, সারাদিন ওকে প্রাণভরে যত খুশি আদর কোর। ' বলেই বড় বড় চোখে টেম্পলের মুখের দিকে তাকাল রেবা, গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, ' ইয়ে তোমার নাম কি বাছা পপির কাছ থেকেও জানা হলনা।' ' টেম্পল অল্প হেসে টেম্পল বলল, ' টেম্পল ড্রেক।' ' বাঃ, নিজের মনে বলে উঠল রেবা, ' তোমার নামটিতে দেখছি ছেলেদের মত। অ্যাই মিনি, গেলি কোথায় বাপু?' নিগ্রো কাজের মেয়ে মিনি সঙ্গে সঙ্গে হাসি মুখে এসে হাজির হল। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওর জামা কাপড় সব খুলে ধুয়ে শুকোতে দে, হায় ওকে একটা ভাল শুকনো তোয়ালে পরিয়ে রাখ। ডাক্তার আমায় দেখতে এলে মনে করে ওকেও একবার দেখিয়ে নিতে ভুলিসনা যেন। বাইরে থেকে কি না কি রোগ বয়ে নিয়ে এসেছে কে জানে! এটুকু গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস

করে বলল সে ।

' বল বাছা,' ইসারায় টেম্পলকে দেখিয়ে মিনিকে বলল রেবা, ওপরে গিয়ে জামা কাপড় খুলে তোয়ালে জড়িয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে জিরিয়ে নাও । ডাক্তার এলে তোমায় একবার দেখবেন ।'

নিগ্রো কাজের মেয়ে যুবতী মিনি টেম্পলের হাত ধরে নিয়ে এল পাশের ঘরে তার ব্লাউজ স্কার্ট নিকার্স, পায়ের মোজা সব এক এক করে খুলে নিয়ে একটা বড় শুকনো তোয়ালে দিয়ে তাকে মুড়ে দিল, তারপরে তোয়ালের দুটো প্রান্ত বুকের কাছে এনে বেঁধে দিয়ে বলল ' যাও, এবারে মিস রেবা যেমন বলেছেন তেমনই শুয়ে জিরিয়ে নাও ।' তারপরে গলা নামিয়ে বলল, ' মিস রেবার কথা শুনে চলো বাছা, তাতে তোমার আখেরে লাভ বই লোকসান হবে না ।' তার কথা শেষ হতে টোকা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল রেবা, তাকে দেখেই টেম্পল খানিক তফাতে মাথা নিচু করে খাটে পাতা নরম গদির বিছানায় শুয়ে পড়ল ।

' এইত বেশ লক্ষ্মী মেয়ে,' টেম্পলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল রেবা, ' যে মরদ তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে একটা রাত তার পাশে শোবার জন্য এই এলাকার সব মাগিরা কেমন মুখিয়ে থাকে জানোনা বাছা; সেই সব মাগিদের কথা বলছি যারা সোয়ামি ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করার পাশাপাশি দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার করতে রাতের বেলা সবার নজর এড়িয়ে রংচং মেখে খানকি সাজে । এইত ক'দিন আগে একটা কচি বউ পপির সঙ্গে রাত কাটানোর লোভে পঁচিশ ডলার মিনিকে ঘুষ দিয়ে ওকে হাত করতে চেয়েছিল । কিন্তু ঐ যে খানিক আগে বললাম যার তার মুখের দিকে তাকানোর লোক আমাদের পপি নয় । নগদ পঁচিশ ডলার হাতে পেয়েও ঐ মিনি মাগি কিছুতেই পপিকে রাজি করাতে পারলনা । কচি বউটার সবে বিয়ে হয়েছে, পপি রাজি নয় শুনে বেচারির সেকি কান্না । বউটার সোয়ামি ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। পাশে শুয়ে একটু আদর সোহাগও করেনা । শুধু ও একা নয় । রাত কাটানো বাবদ এদিকের যত কচি খানকি খদ্দের পিছু একশো ডলার নেয় অনেক চেষ্টা করেও পপির মন তাদের অনেকেই কাড়তে পারেনি । আসলে পপির কতকগুলো ব্যাপার আছে, ওকে সব মাগি বুঝে উঠতে পারেনা । যাকে ওর মনে ধরে তার পেছনে ও জলের মত টাকা ওড়ায়, আর যাকে মনে ধরেনা সেই রাস্তার খানকিদের ও নিজের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়না । হ্যাঁ রে জিনি, তুই এর জামা কাপড়গুলো কি করেছিস ?' নিগ্রো যুবতীর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল রেবা ।

' আজ্ঞে ওগুলো এখুনি গরম সাবান জলে ভাল করে কাচব,' মিনি বলল ' তার পরে জল নিংড়ে রান্নাঘরে উনুনের পেছনে টাঙ্গিয়ে দেব । শুকিয়ে গেলে ভালকরে ইস্ত্রি করে আবার ফিরিয়ে এনে ওকে আগের মত পরিয়ে দেব ।'

' না,' আবদার ধরা গলায় টেম্পল ফিসফিস করে বলল, ' ওগুলো আমি আর পরব না, পরতেই পারবনা ।'

' বেশত,' রেবা হেসে বলল । ' মন যদি না চায় ত পরবেনা । আজ শুয়ে জিরিয়ে শরীর ভাল করে নাও কাল তোমায় নিয়ে আমি মার্কেটিং- এ বেরোব । তোমার পছন্দ মত জামা কাপড় কিনে দেব ।'

টেম্পলের জামা কাপড় নিয়ে মিনি চলে যাবার পরে অন্য একটি কাজের মেয়ে ছোট এক বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার আর এক গ্লাস জিন এনে ভেতরে ঢুকল । টেম্পলের কাছে সে ট্রে নিয়ে এসে দাঁড়াল । গলায় রঙিন ফিতে বাঁধা কুকুর দুটোও এসে ঢুকল ভেতরে । টেম্পলের খাটের কাছে এসে তারা লাফিয়ে লাফিয়ে বিছানায় ওঠার চেষ্টা করতে লাগল ।

' মিস রেবা ! মিঃ বিনফোর্ড তোমরা এখন বাইরে যাও, টেম্পলকে জিরোতে দাও, কাল ও তোমাদের অনেক আদর করবে । নাও বাছা অনেকটা পথ গাড়িতে চেপে এসেছ, এ দু'টো গলায় ঢাললে দেখবে সুস্থ লাগছে ।' ট্রে থেকে জিনটা তুলে তারিয়ে তারিয়ে খেল টেম্পল, ছোট বিয়ারের বোতলটা ট্রে থেকে তুলে খাটের পাশে টেবলে নামিয়ে রেখে বলল, ' এটা আর খেতে পারব না ।'

' হ্যাঁ, ওকি কথা, পপি শুনলে কি বলবে ?' ' রেবা বলল ঠিক আছে, এখন ইচ্ছে নাহয় খানিক পরে না হয় খেও, কিন্তু খেতে তোমাকে হবেই, জানোত পপিকে সেসব মেয়ে খুশি করে তাদের ও আসল হিরের আংটি উপহার দেয় । নাও, হাঁ করো ত লক্ষ্মী সোনা,' বলে এগিয়ে এসে ছোট বোতলের ছিপি খুলে খালি গ্লাসে কিছুটা বিয়ার ঢালল রেবা, গ্লাস নিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল টেম্পলের পাশে বলল, ' হাঁ করো, আমি খাইয়ে দিচ্ছি, একটু কষ্ট করে চটপট গিলে অনিচ্ছার সঙ্গে গিলে মুখ বিকৃত করে টেম্পল বলল, ' পারছিনা, আজ আর গিলতে পারছিনা । দোহাই আপনারা বিশ্বাস করুন আমায় ।'

' ঠিক আছে, এখন এটা রেখে যাচ্ছি এখানে । পরে সুস্থ লাগলে খেও,' বলে হাসল রেবা । তারপরে টেম্পলের মাথায় হাত বুলিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল । কুকুর দুটোও রেবার পেছন পেছন বেরিয়ে গেল । অন্য কাজের মেয়েটি তখনও দাঁড়িযে তাকে কাছে ডেকে টেম্পল জানতে চাইল কুকুর দুটোর অদ্ভুত নামকরণ কে করছে।

' এসব রেবারই কাজ,' কাজের মেয়েটি বলল, ' এ বাড়ির মালিক ছিলেন মিঃ বিনফোর্ড, উনি ছিলেন রেবার প্রেমিক । দু'বছর আগে উনি মারা গেছেন । ওঁরই স্মৃতিতে গলায় নীল ফিতে বাঁধা কুকুরটাকে ঐ নামে ডাকে রেবা । আর যেটার গলায় গোলাপি ফিতে ওটাকে মিস রেবা বলে ।' খানিক বাদে বাইরে দরজার পাল্লার গায়ে খচ্‌খচ্ আওয়াজ হতে চমকে উঠল টেম্পল । খাট থেকে নেমে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেখে কুকুরদুটো মুখ তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে, টেম্পল বুঝল এরাই ভেতরে ঢোকবার জন্য থাবার নখ দিয়ে দরজার পাল্লা আঁচড়াচ্ছিল । টেম্পল এক পাশে সরে দাঁড়াতেই কুকুর দুটো ঢুকে পড়ল টেম্পলের খাটের নিচে, ঢুকে শুয়ে পড়ল । কুকুর দুটো এঘরেই শুয়ে অভ্যস্ত আঁচ করে দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে খানিকটা বিয়ার

গলায় ঢেলে আবার শুয়ে পড়ল টেম্পল । এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল নিজের অজান্তে ।

কানের কাছে মিষ্টি ঘন্টার আওয়াজে তার ঘুম গেল ভেঙ্গে; চোখ মেলতে টেম্পল দেখল শিয়রের বন্ধ জানালার কাচের সার্সির ওপাশে ঘন কালো আকাশের বুকে এখানে ওখানে কিছু তারা জ্বলছে হিরের কুচির মত । মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল খাটের পাশে দেয়ালে আঁটা কাঠের তাকের ওপরে রাখা একটা ঘড়ি । তার দু'টো কাঁটার মধ্যে মিনিটের বড় কাঁটাটা নেই, ঘন্টার ছোট কাঁটাটা দশ- এর ঘর ছুঁয়ে আছে ।

' ওমা,' নিজের মনে বলে উঠল টেম্পল ' সেই বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত একটানা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম । এরপর সাজগোজ করব কখন বল নাচের সময় ঘনিয়ে এল ।'

আজ শনিবার আর ফি শনিবার রাতে স্কুলের ছেলে মেয়েরা রাত দশটায় সেজে গুজে বলনাচ নাচে সেকথা মনে পড়তে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুকের ভেতর থেকে । শনিবারের রাত মানেই পরদিন রবিবার, ছুটির দিন নারী পুরুষেরা জোড়ায় জোড়ায় গির্জায় যাচ্ছে অনেক পরিচিত এই ছবি ভেসে উঠল তার মনের পর্দায় ।

লাগোয়া এক চিলতে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে ফিরে এসে খাটের ওপর বসার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল মিনি । তার দু'হাতে ধরা ট্রে-তে বসানো প্লেটভর্তি খাবার থেকে ধোঁয়া উঠেছে । খাবার ভর্তি প্লেটে জিনের বোতল ছোট গ্লাস ছাড়া এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই দেখে আশ্বস্ত হল টেম্পল । গলার ভেতরটা শুকিয়ে আছে, এইসময় একটা সিগারেট পেলে ভাল হত । মিনির বাঁ কাধে ঝুলছে একটা ঘরে পরার ঢোলা রঙিন গাউন । খাবারের ট্রে-টা খাটের সামনে ছোট টেবলে রেখে সেই গাউন সে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ' এটা পরে তোয়ালেটা খুলে দাও, বাথরুমে তুলে রেখেছি, তারপর গরম গরম খেয়ে নাও ।' কাল সকালে ডাক্তার তোমায় দেখতে আসবেন ।'

' ডাক্তার,' ট্রেতে রাখা প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করে ধরালো টেম্পল, দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে বলল, ' কোনও রোগ হয়নি ।'

' তোমার মুখের কথা রেবা বিশ্বাস করবেন কেন ?' হাল্কা হেসে মেয়েটি বলল, ' এবাড়িতে কোনও নতুন মেয়ে এলেই ডাক্তার এসে দেখেন তার ভেতরে কোনও রোগব্যামো আছে কিনা । এছাড়া প্রতি মাসে একদিন এবাড়ির সবাইকে ডাক্তার দেখে যান ।' ' কেন প্রতিমাসে ডাক্তার সবাইকে দেখতে আসেন কেন ?' বলেই টেম্পল বুঝল বোকার মত প্রশ্নটা ঝেড়ে ফেলেছে সে ।

' সেই এক কারণ,' হাত উল্টে কাজের মেয়েটি হাসল, ' এ বাড়িতে রোজ কত রকম খদ্দের আসে, তাদের কারও গা থেকে কোনও রোগ যদি কারও শরীরে ঢুকে যায় ।' কথা শেষ করে মুচকি হেসে মেয়েটি বলল, ' এটা যে বেশ্যাবাড়ি তা কি তুমি এখনও টের পাওনি সোনা,' একটু থেমে মেয়েটি বলল । ' যে নাগর তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে সেই পপি তোমার মত অনেক কচি চিড়িয়া এনে তুলে দিয়েছে রেবার

হাতে । খাইয়ে দাইয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে রেবা তাদের আটকে রেখেছে এবাড়ির খাঁচায়, তোমাকেও রাখেবে ।'

' আমার একদম খেতে ইচ্ছে করছেনা ।' মেয়েটির কথা শুনে এতক্ষণ ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল টেম্পল, এবারে হাত ছুঁড়ে সে বলল ' আমি খাবনা, নিয়ে যাও এসব ।'

' ওসব কথা বললে ত চলবেনা সোনা,' মুচকি হেসে কাজের মেয়েটা বলল, ' ইচ্ছে না করলেও খেতে হবে নয়ত শরীর টিকবে কি করে ? আর শরীর না টিকলে তোমায় দেখে খদ্দের মজবে কেন ? ভালকথা বলছি খেয়ে নাও, নয়ত গোদা হাতের চড় থাপ্পর আর বেল্টের ঘা মেরে রেবা এগুলোই তোমায় গিলিয়ে ছাড়বে, তবে ততক্ষণে এগুলো আর গরম থাকবেনা, জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে ।'

' কি, আমায় মারবে ?' চটে উঠে টেম্পল বলল, ' পপিকে এসব বলে দিলে তখন কি হবে ভেবে দেখেছো ?'

' ও ভয় দেখিয়োনা, সোনা,' দরজার দিকে এগোতে এগোতে চাপকে তোমার ছাল ছাড়িয়ে নেবার কথা পপি নিজেই বলে গেছে রেবাকে । আমি যাচ্ছি, আধ ঘন্টা বাদে আবার আসব তার মধ্যে জামা পরে লক্ষ্মী মেয়ের মত খেয়ে নাও । হ্যাঁ, তোমার জন্য ঐ বোতলে একটু জিনও এনেছি, খাবার আগে ওটা গলায় ঢেলে নিলে দেখবে দারুণ খিদে পেয়েছে । ' বলে বাইরে থেকে দরজা টেনে ভেজিয়ে দিল মেয়েটি ।

পুরোটা শেষ হবার আগেই আধপোড়া সিগারেটটা ফেলে দিল । টেম্পল বোতলের জিনটুকু গলায় ঢেলে দেখল খারাপ লাগছে না। প্রথমে ঠুকরে ঠুকরে একটা আধটা একটু মাংস খেল সে, তারপরে কাঁটা চামচ হাতে প্লেটের খাবারের সবটুকুই খেল । খেয়েদেয়ে এঁটো প্লেট সমেত ট্রে খানা খাটের পায়ার এক পাশে নামিয়ে রাখল টেম্পল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঢোলা গাউনখানা হাতা দিয়ে গলিয়ে বুকের তোয়ালের বাঁধন খুলে ফেলল । তোয়ালেটা তুলে নিয়ে বাথরুমের আংটায় ঝুলিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে খাটে উঠে হাত পা ছড়িয়ে আবার শুয়ে পড়ল টেম্পল চোখ বুঁজে কিছুক্ষণ ঘুমোনোর চেষ্টা করল কিন্তু ঘুম এলনা । শেষকালে দু'চোখ মেলে ঘরের সিলিং ফ্যানের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, যেন মাথার ভেতরটা পুরো ফাঁকা সেখানে কিছু নেই এমন একটা অনুভূতি তার হতে লাগল ।

ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কোন একসময় চোখ জুড়ে এসেছিল সে টেরও পায়নি, এক সময় পাশের কামরা থেকে ভেসে আসা নারী পুরুষের গলায় চড়া হাসির আওয়াজে তন্দ্রার আবেশটুকু গেল কেটে, কৌতূহলী টেম্পল খাট থেকে নেমে দরজার পাল্লা খুলে মুখ বাড়াতেই দেখল বাড়িউলি রেবা বিয়ার ভর্তি মগ হাতে তার কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছে চেঁচাতে চেঁচাতে কাজের মেয়েদের নানারকম হুকুম দিচ্ছে আর থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছে বাঁ হাতে ধরা বিয়ারের মগে । রেবার ডান হাতে এ বেলাও কাঠের জপের মালা স্পষ্ট দেখতে পেয়ে টেম্পলের হাসি পেল । রেবার গলায় আওয়াজ

কানে আসতে কুকুর দু'টোরও ঘুম গেল ভেঙ্গে, খাটের তলা থেকে বেরিয়ে টেম্পলের গা ঘেঁষে তারা দ'জনে বাইরে বেরিয়ে গেল, টেম্পলের চোখে চোখ পড়তে অল্প হাসল রেবা, নিজের ঘরের বাইরে দাঁড়ানো কারও দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে কি যেন ইশারা করল সে। টেম্পল দরজা ভেজিয়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল । ঘুমোবে বলে সবে চোখ বুঁঝেছে ঠিক তখনই তার ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ তার কানে এল । চোখ মেলতেই টেম্পল দেখল দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে পপি, মাথার টুপির কোনাটা ডানদিকে অল্প নামিয়ে দেয়ায় তার পুরো মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না । পরমুহূর্তে ভেতরে ঢুকে দরজার পাল্লা ভেজিয়ে পপি ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। বড় বড় পা ফেলে পপি এসে দাঁড়াল তার খাটের সামনে । টেম্পল কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে বিছানায় উঠে পড়ল । তার মতলব বুঝতে পেয়ে ভয়ে শিউরি উঠল টেম্পল, তাকে বাধা দিতে পরনের ঢোলা গাউনের বুকের কাছটা দু'হাতে চিবুক পর্যন্ত তুলে ফেলল সে । কিন্তু বৃথা চেষ্টা দু'হাতে খিমচে ধরে গাউন খানা তার গা থেকে টেনে খুলে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে ফেলল পপি । গাউন খানা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কচি নরম টেম্পলকে বলিষ্ঠ দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল পপি । দু'হাতে ঠেলে তাকে সরিয়ে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল টেম্পল, দু'হাতের ধারালো নখ বসিয়ে দিল পপির মুখে, 'ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও, এখন না' বলে বারবার গোঙানির মত আওয়াজ তুলে কেঁদে কঁকিয়ে উঠল সে । কিন্তু পপিকে ঐভাবে সে রুখতে টেম্পল ড্রেক, ঐ অবস্থাতেও পাশের ঘর থেকে বাড়িউলি রেবার কিছু অশ্লীল গালাগালাজ তার কানে ভেসে এল । পারলনা, বারবার বাধা খেতে খেতে ক্ষেপে উঠে পপি দু'হাতে ঠাস্ ঠাস্ করে কয়েকবার চড় মাড়ল তার দু'গালে, মেরেই তার মুখখানা জোড়ে চেপে ধরল নিজের বুকে ।

চোলাই মদের উৎকট গন্ধে টেম্পলের নাক জ্বলে যাচ্ছে, পপির পুরুষালি বুকের লোমের জঙ্গলের সুড়সুড়ি অসহ্য ঠেকলেও চোলাই মদের সেই উৎকট গন্ধ নাক বরে নিতে নিতে একসময় পপির দু'হাতের বাঁধনে এলিয়ে পড়ল কিশোরী ।

'কিন্তু যার কথা বলছো সেই কম বয়সী মেয়েটিকে নিয়ে তো কোনও ঝামেলা হয় নি, 'রুবির কথা শোনার পরে হোরেস বলল,' 'তুমি যখন ও বাড়ি ছেড়ে চেলে এলে তখনও পর্যন্ত মেয়েটা ঠিক ছিল বলছ, আবার মেয়েটাকে পাশে বসিয়ে পপিকে গাড়ি চালাতেও তুমি নিজের চোখে দেখেছো বলছ। তা এনিয়ে এত ভাবনা কি আছে। লিফট দেবে বলেই পপি মেয়েটাকে ওর গাড়িতে তুলেছিল এও তো হতে পারে। মেয়েটাকে নিয়ে ঐ বাড়িতে ও বাড়িতে কোনও ঝামেলা হয় নি তাও তুমি নিজেমুখে বলছো।'

খাটে পাতা বিছানার একধারে বসে রুবি মুখ নিচু করে তাকিয়ে আছে তার বাচ্চার দিকে। জীর্ণ, বিবর্ণ, কিন্তু পরিষ্কার কম্বলের নিচে বাচ্চাটিকে শোয়ানো হয়েছে। দু'হাত ছোট্ট মাথার ওপর দু'পাশে ছড়ানো। দু'চোখ তার অর্ধেক খোলা, সে চোখের মণি উঠেছে কপালে যার ফলে শুধু মাটির সাদা অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। শ্বাসকষ্টের প্রবল কাশি ও শ্বাসকষ্টের দরুণ তার মুখখানা এখনও ঘামে ভেজা হলেও তার শ্বাসপ্রশ্বাস এখন অনেক স্বাভাবিক হয়েছে। অল্প কিছুক্ষণ আগে হোরেস যখন ঘরে ঢুকল তখনও যা এতটা স্বাভাবিক ছিল না। খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসানো কাচের গ্লাসে খানিকটা গ্লুকোজ মেশানো জল পড়ে আছে, তাকে একটা ছোট চামচ ঢোকানো। একপাশে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে দেখা যাবে দিনের কর্মব্যস্ততা এরই মাঝে শুরু হয়ে গেছে, শুরু হয়েছে গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়।

'ওখানে যারা দিনরাত পড়ে থাকত তাদের সবাইকেই লী মেয়েমানুষ নিয়ে আসতে সবসময় মানা করত,' বাচ্চার মুখের ওপর থেকে মুখ না তুলে বলল রুবি, 'তাই মুখে কিছু না বললেও মেয়েটা আর তার ঐ ছেলে বন্ধুকে ওর কারও পছন্দ হয় নি। সন্ধ্যে হবার আগে আমি নিজে মেয়েটাকে এই বলে হুঁশিয়ার করছিলাম যে ও বাড়িতে যারা আছে তারা সবাই খারাপ লোক, এতটাই খারাপ যা ও ভাবতে পারবে না, সূর্য ডোবার পরে চারদিক আঁধার হয়ে এলেই ওরা অমানুষ হয়ে ওঠে তাই দিনের আলো থাকতে থাকতে মেয়েটাকে ওখান থেকে চলে যেতে বলেছিলাম। মেয়েটার দোষ নেই। ওর সঙ্গে যে ছেলেটা ছিল তারই পাল্লায় পড়ে বেচারি ওখানে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ছেলেটাও তেমনই, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে আমাদের বাড়ির কাছেই একটা গাছের গুঁড়িতে এমন ধক্কা মারল যার ফলে গাড়ি উল্টে ওরা দু'জনেই ছিটকে পড়ল বাইরে। মুখে চোট লেগে ছেলেটার নাক-মুখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, ভাল করে হাঁটতে পারছে না। তারপরেও আবার কাঁড়ি কাঁড়ি মদ গিলছে। ঐ ভাবেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে যখন রাতের বেলা সবার সঙ্গে খেতে বসল তখনও ও দাঁড়াতে পারছে না। নেশার ঘোরে কথা বারবার

জড়িয়ে যাচ্ছে, হতভাগার নাকে-মুখে তখনও শুকনো রক্ত গেলে আছে। পয়সাওয়ালা বাপের কলেজে পড়া এইসব ছেলেগুলো ধরেই নিয়েছে লী যখন পুলিশের চোখ এড়িয়ে চোলাই মদ তৈরী করে বিক্রি করছে, তখন তার বাড়িটা ওদের মদ খাওয়া আর মাগিবাজী করার জায়গা লীর যে বউ বাচ্চা আছে, সংসার আছে আর আছে একগাদা পোষ্য, এসব নিয়ে ওরা আদৌ মাথা ঘামায় না।'

'ছেলেটার নাম কি বলতে পারো?' জানতে চাইল হোরেস।

'পদবী শুনেছি স্টিভেনস,' রুবি একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, ছেলেটাকে মেয়েটা গাওয়ান গাওয়ান বলে ডাকছিল মপে পড়েছে।'

'কি বললে, গাওয়ান, গাওয়ান স্টিভেনস?' ছেলেটার নাম ও পদবী শুনে ভুরু কোঁচকালো হোরেস।

'আপনি বলছেন ঐ টেম্পল মানে ঐ বাচ্ছা মেয়েটাকে নিয়ে কোনও ঝামেলা হয় নি; কিন্তু ভেবে দেখুন যত ঝামেলা সব তো ও ওখানে আসার পরেই বাধল। অথচ আমি তো ওর কোনও ক্ষতি করি নি। ওকে আমি যত শীগগির সম্ভব ওখান থেকে চলে যেতে বলেছিলাম, বলেছিলাম সন্ধ্যের আগেই বিদেয় হতে। চলে যেতে পারে নি মানছি, কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে বসে না থেকে ও মানে মেয়েটা ওদের চোখের সামনে ঘুর ঘুর করতে লাগল—এই রান্নাঘরে এসে আমার সঙ্গে আবার খানিকবাদে আমি চোখ তুলে তাকাবার আগেই মেয়েটা অন্য দরজা দিয়ে এক পাক ঘুরে এল, আর তার ফলে ওরা মদ খেতে খেতে ঠিক দেখে ফেলল ওকে, ও ওদের নজরে পড়ে গেল। যে ক'টা লোক ও বাড়িতে থেকে দু'বেলা কাঁড়ি কাঁড়ি খায় আর হারামে চোলাই মদ গেলে তাদের মধ্যে একজন একটা আছে ভ্যান, লোকটাকে জানোয়ার বললে খুব বেশি বলা হবে না। মদ খেয়ে নেশার ঘোরে গাওয়ান ভ্যান-এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু করল। ভ্যান্ রেগে গিয়ে জোরে থাপ্পড় মারল ওর মুখে, তাতে গাওয়ান-এর মুখ কেটে রক্ত পড়তে লাগল। লী ভ্যান-এর হাত চেপে না ধরলে গাওয়ান যাকে নিয়ে এসেছিল সেই মেয়েটা তখন লীর পুরোনো ফৌজি বর্ষাতি কোটের ওপর জড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। মেয়েটার পরণের জামাকাপড় ভাঁজ করে বিছানায় রেখেছিলাম, ওরা গাওয়ানকে রক্তমাখা অবস্থায় এনে শুইয়ে দিল সেই জামকাপড়ের ওপর। আমি ওপর দিকে তাকিয়ে বললাম। "ঈশ্বর, তুমি কি জেগে আছো না কি তুমিও নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে বসে আছো?" ঈশ্বর জবাব দিলেন না বটে কিন্তু লী দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ওর নাকটা সাদা ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। মদ খেয়ে খুব নেশা হলে লী-র নাক এমনই ফ্যাকাশে সাদা দেখায়।

দরজায় তালা ছিল না, দলবেঁধে ট্রাকের দিকে চলে গেলে মেয়েটার জন্য কিছু করতে পারব আমি এটাই ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু লী ল্যাম্পটা নিয়ে আমাকেও ঘরের বাইরে যেতে বলল, তাই ওরা বারান্দায় ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো, আমি ছিলাম ভেতরে দরজার এপাশে। গাওয়ান তখনও নাম ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওব নাক ডাকার আওয়াজ আমি স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি। খানিক বাদের ওরা সবাই ফিবে এলো, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের কথা স্পষ্ট আমার কানে এলো।

আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, গাওয়ান তখনও নাক ডাকাচ্ছে, নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে কেমন গোঙানির মত আওযাজ বেরোচ্ছে ওর গলা থেকে। মেয়েটা তখনও জেগে, অন্ধকারে চোখ মেলে শুয়ে কান খাড়া করে ওদের কথা শুনছে। আমি ওর কাছে গিয়ে আবার ওখান থেকে চলে যেতে বললাম, বললাম, 'তোমার বিয়ে না হবার জন্য কি আমি দায়ী? তুমি এখানে আর এক মুহূর্ত থাকো তা কিন্তু আমি চাই না। শহরে ফিরে যবার জন্য তুমি আমায় গাড়ি জোগাড় করে দিতে বলছ ঠিকই, কিন্তু আমার কাছে সাহায্য চাইবার কি অধিকার আছে তোমার? তোমার মত বড়লোকদের কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য ছাড়াই আমি দিব্যি জীবন কাটাচ্ছি। আমি ''আপনি বিশ্বাস করুন।' বলতে বলতে রুবির গলা ধরে এলো। 'এমন কোনও কাজ নেই যা ওর জন্য আমি করি নি। ওর মুখ চেয়ে এত নিচে আমায় নামাতে হয়েছে, এত পাঁক গায়ে মাখতে হয়েছে যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। শুধু ওরই জন্য সবকিছু পেছনে রেখে আমায় একা এক কাপড়ে প্রিয়জনদের ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে। তারপরে কানে এল দরজা খোলার আওয়াজ, পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম কেউ ভেতরে ঢুকছে। কিছুক্ষণ কান খাড়া করেক থাকতে লোকটার নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ কানে এলো, আর তাতেই বুঝলাম ভেতরে ঢুকেছে লী নিজে। মেয়েটার কাছে গিয়ে লী ওর গায়ে জড়ানো বর্ষাতিটা চাইল। বর্ষাতিটা ভ্যান-এর। মেয়েটা উঠে বসতে লী বর্ষাতিটা ওর গা থেকে খুলে নিয়ে চলে গেল। ঐ বাড়িতে থাকতে থাকতে আমার এমন হয়ে গেছে যে শুধু লী নয়, যে ক'টা বদমাশ ওখানে থাকে শুধু নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনে আমি তাদের নাম বলে দিতে পারি। মজার ব্যাপার এদের সবকটাই দাগী আসামী, তাই চোলাই মদ তৈরীর দায়ে লী কখনও ধরা পড়লে তাকে জড়িয়ে আনা বা কোনও ভাবে তাকে সাহায্য করার ক্ষমতা এদের একটারও নেই। আর পপি, ও তো একটা বেশ্যার দালাল, পছন্দমতো মেয়েমানুষ পেলেই মেমফিসে রেবার বেশ্যা বাড়িতে পাচার করে দেয়। টমি সেদিন পপির পিছু নিয়েছিল খোলা দরজা দিয়ে পপির পেছন

পেছন এসে আমার দিকে তাকাল টমি, দেখলাম ওর দু'চোখ বেড়ালের চোখের মতো জ্বলছে। আমার গা ঘেঁষে বসে পড়ল টমি, আর গাওয়ানের খাটে উঠে পপিও তার পাশে দিব্যি শুয়ে পড়ল, খানিক বাদে তার নাকও ডাকতে লাগল। পপি কিন্তু বেশিক্ষণ ঘুমোল না, আছে জেনে ও গিয়ে হাজির হলো সেখানে, তুলোবীজের খোসার ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল, টমি পা টিপে টিপে ওর পেছন পেছন সেখানেও গিয়ে হাজির হলো। একসময় ওরা দু'জনেই খামারবাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল ট্রাকের কাছে, ততক্ষণ ওরা কি করে দেখার জন্য আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এরপরে আমি নিজে শুয়ে পড়লাম। হাত দিয়ে ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা আমায় বেদম মারতে লাগল, ওর মুখ চেপে ধরে বারবার বললাম, 'আরে আমি ওদের কেউ নই, আমি লী গুডউইনের বউ। কিন্তু আমার কথা ওর বিশ্বাস হলো না, দু'হাতে আমায় ইচ্ছেমতো কিল, চড়, থাপ্পড় মারতে লাগল।' এইটুকু বলে চুপ করলো রুবি।

'কিন্তু ঐ মেয়েটা,' হোরেস আবার বলল, 'ও কোনও ঝামেলা করে নি। পরদিন সকালে বাচ্চার দুধের বোতলের খোঁজে বাড়ির দিকে আসার সময় তুমি ওকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখেছিলে আর তাতেই বুঝেছিলে ওকে নিয়ে কোনও ঝামেলা হয় নি, ঠিক আছে। ও যে ঠিক আছে তার তুমি জানো।'

সে রাতে গাড়ি ভাড়া করে হেরেস এলো তার ছোটবোন নারসিসার শ্বশুরবাড়িতে। ড্রইংরুমে বোনের জেঠিশাশুড়ি মিস জেনি তাকে বসিয়ে বললেন, 'নারসিসা বাড়ি নেই, ওকে কোনও খবর দেবার আছে?'

'আমি নারসিসার সঙ্গে দেখা করতে চাই না,' গম্ভীর গলায় বলল হেরেস। 'একটা খবর আপনাকে দিচ্ছি—ভর্জিনিয়ার যে কলেজে পড়া ফুলবাবুর সঙ্গে ও ঘুরে বেড়াত, তার আচমকা উধাও হবার খবর আমি পেয়েছি। আপনাকে বলতে এসেছি ও ছেলে আর ভুলেও নারসিসার কাছে ফিরে আসবে না।'

'কে, তুমি গাওয়ানের কথা বলছ?' কৌতূহলী চোখে হেরেসের দিকে তাকালেন মিস জেনি।

'হ্যা, গাওয়ান, 'দাঁতে দাঁত পিষে বলল হোরেস, 'গাওয়ান স্টিভেনস।'

'ও নারসিসার কাছে আর ফিরে না এলে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।'

'কেন, কি হয়েছে? কি করেছে গাওয়ান?'

'একটা বাচ্চা মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তার স্কুল থেকে তুলে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল গাওয়ান,' হোরেস বলল, 'সারাদিন প্রচুর মদ খেয়ে

শহর থেকে অনেক দূরে এক চোলাই মদ তৈরীর আড্ডায় তাকে নিয়ে গিয়ে তোলে সেখানে একপাল দাগী বদমাশের মাঝখানে মেয়েটাকে একা রেখে নিজে ফিরে আসে শহরে। গাওয়ান হারমজাদাকে হাতের কাছে পেলে উচিত শিক্ষা দিতাম।'

'ওঃ' মিস জেনি বললেন, 'এই ব্যাপার? তুমি কি বলতে চাইছো তা গোড়ায় আমি বুঝতে পারি নি। তুমি যেদিন ওকে প্রথমবার এখানে দেখেছিলে সেদিনের কথা মনে পড়ে? তারপরে ও আর এখানে আসে নি। অক্সফোর্ডে ফিরে যাবার দোহাই পেড়ে সেরাতে ও এখানে খেলো না, মনে পড়ছে? গাওয়ান নারসিসাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। নারসিসা ওকে বলেছে ওর একটি সন্তান আছে, তাই যথেষ্ট, এর বেশি সন্তান ওর দরকার নেই।'

'আমার ছোট বোনটির মনে দয়ামায়া বলে কিছু নেই,' বলল হোরেস, 'ওকে কে কতটা ভালোবাসে তা নিয়ে ওর নিজের এতটুকু মাথাব্যথা নেই, বরং উল্টে সুযোগ মতো সে লোককে অপমান করলে তবে ওর মন ভরে। তাহলে ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে আমার বোন বিয়ে করতে রাজি নয় জেনে সেদিন রাগে গাওয়ানের মাথা গরম হয়ে ওঠে, অক্সফোর্ডে যাবার কথা বলে ও এখান থেকে চলে যায়; কারণ গাওয়ান জানত সেখানে এমন একটি মেয়ে আছে যাকে সে নিজের ইচ্ছে মতন চালাতে পারবে। অথচ বলা যায় যাকে দিয়ে সে নিজের খামখেয়াল চরিতার্থ করতে পারবে। দুঃখের বিষয় হলো, মেয়েটি ছিল খুবই কমবয়সী এক স্কুলের ছাত্রী।'

'তাহলে তুমি এখন কি করবে ভাবছো?' হোরেসের মুখের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলন মিস জেনি।

'ভাবছি এমন একটা আইন পাশ করাবো, যাব বলে পঞ্চাশ বছরের ছোট যে কাউকে মদ তৈরী করতে বা খেতে দেখলে অথবা মদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনলে হুঁশিয়ার না করেই গুলি করে হত্যা করা যাবে। আগে আইনের খসড়াটা তৈরী করি। তারপরে দেখব কতদূর কি করা যায়,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ল হোরেস। মিস জেনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে।

বাড়ি ফিরে লী গুডউইনের মামলা নিয়ে কিছুক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করল হোরেস, তারপর আলো না নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত তিনটেয় কাছেই আদালতের বড় ঘড়ির ঘন্টার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, বিছানা থেকে উঠে পোষাক পাল্টে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো হোরেস বেনবো। হাঁটতে

হাঁটতে সে যখন বাড়ির কাছের ষ্টেশনে এস পৌঁছালো তখন আকাশে ভোরের আলো সবে ফুটেছে। সাতসকালে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী পরিষ্কার জামাকাপড় পরে ট্রেন ধরতে এসে হাজির হয়েছে স্টেশনে। ট্রেন আসতে তাদের সঙ্গে একটা কামরায় উঠে পড়ল হোরেস। খুব সকাল হলেও হোরেস দেখল কামরায় যাত্রীর সংখ্যা কম নয়।

গদিমোড়া সিটে বসে ঝিমুতে ঝিমুতে একসময় অক্সফোর্ডে পৌঁছে গেল হোরেস। স্টেশনে নেমে ছেলেমেয়েদের পেছন পেছন হোরেস এসে পৌঁছালো কলেজের লাগোয়া স্কুল ভবনে যেখানে টেম্পল পড়ত। স্কুলের অফিস ততক্ষণে খুলে গেছে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কেরাণির কাছে এসে দাঁড়াল হোরেস, গলা নামিয়ে বলল, 'আমি এখানকার একজন ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তাকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'কোন ছাত্রী?' কেরাণিটি খাতার ওপর মাথা ঝুঁকে কিছু লিখছে, হোরেসের প্রশ্ন কানে যেতে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসল, ঝুলে পড়া চশমাটা নাকের ওপর ঠিক করে বসাতে বসাতে বলল, 'কি নাম তার?'

'নাম তার টেম্পল,' একটু থেমে বলল হোরেস 'টেম্পল ড্রেক।'

'টেম্পল, তাই বলুন!' কেরাণিটি মুখ টিপে হেসে বলল, 'প্রায় দু'হপ্তা আগে ও স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

'চলে গেছে!' যেন খুব অবাক হয়েছে এমনিভাবে লোকটির দিকে তাকাল হোরেস, হতাশা জড়ানো গলায় বলল, 'কোথায় গেছে আপনি জানেন?'

'আমি জানব কি করে?' বলেই চাপা গলায় কেরাণিটি বলল, 'টেম্পল, মানে ঐ মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে ওর বাবা তো বেসরকারী গোয়েন্দা লাগিয়েছেন, আপনি বুঝি ওঁদের কাছ থেকে আসছেন?'

'তা নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে, 'এটুকু বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এল হোরেস, কি মনে হতে সে পা চালিয়ে ঢুকে পড়ল স্কুল বাড়িতে, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে নির্দিষ্ট বাথরুমে ঢুকে চারদিকে তাকাতে দেখতে পেল দেয়ালের গায়ে পেনসিলের হরফে কাঁচা হাতে পেনসিলে লেখা আছে টেম্পল ড্রেক। টেম্পলকে তার সহপাঠীদের অনেকেই কামনা করত এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল হোরেস। এবারে কি করবে, কোন পথে এগোবে ঠিক করতে না পেরে সে চলে এল স্টেশনে, ট্রেন আসতেই চেপে বসল।

'আপনি জজ বেনবো নন?' বলতে বলতে একজন যাত্রী তার মুখোমুখি

বসল। মুখ তুলে তাকাতে হোরেস গোলগাল মাংসল মুখে এইটুকু বোঁচা নাক, সর্বত্র তাল তাল চর্বি জমায় লোকটির মুখখানা বীভৎস দেখাচ্ছে।

'আমি কি জজ বেনবোর সঙ্গে কথা বলছি?' করমর্দন করতে লোকটি নিজের ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমি সেনেটর স্নোপস, ক্লারেন্স স্নোপস।'

'ঠিকই ধরেছেন,' লোকটির বাড়িয়ে দেয়া হাতে হাত মিলিয়ে হোরেস বলল, 'আমার নাম হোরেস বেনবো ঠিকই; তবে জজ নই। আমি একজন সাধারণ উকিল ছাড়া কিছু নই।'

'অক্সফোর্ডে আপনাকে দেখেই চিনেছি,' চুরুট বের করে না ধরিয়ে দু'আঙ্গুলে নাড়তে নাড়তে বললেন সেনেটর স্নোপ্স, 'এখন না হলেও আগে আপনি আমারই নির্বাচনকেন্দ্রের বাসিন্দা ছিলেন। এখন অন্য জায়গায় থাকলেও আপনাকে আমি আমার পুরোনো বন্ধুদের একজন বলেই মনে করি যে আমি আপনার জন্য কিছু করতে পারি চাই না পারি। ইয়ে—আপনি তো কিন্সটনে বাড়ি করেছেন। তাই না?'

'ওখানকার সেনেটরদের সবার নাম আমি জানি না ঠিকই, তবু ওঁদের অনেকেই আমার মুখ চেনা। ওঁরা ভাল লোক, আর কাজের লোক। কাজেকর্মে ভবিষ্যতে কখনও জ্যাকসনে এলে দয়া করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আপনাকে সহায়তা করব। ইয়ে—আপনি এখন বুঝি জেফারসনে যাচ্ছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ', ঘাড় নেড়ে বলল হোরেস। 'পরে তাহলে আবার দেখা হবে কেমন?' বলতে বলতে না ধরানো চুরুট হাতে উঠে পড়লেন সেনেটর স্নোপ্স।

'চললেন কোথায়?' হোরেস বলল, 'এখানেই বসুন না, কথাবার্তা বলি আপনার সঙ্গে।'

'একটু স্মোক করে আসি,' বলে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে হোরেসের দিক তাকিয়ে স্নোপ্স বললেন। 'আমি স্মোকিং কামরার বাইরে আছি, আপনিও ওখানে চলে আসুন না!' বলে না ধরানো চুরুট হাতে থপথপ করতে করতে ভেস্টিবিউল ধরে ট্রেনের সামনের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি। সিটে বসে নিজের মনে কিছুক্ষণ ভাবল হোরেস, গ্রামগঞ্জ থেকে শহরে আসা কৃষিজীবী স্নোপ্স পরিবার রেস্তোরাঁ খুলে প্রচুর টাকাকড়ির মুখ দেখেছিল। সেই পরিবারেরই ছেলে ক্লারেন্স, রেস্তোরাঁর কাজকর্ম দেখাশোনা করার পাশাপাশি লেখাপড়া শিখে কি ভাবে বড় হয়ে উঠল। একদিন এল রাজনীতির আঙ্গিনায়, কি ভাবে ভোটে জিতে হয়ে উঠল সেনেটর স্নেপ্স, রম্যরচনার ধাঁচে

লেখা সেই কাহিনী অল্প কিছুদিন আগে স্থানীয় এক খবরের কাগজে পড়েছিল তা বিদ্যুৎচ্চমকের মতে হোরেসের মনে পড়ে গেল। মিনিট পাঁচেক বসে থেকে সে-ও উঠে দাঁড়াল সিট ছেড়ে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল স্মোকিং কামরার দিকে।

'স্মোকিং কামরার বাইরে সরু প্যাসেজে রেলিং ধরে সেনেটর স্নোপ্‌স যেন তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। হোরেস এসে দাড়াতেই বললেন, 'তারপরে, বলুন শুনি ব্যাপারখানা কি? খুব জটিল কোনও মামলার কাজে এদিকে আসা হয়েছিল। কেমন?'

'তা বলতে পারেন,' হেসে বলল হোরেস, 'টেম্পল ড্রেক নামে অক্সফোর্ড স্কুলের এক ছাত্রী আচমকা রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে, তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেই এসেছিলমা।

'ড্রেক? টেম্পল ড্রেক?' ছোট কুতকুতে চোখে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সেনেটর স্নোপ্‌স বললেন, 'অ, বুঝেছি কার কথা বলছেন! টেম্পল, ক'দিন আগে পালিয়েছে স্কুল থেকে।'

'পালিয়েছে?' হোরেস বলল, 'তা সে আবার বাড়িতে ফিরে এসেছে তো না কি? আর মেয়েটি হঠাৎ পালাতে গেলই বা কেন মশাই, স্কুলে পড়া পারে নি, তাই?'

'কে জানে মশাই কেন পালিয়েছে।' দূরের গাছপালার দিকে তাকিয়ে সেনেটর নিজের মনে বললেন, 'খবরে কাগজে যেটুকু লিখেছে তা পড়ে মনে হলো গাড়িওয়ালা কোনও ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়েছে। এখনকার মেয়েগুলোও তেমনই হয়েছে বটে গাড়িওয়ালা কোনও ছোঁড়ার ধারে-কাছে এলেই তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে, অনেকে শুনেছি স্কুল ছেড়ে বিয়ে করে ঘর-সংসারও পাতছে ওদের সঙ্গে।'

'তা মেয়েটা বাড়ি ফিরে এসেছে তো?' সেনেটরের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন হোরেস, 'বলছি, মেয়েটা মানে টেম্পল এখন জ্যাকসনেই আছে তো?'

'ও আর বাড়ি ফিরে নি।' বলতে বলতে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সেনেটর স্নোপ্‌স, 'না, ও জ্যাকসন বা তার ধারে কাছেও নেই।

মেয়েকে খুঁজে বের করতে ওর বাবা জজ তো অনেক গোয়েন্দা লাগিয়েছেন কিন্তু যতদূর শুনেছি তার এখনও পর্যন্ত কিছুই করতে পারে নি। বেচারা জজের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার শ্রাদ্ধ। তার আপনিও জজ ড্রেকের মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নাকি?'

'আপনার কাছে লুকোব না,' হোরেস চাপা গলায় বলল, 'এমন একটা মামলা আমার হাতে এসেছে যার সঙ্গে ঐ টেম্পল মেয়েটি অদ্ভুত ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, তাই আমিও ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।' হোলি স্প্রিংস স্টেশনের কাছাকাছি আসতে ট্রেনের গতি ঢিমিয়ে এল, 'এখানে মানে হোলি স্প্রিংস-এ এলে আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন,' বলতে বলতে আবার ট্রেনের ভেতরে ঢুকে পড়লেন সেনেটর ক্লারেন্স স্নোপ্‌স। পেছন পেছন এগোল হোরেসও। ট্রেন থামতেই প্ল্যাটফর্মের কুলিদের একজন ছুটে এলো, সেনেটরের মালপত্র কাঁধে ঝুলিয়ে সে নেমে পড়ল, স্নোপ্‌সের নজর এড়িয়ে হোরেস তার আগেই নেমে পড়েছে। স্টেশন মাস্টারের অফিস ঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে হোরেস দেখল টুপি মাথায় দুই যুবকের সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে কি যেন বলছেন স্নোপ্‌স। এরই মাঝখানে কুলির হাতে একটি চুরুট গুঁজে দেবার দৃশ্যও তার চোখ এড়ালো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে মেমফিসের ট্রেন এসে পৌঁছোল। সেনেটর স্নোপ্‌স যেই ট্রেনে চড়েই এগিয়ে গেলেন স্মোকিং কামরার দিকে, তাঁর নজর এড়িয়ে এবারে ট্রেনের একদম শেষ মাথার একটি কামরায় উঠে পড়ল হোরেস।

জেফারসনে নেমে স্টেশনের বাইরে আসতেই চেনা গলা হোরেসে কানে এল।

'আসুন স্যার, আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি!' মুখ তুলে তাকাতেই হোরেসই দেখল যে ট্যাক্সিতে চেপে সে বোনের শ্বশুরবাড়িতে যায় তার চালক মুখ বাড়িয়ে তাকে ডাকছে।

'ধন্যবাদ,' দরজা খুলে পেছনের সিটে বসেই বলল হোরেস, 'শোন, বাড়ি যাব না, এখুনি একবার হোটেলে চলো তো। বাচ্চাটা কেমন আছে একবার দেখে আসি।'

'হোটেলে যাবেন?' বলে চালক ঘাড় ফিরিয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'আপনি কি আজ শহরে বাইরে ছিলেন, স্যার?'

'হ্যাঁ,' তার গলার চাপা উদ্বেগ লক্ষ করে হোরেস বলে উঠল, ' কেন কি ব্যাপার বলো তো, কিছু হয়েছে নাকি?'

'আপনি যাদের দেখাশোনা করছেন সেই রুবি আর তার বাচ্চাকে হোটেলের মালিক তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'সে কি?' একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ল হোরেসের গলায়, 'একটা দিন আমি শহরের বাইরে গেছি আর সেই ফাঁকে এত কাণ্ড ঘটে গেছে! তা ওদের

খরচপত্তর তো সব আমিই দিচ্ছিলাম, তাহলে হোটেল মালিক ওদের তাড়িয়ে দিল কেন জানো?'

'হোটেল মালিকের কোনও দোষ নেই স্যার,' চালক বলল,

'খ্রিষ্টান শুদ্ধিকরণ সমিতিকে তো চেনেন স্যার! সমিতির সদস্য পাদ্রিদের সঙ্গে নিয়ে ঐ সমিতির নেত্রী মিসেস ওয়াকার আজ সকালে চড়াও হলেন ঐ হোটেলে। বাচ্চা সমেত আপনার মক্কেল রুবিকে তখনই তাড়িয়ে দিতে বল হোটেল মালিককে। মালিক গোড়ায় রাজি হন নি, ওদের অপেক্ষা করতে বলেছেন শুনে ওরা রেগে গিয়ে কাপ-ডিশ ভাঙ্গতে শুরু করল। তখন হোটেল মালিক ভয় পেয়ে রুবিকে ওর বাচ্চা সমেত তখনই হোটেল ছেড়ে চলে যেতে বলল। শুনেছি মিসেস ওয়াকার ওকে জেলখানায় ওর স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এর পরে আর কি ঘটেছে জানি না, স্যার।'

'বাঃ চমৎকার!' নিজের মনে বলে উঠল। হোরেস কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, 'আমায় এখুনি ঐ হোটেলে নিয়ে চলো।'

ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল হোটেলের সামনে, চালককে দাঁড়াতে বলে হোরেস দরজা খুলে নেমে তাড়াহুড়ো করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ম্যানেজার কাউন্টারেই ছিলেন, কোনও ভূমিকা না করে হোরেস তাঁকে বলল, 'রুবি নামে আমার যে মক্কেল তার বাচ্চা নিয়ে এখানে ছিল তার খরচপত্র তো সব আমিই দিচ্ছিলাম, ভবিষ্যতেও দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ত সত্ত্বেও আপনি কেন ওদের এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছেন জানতে পারি?'

'মিঃ হোরেস,' মুখ তুলে ম্যানেজার বললেন, 'আপনি শুধু উকিল নন, একজন শিক্ষিত যুবকও, যাকে প্রগিতিশীল চিন্তাভাবনার ধারক ও বাহক বলেও আমরা জানি। কিন্তু আমিও তো ব্যবসা করতে বসেছি, নাকি? তাছাড়া এই হোটেলে আমার নিজেরও কিছু মালিকানা অংশ আছে, তাই খরচ পেলেও কাকে এখানে রাখব আর কাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেব সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারও আমার নিশ্চয়ই আছে।'

ম্যানেজারের কথায় অন্যরকম সুরের আভাস পেয়ে হোরেস বলল, 'অধিকার একশোবার আছে, কিন্তু আমি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আপনার কি এমন এসে গেল?'

'মাফ করবেন, মিঃ হোরেস,' তার চোখের দিকে চেয়ে ম্যানেজার বললেন, 'যারা আপনার মক্কেল আর তার অসুস্থ বাচ্চাকে এখান থেকে তাড়ানোর জন্য আমার ওপর চাপ দিচ্ছিল। তারা কিন্তু সংগঠিত, আপনার আইনের যুক্তির চেয়ে তাদের ক্ষমতা বেশি ছাড়া কম নয়।'

গলা অল্প নামিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'বিশ্বাস করুন, আপনি ফিরে

আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা আমি তাদের বারবার বোঝাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওরা তা কিছুতেই বুঝতে চাইল না। উল্টে মাথা গরম করে আমার খাবার ঘরে ঢুকে টেবিল-চেয়ার সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। কাপ ডিশ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করতে লাগল। মিঃ হোরেস দয়া করে আমার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করুন—আমি একজন ব্যবসায়ী, শান্তিতে কারবার করতে চাই। কোনও অশান্তি চাই না। এসব ঘটনার পরে ওদের এখান থেকে চলে যেতে বলা ছাড়া সত্যি সত্যি আর কিছু করা কি আমার পক্ষে সম্ভব কি ছিল? যাই হোক, আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, ওদের খরচ বাবদ যে পয়সাকড়ি বাকি আছে সেটুকু দিয়ে যান।'

ম্যানেজারের হিসেব মতো বাকি টাকা মিটিয়ে হোরেস বাইরে এলো, ট্যাক্সিতে চেপে এবারে সে এলো জেলখানায়। ভেতরে ঢোকার পথে তাকে দেখে রোগাশুঁট্‌কো মেয়ে ওয়ার্ডেন ল্যাম্প হাতে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি মিস গুডইউনের খোঁজে এসেছেন?'

হ্যাঁ,' অবাক হয়ে হোরেস বলল, 'আপনি কি করে আমায় চিনলেন?'

'বাঃ, আপনি যে ওর উকিল তা তো আমি জানি,' ওয়ার্ডেন মেয়েটি বলল, 'আপনাকে তো আমি আগেও এখানে দেখেছি।'

'রুবি, ইয়ে মিস গুডউইন এখন কোথায়?'

'ও আর ওর বাচ্চা দু'জনেই ঘুমোচ্ছে,'

'ওদের একটু আশ্রয় দেবার জন্যে তোমায় অশেষ ধন্যবাদ,' মেয়ে ওয়ার্ডেনের দিকে তাকিয়ে বলল হোরেস, আর তখনই তার চোখে পড়ল মেয়েটির পরনে কোনও উর্দি নেই, স্কার্টের ওপরে ছেলেদের কোট গায়ে জড়িয়ে জড়োসড় ভঙ্গিতে কথা বলছে সে।

'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই, মেয়েটি বলল। 'একটা মেয়ে আর তার বাচ্চাকে শুয়ে দেবার মতো একটা বাড়তি খাট-বিছানা আমার হেফাজতে সবসময়েই থাকে, আপনি স্যার ওর সঙ্গে কথা বলতে হলে সকালের দিকে আসুন, এসে ওকে বোর্ডিং-এ নিয়ে গিয়ে মাথা গোঁজার মত আশ্রয় দিন। হাজার হলেও এটা জেলখানা। ওপরওয়ালার অনুমোদন ছাড়া কাউকে দু'এক দিনের বেশি এখানে রাখা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ধন্যবাদ,' বলে জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলো হোরেস।

বিকেল বেলা ছোটবোনের কাছে এল হোরেস, হোটেল থেকে রুবিকে তার অসুস্থ বাচ্চা সমেত কিভাবে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তার সবিস্তারে শোনালো, সব শেষে বলল, 'এবারে আমি ওদের আমার কাছে এনে রাখব।'

'তুমি যেখানে আছো সেটা কিন্তু আমারও বাড়ি, হোরেস।' নারসিসা বলল, 'কথাটা মনে রেখো। কাজেই আমার বাড়িতে তুমি ভুলেও যেন ওদের এনে তুলো না।' 'মেয়েমানুষ হয়ে তুমি এত নিষ্ঠুর আর নির্দয়ের মতো কথা কি করে বলছ তাই আমি ভেবে পাচ্ছি না, নারসিস এটা বুঝতে পারছো না যে একটু মাথা গোঁজার জায়গা না পেলে বেচারিকে বাচ্চা কোলে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে?'

'সেটা এমন কোনও কঠিন কাজ নয়, হোরেস,' কঠিন গলায় বলল নারসিসা, 'ওর মতো মেয়ের পক্ষে এভাবে জীবন কাটানোর সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়া খুব দরকার।'

পাইপে তামাক পুরে দু'ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরে ধরল হোরেস, দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ল আপন মনে। তারপরে বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোন নারসিসা, আজ যারা ওকে হোটেল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে খুব সম্ভবত আগামীকাল তারা ওকে বাচ্চা সমেত এই শহর ছেড়ে চলে যেতে বলবে। যার বাচ্চাকে ও দিনরাত বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছে। লী গুডউইন নামে সেই হতভাগ্য বিচারাধীন লেকাটির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়নি, এটাই রুবির একমাত্র অপরাধ। রুবির পায়ের ছোঁয়ায় এ শহরে পথঘাট অপবিত্র হচ্ছে, কাজেই ওকে এখান থেকে না তাড়ালেই নয়। এসব যারা করে বেড়াচ্ছে তারা ভুলে গেছে আমাদের মানবপুত্রও ছিল তার কুমারী মায়ের সন্তান, মেরির সঙ্গে জোসেফের বিয়ের আগেই তাঁর গর্ভে ত্রাণকর্তা যিশু জন্মেছিলেন। আমি জানতে চাই, রুবি যে কুমারী মা একথা ঐ খ্রিস্টান দাঙ্গাবাজদের কানে কে তুলল? এই জেফারসন শহরে তুমি আর আমি ছাড়া আর কারও পক্ষে তার জানার কথা নয়, তাহলে—' 'খবরটা তোমার মুখ থেকে আমি প্রথম শুনলাম, 'মিস জেনি বললেন, 'কিন্তু নাসসিসা, তুমিই বা কেন—'

'তোমার সক্কেলের কেলেংকারির খবর ওদের কানে যেই তুলে থাকুক না কেন,' একই রকম একগুঁয়ে জেদী গলায় নারসিসা বলল, 'আমার বাড়িতে ওর ঠাঁই হবে না। একথা আবার তোমায় সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, হোরেস।'

'বেশ,' হোরেস হালকা গলায় বলল, 'তাহলে সব এখানেই এককথায় মিটে গেল।'

'আজকের রাতটা এখানেই থাকবে তো?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল নারসিসা।

'হ্যাঁ, থাকব,' বলল হোরেস।

রাতের বেলা খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ আপন মনে পাইপ টানল হোরেস,

তারপরে আলো নিভিয়ে গায়ে একটা হালকা চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘন্টাখানেক চোখ বুঁজে চুপচাপ শুয়ে থাকার পরে সে টের পেল আলগোছে দরজা খুলে কেউ ভেতরে ঢুকেছে। চোখ মেলে তাকাতে ছোটবোন নারসিসার অবয়ব ফুটে উঠল চোখের সামনে। নারসিসা খাটের কাছে এসে দাঁড়াতে কনুইয়ে ভর দিয়ে বিছানায় উঠে বসল হোরেস।

'ব্যাপারটা আর কতদিন জিইয়ে রাখবে হোরেস?' চাপা গলায় বলল নারসিসা। 'চারদিকে যে ঢি ঢি পড়ে গেছে, সবাই যা তা বলছে তোমার নামে!'

'আগামীকাল সকাল পর্যন্ত জিইয়ে রাখব,' বলল হোরেস, 'কাল সকালেই আমি শহরে ফিরে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে আমার মুখ যাতে তোমায় আর কখনও দেখতে না হয় সেই চেষ্টাই করব।'

হোরেসের কথা শুনে যেন চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এমনই ভাবে তার খাটের পাশে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল নারসিসা। খানিক বাদে বলল, 'আমি কি বলতে চাইছি আশা করি তা বুঝতে পেরেছো। ছোটবোনের কথার মধ্যে ফুটে ওঠা একগুঁয়েমি হোরেসের কান এড়লো না।

'কথা দিচ্ছি ঐ মেয়েটিকে তোমার বাড়িতে এনে আর তুলব না। ' হোরেস বলল, 'সত্যিই তুলছি কিনা তার ওপর নজর রাখার দায়িত্ব তুমি স্বচ্ছন্দে ইসোমকে দিত পার। ও বাগানে ক্যানা ফুলের বেড-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার ওপর নজর রাখবে। এরপরে তোমার বাড়িতে আমি থাকলে তুমি আশা করি আপত্তি করবে না?' বলে হোরেস বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

'বাড়িটা একা আমার নয়,' হোরেস, একইরকম একগুঁয়ে গলায় বলল নারসিসা, 'ওতে তোমারও সমান অংশ আছে। ও বাড়িতে তুমি, আমি দু'জনেই জন্মেছি, ভবিষ্যতে ওখানেই আমায় কাটাতে হবে। তুমি কি করছ, কোথায় যাচ্ছো, ক'টা মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছ, তারা কে কেমন, এসব জানার এতটুকু আগ্রহ আমার নেই। কিন্তু যে মেয়েটিকে নিয়ে এত দুর্গাম রটেছে তার সঙ্গে আমি কখনোই আমার ভাইকে মাখামাখি করতে দেব না। এক কাজ করো, হোরেস, ঐ মেয়েটির জন্য যখন তোমার এত দরদ তখন এখানে না রেখে ওকে বরং মেমফিসে নিয়ে যাও, অমন এক নষ্ট মেয়ের মাথা গোঁজার মত হাজারও নরক ওখানে আছে। এখানকার লোকে কি বলছে জানো? সবাই বলছে ঐ মেয়েটির লোভেই তুমি ওর স্বামীর জামিনের ব্যবস্থা করতে রাজি হও নি।'

'তুমি নিজেও কি তাই ভাবো?'

'আমার নিজের নয়, নারসিসা বলল, 'শহরের লোকে যা বলাবলি করছে তাই তোমায় বললাম, ঘটনাটা সত্যি বা মিথ্যে যাই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। আমি যা জানি তা হলো তোমার স্বার্থরক্ষা করতে তুমি পাঁচজনের কাছে রোজই একটা না একটা মিথ্যে বলতে আমায় বাধ্য করছ। আমার কথা রাখো, হোরেস। এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও। এটা যে একটা ঠাণ্ডা মাথায় খুনের ঘটনা তুমি ছাড়া সবাই তা বিশ্বাস করবে।'

'বাঃ, চমৎকার,' বলল হোরেস, 'আর ঐ দাঙ্গাবাজরা আর কি কি বলছে একটু শুনি—ঐ মেয়েটিকে পাবার লোভে, খুনটা আমিই করেছি একথা বলছে না?'

'খুনটা যেই করে থাক না কেন তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই,' হোরেস, নারসিসা বলল।

'প্রশ্ন একটাই তুমি এই ব্যাপারটায় জড়িয়ে পড়ছ কি না? বিশেষতঃ তুমি রোজ রাতের বেলা ঐ মেয়েটিকে পাশে নিয়ে আমার বাড়িতে শুচ্ছ এই সহজ ব্যাপারটা যখন সবাই বিশ্বাস করছে!' নিবিড় আঁধারে নারসিসার কথাগুলো যেন অদৃশ্য কোনও ধারালো অস্তিত্ব নিয়ে তীব্রভাবে বিঁধতে লাগল হোরেসকে, খোলা জানালার বাইরে থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ভেসে আসা একঘেঁয়ে ডাক যেন সেই যাতনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল।

'তুমি কি নিজে এসব বিশ্বাস করো?' জানতে চাইল হোরেস।

'বারবার তো বলছি, আমি বিশ্বাস করি বা না করি তাতে কিছু যায় আসে না,' নারসিসা বলল, 'আবার বলছি যত শিগগির পারো, এখান থেকে চলে যাও।'

'ওকে এইভাবে একা অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে?'

'অসহায় অবস্থায় হতে যাবে কেন,' কঠিন গলায় বলল নারসিসা, 'ঐ লী গুডউইন লোকটা এত কাণ্ডের পরেও যদি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ বলে দাবি করে তাহলে তোমার চেয়ে ভাল কোনও ফৌজদারি উকিল ওর জন্য বহাল করো, এজন্য যা খরচ লাগবে সব আমি দেব। মেয়েটা এসব কিছু জানতেও পারবে না। মেয়েটা যে তোমায় দিয়ে ওর ঐ লোকটাকে জেল থেকে খালাস করে আনতে চাইছে তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? কোথাও না কোথাও যে ঐ মেয়েটি প্রচুর টাকা লুকিয়ে রেখেছে তাও তুমি টের পাওনি? কাল সকালে শহরে ফিরে যাবে বলছিলে না, হোরেস?' ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে নারসিমা আবার বলল, 'ব্রেকফাস্ট না খেয়ে তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি।'

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বোনের শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে হোরেস দেখা কবল সেনেটর ক্লারেনস-এর সঙ্গে, রুবি আর তার বাচ্চার মাথা গোঁজার মত একটা জায়গা খুঁজে বের করে দেবার জন্য অনুরোধ করল। সেনেটর ক্লারেনস-এর নির্দেশে হোরেস এক শ্বেতাঙ্গ মহিলার কাছে পাঠালেন। মহিলা আধপাগলা গোছের, নানারকম কবচ তাবিজ তৈরি করেন, তাঁর খদ্দেররা বেশির ভাগই নিগ্রো শ্রমিক। তাঁর জীর্ণ বাড়ির পেছনের অংশে রুবি আর তার বাচ্চাকে আশ্রয় দিতে রাজি হলেন, এই ব্যবস্থা হবার পরে হোরেস জেলখানায় গিয়ে রুবি আর তার বাচ্চাকে নতুন জায়গায় নিয়ে এলো।

'আর তোমার কোনও ভয় নেই।' রুবিকে আশ্বাস দিয়ে বলল হোরেস, 'যতদিন না ওদিকেব ঝামেলা মিটছে ততদিন ছেলেকে নিয়ে তুমি এখানেই থাকবে। আমার টেলিফোন লাইন কাটা গিয়েছিল, ক'দিনের মধ্যেই ওটা আবার ফিরে পাচ্ছি, তখন আমার নম্বরটা তোমায় জানিয়ে দিয়ে যাব। টেলিফোন নম্বর পেলে তোমার সুবিধাই হবে, কখনও অসুবিধে হলে টেলিফোনে আমায় জানাবে।'

'সেটাই ভাল হবে, সায় দিয়ে রুবি বলল,

'আপনাকে তো এখানে থাকতে হবে?' রুবি বলল, 'কাজেই আমার কাছে আপনার রোজ রোজ আসা ভাল দেখায় না। অনেকে এ নিয়ে অনেক কিছু বলতে পারে।'

'তুমি আমায় চেনো না রুবি,' হোরেস বলল, 'কে আমার নামে কি বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না, এসব নিয়ে আমি মোটেও মাথা ঘামাই না। দরকার মনে করলে আমি তোমার কাছে আসব বই কি।' রুবি এর পরে কিছু বলতে না পেরে চুপ করে রইল। তার কাছে বিদায় নিয়ে হোরেস আবার এল সেনেটর স্নোপ্‌সের কাছে। রুবি আর তার ছেলের মাথা গোঁজার একটা সাময়িক ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাল তাঁকে।

'আপনাকে দেবার মতো একটা খবর আছে,' সেনেটর স্নোপ্‌স বললেন, 'টেম্পলের খবর পেয়েছি।

'পেয়েছেন?' উৎকণ্ঠিত গলায় বলল হোরেস, 'কোথায় আছে টেম্পল?'

'খবরটা আপনাকে দিতে আমার নিজেরই সংকোচ হচ্ছে,' সেনেটর স্নোপ্‌স আমতা আমতা করে বললেন, ' মেমফিসে রেবা নামে এক বেশ্যার বাড়িতে টেম্পল আছে খবর পেয়েছি।'

' বেশ্যার বাড়ি! হা ঈশ্বর!' আক্ষেপের গলায় বলল হোরেস, 'আমি

ঠিক এমনই কিছু আশংকা করেছিলাম!'

সেনেটর স্নোপ্সকে সঙ্গে নিয়ে রেবার বাড়িতে এল হোরেস, রেবার সঙ্গে দেখা করে খোলাখুলিভাবে সব জানাল, এও জানাল যে লী গুডউইনের মামলা শুরু হলে সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য আদালতে তার ডাক পড়বে। হোরেসকে নিয়ে রেবা এল টেম্পলের কাছে, টেম্পল তখন শুয়ে আছে, সব শোনার পরেও সে এমন হাভভাব করতে লাগল যেন এ ব্যাপারে তার কোনও কৌতূহল নেই।

'তুমি আদালতে যা বলবে তার ওপর লী গুডউইনের মত এক নিরপরাধ লোকের জীবন নির্ভর করছে, নয়ত তার ফাঁসি হয়ে যেতে পারে।'

কিন্তু রেবার একথা শুনেও টেম্পল একইরকম শুয়ে রইল।

'লীর বউ রুবির কথাটা একবার ভেবে দ্যাখো,' রেবা টেম্পলকে আরও বোঝানোর চেষ্টা করল, 'তোমার হাতে তো হিরের আংটি আছে, গলায় আছে হিরে বসানো হার, কানে হিরের দুলও পরেছ। বেচারীর কথাটা একবার ভেবে দ্যাখো তো, অসুস্থ বাচ্চাটা ছাড়া আর কিছুই ওর নেই। রুবি যে কি ভীষণ গরীব তার তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছো।

বিনা দোষে ওর স্বামী লী গুডউইনের ফাঁসি হয়ে গেলে ওর অবস্থা কি দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছো? বেচারি ওর কচি বাচ্চাকে নিয়ে যাবে কোথায়। খাবে কি?'

এবারেও টেম্পল আগের মতই চুপ করে রইল।

'তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছো, সোনা,' টেম্পল এবারে হাসল। আসল জায়গায় ঘা মারল, 'খুন আসলে যে করেছে তোমার নাগর সেই পাপিকে এঁরা বিপদে ফেলবেন না। আদালতে পপির প্রসঙ্গ উঠলে তুমি সাফ বলবে তার নাম আগে কখনও শোন নি, তাকে কখনও দোখোনি। কথা দিচ্ছি আমি পপিকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখব যে পুলিশের বাবাও ওর হদিশ পাবে না। এবারে হলো তো?'

রেবার আশ্বাসে কাজ হলো, টেম্পল বিছানায় উঠে বসল, কিছুক্ষণ অবাক চোখে হোরেসের দিকে তাকিয়ে থেকে রেবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমায় একটু মদ দাও না।'

'শুয়ে থাকো নয়তো ঠাণ্ডা লাগবে,' টেম্পলকে আগের মতো ঠেলে শুইয়ে দিয়ে রেবা বলল, 'ভাল করে কম্বল চাপা দিয়ে থাকো নয়তো ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমি খানিকবাদে তোমায় মদ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'এতক্ষণ তো তোমার কথা শুনলাম,' রেবার উদ্দেশে টেম্পল আড়মোড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বলল, 'আমায় একটু একা থাকতে দাও।' রেবা এগিয়ে এসে টেম্পলের কাঁধ পর্যন্ত কম্বল চাপা দিলো।

'আপনার কাছে সিগারেট আছে?' হোরেসের দিকে তাকিয়ে বলল টেম্পল, 'আমায় একটা দিন না।'

'সিগারেট উনি দেবেন তোমায়,' টেম্পলকে বলল রেবা, 'তার আগে বলো উনি যা বলেছেন আদালতে দাঁড়িয়ে সেকথা তুমি বলবে তো?'

'কোন কথা?' বলে হোরেসের মুখের দিকে ফাঁকা একগুঁয়ে চাউনি মেলে তাকাল টেম্পল।

'ঐ তো,' হোরেস বলল, 'তোমার নাগর এখন কোথায় আছে এসব কথা আদালতে বলার দরকার নেই।'

'আপনি কি ভেবেছেন ও কোথায় আছে একথা বলতে আমি ভয় পাই?' টেম্পল বলল, 'পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে আমি গলা ফাটিয়ে আমি সবাইকে বলব ও কোথায় লুকিয়ে আছে, একবারও ভেবো না আমি ভয় পেয়েছি। ওর কথা আমি সবখানে গিয়ে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলবো, হ্যাঁ, আমি কাউকে ডরাই না। আমায় একটু মদ দাও না গো,' রেবার দিকে সে আবার হাত বাড়ালো।

'উনি যা জানতে চান,' হোরেসকে ইশারায় দেখিয়ে বলল রেবা, 'তুমি তার ঠিকঠাক জবাব দাও, আমি তোমার মদ একটু বাদেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কাঁধ পর্যন্ত কম্বলে মুড়ে বিছানায় উঠে বসল টেম্পল, হোরেসের প্রশ্নের জবাবে গাওয়ানের সঙ্গে লীর গুডউইনের বাড়িতে কাটানো প্রত্যেকটা দিন আর রাতের অভিজ্ঞতার বিবরণ খুলে বলতে লাগল। প্রশ্ন করতে গিয়ে হোরেস বারবার গোটা প্রসঙ্গটা টমির হত্যাকাণ্ড আর তার আততায়ীর দিকে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু তা বুঝতে পেরে টেম্পল আগে থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে গেল। টমির হত্যাকাণ্ড এড়িয়ে সে কৌশলে গোটা প্রসঙ্গটাকে সেই জায়গায় আটকে রাখল যেখানে লীর বাড়িতে সে বিছানায় বসে আছে আর বাড়ির বারন্দায় ভ্যান্ আর তার বন্ধুরা তাকে উপভোগ করার যে মতলব আঁটছে সেসব শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে।

লীর মামলা শুরু হলে সে সাক্ষির কাঠগড়ায় দাঁড়াবে টেম্পলের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে সেনেটর স্নোপ্‌সকে সঙ্গে নিয়ে হোরেস চলে আসার মুহূর্তে রেবা তাঁকে বলল, 'আপনার কাছে মিনতি করছি মেয়েটাকে আমার ঘাড় থেকে নামান। ওকে ওর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যান

আর দেখুন এখানে যাতে ওকে আর কখনও ফিরে আসতে না হয়।'

জুন মাসের মাঝামাঝি টমির খুনের মামলা শুরু হলো, শেরিফ লী গুডউইনকে জেল থেকে বের করে এনে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। বেকসুর খালাস পাবার সম্ভাবনা সম্পর্কে আগে থেকেই গুডউইনকে আশ্বস্ত করেছে হোরেস। আদালতের সমন পেয়ে টেম্পলও যথা সময় এসে হাজির হলো আদালতে, সময় হলে বেলিফ তার নাম ধরে হেঁকে উঠল, 'টেম্পল ড্রেক! টেম্পল ড্রেক কোথায়?'

'এই যে,' টেম্পল বলে উঠল, 'আমি এখানে!' বেলিপের নির্দেশে টেম্পল সাক্ষির কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালো।

'তোমার নাম কি?' তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণি অর্থাৎ সরকারি উকিল।

'টেম্পল ড্রেক।'

'বয়স?'

'আঠারো।'

'বাড়ি কোথায়?'

'মেমফিসে।'

চাপাগলায় বললেও সবাই তা স্পষ্ট শুনতে পেল।

'একটু জোরে বলো,' বললেন সরকারি উকিল, 'এঁরা তোমার কোনও ক্ষতি করবেন না, বরং যে অন্যায় অত্যাচার তোমায় অকারণে সহ্য করতে হয়েছে তার প্রতিবিধান করতেই এঁরা এখানে এসেছেন।

আচ্ছা, বলো তো মেমফিসের আগে তুমি থাকতে কোথায়?'

'জ্যাকসনে।'

'সেখানে কে থাকেন?'

'আমার বাবা থাকেন।'

'তোমার মা কি বেঁচে আছেন?'

'না।'

'তুমি তোমার বাবার একমাত্র সন্তান?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা,' সরকারি উকিল বললেন,

'এ বছরের ১২ই মে তারিখে তুমি কোথায় ছিলে বলতে পারো?'

টেম্পলের ঠোঁট দুটো শুধু অসহায় ভাবে নড়ল, কোনও উত্তর দিতে পারালো না সে।

'তুমি যে ওখানে ছিলে তা তোমার বাবা জানতেন?'

'না,'

'তুমি সে সময় কোথায় ছিলে বলে উনি জানতেন?'

'উনি জানতেন আমি ঐ সময় স্কুলে আছি।'

'কিন্তু আসলে তুমি তো ঐ সময় স্কুল থেকে পালিয়ে অন্য এক জায়গায় লুকিয়ে ছিলে, কারণ তোমার জীবনে এক সাংঘাতিক ঘটনা তখন ঘটেছে যে তুমি ফিরে যাবার সাহসটুকুও হারিয়ে—'

'ইওর অনার!' আসামী পক্ষের উকিল হোরেস বেনবো রুখে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার বন্ধু মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্ণির এই প্রশ্নের আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। এভাবে সাক্ষির মুখে উনি আগে থেকে তৈরী করা বুলি কখনোই বসাতে পারেন না!'

'প্রতিবাদ বহাল!' জজ সরকারি উকিলকে ধমকের গলায় বললেন, 'এভাবে প্রশ্ন আপনি করতে পারেন না, তাতে উনি বিশেষ কোন ও কারণে আপত্তি করছেন!'

'বেশ,' সরকারি উকিল থমকে গিয়ে বললেন, 'প্রশ্নটা আমি একটু ঘুরিয়ে করছি, আচ্ছা টেম্পল, এ মাসের ১২ই মে তারিখে তুমি কোথায় ছিলে বলতে পারো?'

'লী গুডউইনের চোলাই মদ যেখানে তৈরি হয়,' স্বাভাবিক গলায় টেম্পল বলল, 'সবাই যাকে বলে ডাবা, আমি সেখানে ছিলাম।'

আদালতের ভেতরে সীমাহীন স্তব্ধতা মেঝেতে সূঁচ পড়লে সেই আওয়াজও হয়তো শোনা যাবে।

'বেশ,' আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লী গুডউইনকে ইশারায় দেখিয়ে সরকারি উকিল বললেন,' এবারে দ্যাখো তো একে আগে দেখেছো কি না।'

'দেখেছি,' জবাব দিল টেম্পল।

'কোথায় দেখেছো?'

'আমি যেখানে ছিলাম সেই ডাবায় দেখেছি।'

'তুমি ওখানে—ঐ ডাবায় কি করছিলে?'

'আমি লুকিয়ে ছিলাম।'

'কার ভয়ে তুমি ওখানে লুকিয়েছিলে?'

'ঐ লোকটার ভয়ে,' ইশারায় লীকে দেখিয়ে বলল টেম্পল।

'ভালো করে দেখে বলছ তো?

হ্যাঁ, 'টেম্পল বলল।' ভাল করে দেখেই বলছি।'

'কিন্তু ঐ লোকটা তোমায় ঠিক খুঁজে পেয়েছিল, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা ঐ লোকটা ছাড়া ওখানে আর কে কে ছিল মনে পড়ে?'

'টমি ছিল, ও বলল—'

'টমি কি ডাবার ভেতরে ছিল। না বাইরে ছিল?'

'টমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমায় পাহারা দিচ্ছিল, ও বলল কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না।'

'এক মিনিট,' সরকারি উকিল বললেন, 'কাউকে ভেতরে ঢুকতে না দিতে তুমি কি ওকে মান করেছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'টমি বাইরে থেকে দরজা এঁটে দিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তা সত্ত্বেও ঐ লেকাটা মানে লী গুডউইন ভেতরে ঢুকল, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওর হাতে তখন কিছু ছিল?'

'ছিল,' একটু থেমে টেম্পল বলল।

'ওর হাতের মুঠোয় পিস্তল ছিল।'

'টমি কি ওকে থামানোর চেষ্টা করেছিল?'

'করেছিল, কিন্তু পারে নি।'

'তখন ঐ লোকটা কি করল?'

'পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে ঐ লোকটা তখন টমিকে খুন করল।'

'ইওর অনার একে আমার আর কোনও প্রশ্ন করার নেই, বলে সরকারি উকিল সরে দাঁড়ালেন।

'মিঃ বেনবো,' আসামি পক্ষের উকিলের দিকে তাকিয়ে জজ বললেন, 'আপনি সাক্ষিকে কোনও প্রশ্ন করতে চান?'

'না, ইওর অনার,' হোরেস বলল, 'একে আমার আর কোনও প্রশ্ন করার নেই।'

'ইওর অনার আর মাননীয় জুরিবৃন্দ,' সরকারি উকিল টেম্পলকে ইশারায় দেখিয়ে বললেন, 'খুনের ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষি টেম্পল ড্রেক এইমাত্র যা বলল তা আপনারা আশা করি শুনেছেন। আমার আর কোনও সাক্ষি নেই। আসামী লী গুডউইন দোষী না নির্দোষ তার এবার আপনারাই বিচার করুন।'

ঠিক তখনই এক প্রৌঢ় বাইরে থেকে আদালতে ঢুকলেন, পায়ে পায়ে তিনি এগিয়ে এলেন বিচারকের আসনের দিকে।

'সাক্ষি টেম্পল ড্রেক।' জজ বললেন, 'তোমায় আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, তুমি এবারে যেতে পারো।'

সাক্ষির কাঠগড়ায় থেকে নেমে দাঁড়লো টেম্পল, যে প্রৌঢ় লোকটি বিচারকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর দিকে চোখ পড়তেই স্থান কাল সব ভুলে গিয়ে বাবা! বাবা' বলে দৌড়ে এল, প্রৌঢ় লোকটি টেম্পলকে দেখতে পেয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপরে ঘাড় হেঁট করে বিচারককে অভিবাদন জানিয়ে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

হোরেসের মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে উঠেছে, চারপাশের সবকিছুই বিযাক্ত ঠেকছে তার কাছে। বিচারের রায় কি হবে সে জানে। লী গুডউইনকে বাঁচানোর শেষ রাস্তাটুকুও যে প্রতিপক্ষ এভাবে আগে থেকে পরিকল্পনা করে বন্ধ করে দেবে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। আদালতের ভেতর এককোণে দর্শকদের মাঝখানে রুবি তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছে, তার জীবনসঙ্গির ফাঁসি যে আসন্ন বেচারি বোধহয় এখনও তার বুঝতে পারে নি। রুবির দিকে একবার করুণার চাউনি হেনে হোরেস টলতে টলতে আদালতের বাইরে বেরিয়ে এলো।

যে খ্রিস্টান সংরক্ষণপন্থীরা একদিন রুবিকে হোটেল থেকে বের করে দিয়েছিল গুডউইনের ফাঁসি উপলক্ষে তারা জেলের বাইরে দাঁড়িয়ে ঢাক ঢোল শিঙ্গে বাজিয়ে বিজয়োৎসব উদযাপন করল। তারপর হাতে কাছে যা পেল তাতেই আগুন ধরিয়ে দিল। দেখতে দেখতে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। শহর ছেড়ে চলে যাবে বলে স্টেশনের কাছে হতাশমনে এসে দাঁড়িয়েছিল হোরেস আচমকা আগুনের মাতামাতি দেখে সে চমকে উঠল। আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। তার হাত থেকে বাঁচতে যেতে পা চালিয়ে হোরেস অন্যদিকে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই খ্রিস্টান সংরক্ষণপন্থীরা চেপে ধরে পেটাতে লাগল তাকে। মার খেতে খেতে হোরেসের কানে এলো কতগুলো কথা :

'এই বানচোত্ই ঐ গুডউইন হতভাগার উকিল হয়েছিল। ওকে বাঁচিয়ে বেকসুর খালাস করতে চেয়েছিল।'

'এক আপদকে খতম করেছি!'

আরেকজন বলল, 'এবারে এটাকেও করতে বাকি রাখি কেন? দে উল্লুকটাকে আগুনে ঢুকিয়ে! হ্যাঁ, তার আগে ওর জামাকাপড় সব খুলে নে! পকেট হাতড়ে দ্যাখ্ কিছু আছে কি না। যা কিছু আছে সব বের করে নে! শয়তানটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছি। তার উকিলকে আগুনে পুড়িয়ে মারার মতো প্রচুর কাঠ আছে এখানে!'

হোরেসের তখন কথা বলার ক্ষমতা নেই। চারপাশ আগুনের উত্তাপের মধ্যে মার খেতে খেতে সে জ্ঞান হারালো।

টেম্পল তার বাবার কাছে ফিরে যাবর অল্প কিছুদিন পরে এক পুলিশ কর্মিকে খুন করে ধরা পড়ল পপি। সংক্ষেপে বিচার পর্ব সেরে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হলো।

দাঙ্গাবাজরা শেষ পর্যন্ত হোরেসকে পুড়িয়ে মারে নি। জ্ঞান ফিরে পাবার পরে শহর ছেড়ে সে স্থায়ীভাবে চলে এলো কিন্সটনে তার নিজের বাড়িতে বউ-এর কাছে।

আঁদ্রে জিদ

১৯৪৭-এ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ফরাসী লেখক আঁদ্রে জিদ। ১৯৪৬-এ লেখা 'থিসিয়স' গল্পে গ্রীক উপকথার রাজা থিসিয়স, গোলক-ধাঁধাঁর রহস্যময় পথগুলোও যার গতি রুদ্ধ করতে পারে না, রূপক অর্থে আঁদ্রে জিদ নিজেই। কারণ জীবনে, শিল্পভাবনা ও রচনাশৈলীর ব্যাপারে মসিয়ঁ জিদ কখনও এক জায়গায় দীর্ঘদিন বাঁধা থাকেননি। মসিয়ঁ জিদকে কোথায় পাওয়া যাবে, তাঁর জীবৎকালে কেউ সহজে বলতে পারতোনা। এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফ্রাসোয়া মরিয়্যাফ বলেছিলেন, মৃত্যুর পর জিদ কোথায় গেছেন, সেই প্রশ্নের জবাব জিদই দেবেন, পরপার থেকে চিঠি দেয়ে। চিঠিতে লেখা থাকবে— 'নরকের অস্তিত্ব নেই। ইতি—আঁদ্রে জিদ।'

থিসিয়স

এক

আমি প্রাচীন গ্রীক রূপকথার রাজা থিসিয়স্। ইচ্ছে ছিল, আমার এই আত্মকাহিনী আমার একমাত্র ছেলে হিপ্পোলিটাসকে বলে যাবো। যেন সে এইসব ঘটনা থেকে কিছু শিখতে পারে। কিন্তু আমার ছেলে আজ পৃথিবীতে নেই এবং তবুও এইসব কথা আমি বলছি। ছেলেকে বলতে হলে ব্যক্তিগত প্রেম ভালবাসার কিছু ব্যাপার বাদ দিয়েই বলতে হতো। কারণ এসব ব্যাপারে ওর খুব সঙ্কোচ ছিল এবং আমার প্রেমকাহিনীগুলো ওকে শোনাতে আমার সাহস হতনা। তাছাড়া, আমার জীবনের প্রথম দিকেই শুধু এসব ব্যাপারের গুরুত্ব ছিল। পেম আমাকে নিজেকে চিনতে শিখিয়েছে। ঠিক যেমন হিংস্র পশুকে আমি হত্যা করেছি, যেসব দানবকে আমি যুদ্ধে হারিয়েছি, তারা আমায় নিজেকে চিনতে ও জানতে সাহায্য করেছে।

তাই আমি হিপ্পোলিটাসকে প্রায়ই বলতাম ঃ 'প্রথমে সঠিক ভাবে জানা দরকার, তুমি কে? তারপর আসে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। আমি চাই বা না চাই, আমি ছিলাম রাজপুত্র। তুমি চাও বা না চাও, তুমি যুবরাজ। এ ব্যাপারে তোমার বা আমার কিছু করার নেই। কারণ, এটা ঘটনা। এবং ঘটনা বা বাস্তব তোমার অস্তিত্বকে বন্দী করে রাখে।' কিন্তু হিপ্পোলিটাস কখনও আমার কথা শুনতো না। ওর বয়সে আমি অতোটা না হলেও, অনেকটা ওরই মতো অন্যমনস্ক ছিলাম। এবং তার ফলে ওর মতো আমারও কোন ক্ষতি হয়নি। শৈশবের সেই নিষ্পাপ দিনগুলো কী যে সুখের দিন। যখন শরীর ও মন বিনা যত্নে বেড়ে ওঠে। আমি তখন ছিলাম বাতাসের মত স্বচ্ছন্দ, সমুদ্র তরঙ্গের মত চঞ্চল। আমি উদ্ভিদের মত বড় হয়েছি। আমি পাখীর ডানা মেলে হাওয়ায় ভেসেছি। আমার অস্তিত্বের কোন সীমানা ছিল না এমন কি বাইরের দুনিয়ার সংস্পর্শ আমার মনে শুধু নতুন ভোগস্পৃহা জাগাতো, কখনো মনে হতো না যে আমি নিজস্ব কোন গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা আছি। রসাল ফলের গায়ে হাত বোলাতে ভাল লাগতো, ভালো লাগতো ছোট্ট গাছের নরম শরীরে হাত বোলাতে, সমুদ্রতীরের মসৃণ পাথরগুলো ছুঁতে কিম্বা কুকুর ও ঘোড়ার লোমঢাকা শরীরে হাত দিতে। তখনো আমি রমণীর শরীরে হাত রাখতে শিখিনি। প্যান, জিউস বা থেটিস নামের গ্রীক দেবতারা যে সব সুন্দর জিনিস আমাকে দেবেন, ক্রমশঃ আমি তাদের দিকে হাত বাড়ালাম।

একদিন আমার বাবা আমাকে বললেন, এভাবে জীবন কাটানো আর

আমার মানায় না। আমি বললাম, 'কেন? বাবা বললো, সে কি কথা? আমি তার ছেলে, রাজার ছেলে, আমাকে সিংহাসনে বসার আগে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।

আমি তখন ছিলাম সুখে। ঠাণ্ডা সবুজ বুকে নগ্ন আমার শরীর। নাকি আমি রোদঝলসানো সমুদ্রবেলায় শুয়েছিলাম?

কিন্তু না, বাবাকে দোষ দেওয়া যায় না। বাবা আমাকে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শিখিয়েছিল এবং সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত, আমি যা কিছু করেছি, যা কিছু হয়েছি, তা নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলেই সম্ভব হয়েছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেঁচে থাকা সুখের হলেও সেদিন থেকে আমি জীবনের ধারা বদলেছিলাম। কেননা চেষ্টা ছাড়া মহৎ কিছু, মূল্যবান কিছু এবং স্থায়ী কিছু করা যায় না।

প্রথম প্রচেষ্টায় বাবাই উৎসাহ দিয়েছিলো। বাবা বলেছিলো, দেবতা পসিডনের উপহার দেওয়া কিছু অস্ত্র সমুদ্রতীরের ওই পাথরগুলোর তলায় নাকি লুকোনো আছে।

মানুষ কি করতে পারে, মানুষ কি হতে পারে। তুমি তোমার মনুষ্যত্বের যোগ্য হও'।

দুই

আমার বাবা ঈজিয়স সবদিক থেকে ভালোমানুষ ছিলেন। অবশ্য আমার ধারণা, আমি নামেই ওর সন্তান। সবাই আমাকে বলেছে, আমি নাকি মহান্ দেবতা পসিডনের ঔরসজাত। হয়তো আমার নিয়ত পরিবর্তনশীল মেজাজ আমি পসিডনের কাছ থেকেই পেয়েছি। অন্ততঃ মেয়েদের ব্যাপারে। কোন একটি মেয়েকে নিয়ে দীর্ঘদিন সুখে থাকা আমার সয়না। ঈজিয়স মাঝে মাঝে এসব ব্যাপারে আমাকে বাধা দিতেন। তার সেই অভিভাবকত্বের জন্যে এবং আমি যে অ্যাটিকায় আফ্রেদিতির উপসনা আবার চালু করেছিলাম, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। আমার সে ভুলের জন্য ঈজিয়সের মৃত্যু হয়েছিল, সে জন্যেও আমি দুঃখিত। কথা ছিল, ক্রীট দ্বীপ থেকে নিরাপদে ফিরলে আমার জাহাজে সাদা পাল খাটানো থাকবে। সাদার বদলে কালো পাল দেখে ঈজিয়স ভাবলো, আমার মৃত্যু হয়েছে এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ও আত্মহত্যা করলো।

কিন্তু, আজ আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, সাদার বদলে কালো পাল খাটানোর ব্যাপার কি নিছকই ভুল? না ওটা আমার ইচ্ছাকৃত? ঈজিয়স আমার নানা কাজে বাধা দিত এবং বার্ধক্যের শয্যাসঙ্গিনী ডাইনি মীডিয়ার দেওয়া

ওষুধপত্র খেতে খেতে ওর ধারণা হয়েছিল যে ও বোধহয় অদূর ভবিষ্যতে নবযৌবন ফিরে পাবে। এইভাবে ওর জীবন আমার জীবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও পৃথিবীর নিয়মে বৃদ্ধকে যুবকের জন্যে পথ ছেড়ে দিতে হয়।

কেউ বোধহয় অস্বীকার করবেনা যে আমি মানুষের স্বার্থে কিছু ভালো কাজ করেছি। এই পৃথিবীর বুক থেকে এই অনেক অত্যাচারী কুশাসক, আততায়ী, ডাকাত ও হিংস্র দানবদের চিরতরে সরিয়ে দিয়েছি। যেসব পথে সবচেয়ে সাহসী মানুষেরও পা রাখতে বুক কাঁপতো, সেই পথ আমি নিরাপদ করে তুলেছি। আমি আকাশ এতো পরিষ্কার করেছি যে মানুষ আজ মাথা উঁচু করে আকস্মিক ভাবে ভয় না করে ওই আকাশের নীচে দাঁড়াতে পারে।

সে সময় দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মানুষের পক্ষে খুব একটা নিরাপদ ছিলনা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট শহর যেখানে শেষ, সেখানে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এমন সব জমি যেখানে চাষবাসের বালাই নেই, এমন সব পায়ে চলা পথ যা আদৌ নিরাপদ নয়। মাঝে মাঝে ঘন অরণ্য ও পাহাড়ী গুহা। সবচেয়ে বিপজ্জনক এলাকাগুলোতে ডাকাতের দলগুলোর আড্ডা। তারা লুটপাত ও ছিনতাই করে, খুনখারাপি করে এবং পথিককে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায় করে। এরই পাশাপাশি বন্যজন্তুর উদ্দেশ্যমূলক হিংস্রতা এবং রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়াকলাপ, যার প্রকোপে কেউ কষ্ট পেলে বুঝতে পারতোনা, কে তাকে আঘাত করেছে—মানুষ না দেবতা? রাজা ওয়েদিপাউস স্ফিংসকে এবং বেলেফোরন গরগন্‌কে হত্যা করেছিলেন। দুটোকেই দৈত্য বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের মানবিক বা অতি প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপকে বড় করে দেখানো হচ্ছে, কেউই বোঝেনি। যা কিছু দুর্বোধ্য, যা কিছু যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়না— লোকে ধরে নেয়, এগুলো দেবতাদের কাজ। মানুষের ভয় এবং মানুষের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যোগাযোগ এতোই নিবিড়ে যে বীরত্ব এবং ধর্মবিরোধী ক্রিয়াকলাপ অন্যের সময় একই রকম মনে হত। এপিউরাসের কালো দানব পেরিফেটিসের সঙ্গে যুদ্ধে আমি যেমন তার হাতের গদা কেড়ে নিয়ে যুদ্ধে জিতেছিলাম।

জিউসের অস্ত্র বজ্র। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে এমন দিন আসবে যখন বিদ্যুৎ মানুষের করায়ত্ত হবে যেমনভাবে প্রোমিথিউস মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন আগুন। হ্যাঁ, দেবতার ওপরে বিজয়ী হওয়া মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন আগুন। হ্যাঁ, দেবতার ওপরে বিজয়ী হওয়া মানুষের সর্বোত্তম জয়।

কিন্তু রমণীরমণ রণে জয়ী হওয়ার ব্যাপারটা অন্যরকম। আমি এক

রমণীর বাহুবন্ধন থেকে পালিয়ে অন্য রমনীর আলিঙ্গনে ধরা দিয়েছি এবং রমণীর জয় করার আগে আমি তার কাছে হার মেনেছি।

পিরিথিউস (আহ, তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতার কথা আজও ভুলিনি) আমায় বলেছিল, 'হারকিউলিস ওমফেলির বাহুবন্ধে ধরা দিয়ে যেভাবে নিজের পৌরষ হারিয়েছিল, তুমি সেই ভুল করোনা।' এবং যেহেতু কোন রমণীর সঙ্গ ছাড়া বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, যখনি আমি নতুন প্রেয়সীর সন্ধানে ছুটেছি, পিরিথিউস আমাকে বলেছে ঃ 'যাও, কিন্তু বন্ধনে বাঁধা পড়োনা।'

একজন রমণী আমার জীবনরক্ষার উদ্দেশ্যে (অন্ততঃ লোকে তাই বোঝে) আমাকে সূক্ষ্ম জুতোয় বাঁধতে বাঁধতে চেয়েছিল। তার কথা আমি পরে বলবো।

যে সব রমণী আমার জীবনে এসেছে, তাদের মধ্যে অ্যান্টিওপি আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। সে ছিল আমাজন্ রমণীরাজ্যের রাণী এবং তার অন্য প্রজাদের মত তার বুকে একটি মাত্র স্তন ছিল। ছোটাছুটি এবং কুস্তিতে দক্ষ এই রমণীর মাংসপেশীগুলো ছিল আমাদের অ্যাথলিটদের মতই কঠিন। আমি ওর মোকাবিলা করেছিলাম খালি হাতে। আমার হাতে বাঁধা পড়ে চিতাবাঘের মত ফুঁসছিল। অস্ত্র কেড়ে নেওয়ায় ও দাঁত নখ দিয়ে লড়ছিল। আমি হাসছিলাম বলে এবং আমাকে না ভালোবেসে ওর উপায় ছিল না বলে ও রেগে গিয়েছিল। সত্যিকারের কুমারী মেয়ে এই একবারই পেয়েছি। পরে যদিও ও আমার সন্তান হিপ্পোলিটাসকে একটি মাত্র স্তন দিয়ে দুধ খাওয়াতো, তাতে আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আমি চেয়েছিলাম, আমার এই নিষ্পাপ বন্য স্বভাবের সন্তান আমার উত্তরাধিকারী হবে।

জীবনে সবচেয়ে বড়ো দুঃখ যা পেয়েছি, গল্পের প্রসঙ্গে আমি বলবো। কেননা অস্তিত্বই সবকিছু নয় এবং আমি যে বেঁচেছিলাম, এটাই যথেষ্ট নয়। আমার উত্তরাধিকার অন্যকে দিতে যেতে হবে, যেন আমি নিভে যাওয়ার পরেও আগুন ও আলো জ্বলে থাকে। আমার ঠাকুরদা কথাটা আমায় প্রায়ই বোঝাতেন।

পিথিয়স এবং ঈজিয়স আমার চেয়ে তীক্ষ্ণধী ছিল কিন্তু আমার সাধারণ জ্ঞানের জন্যে নাম ছিল। এর সঙ্গে মিশেছিল ভালো কিছু করার বাসনা। আমার এমন এক ধরণের সাহস ছিল যা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে আমায় প্রেরণা দিতো। সবার ওপরে ছিল আমার উচ্ছাশা। আমার দূর সম্পর্কের ভাই হারকিউলিসের কীর্তির কথা আমি শুনেছি এবং ট্রোজেন ছেড়ে যখন আমায় এথেনসে আমার তথাকথিত জনকের কাছে ফিরে যেতে হল, লোকে সমুদ্রপথে যাওয়ার জন্যে সদুপদেশ দিলেও আমি স্থলপথই বেছে নিলাম।

স্থলপথে ঘুরে যাওয়া এবং সেই পথের নানা বিঘ্নবিপদ আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আমি বুঝেছিলাম, এবার আমার যোগ্যতা প্রমাণ করার সুযোগ আসবে। দেশের সর্বত্র নানা ধরণের চোর ডাকাতেরা ঘোরাফেরা করছে এবং হারকিউলস তার পৌরুষ ওমফেলির পায়ে বাঁধা রেখেছে বলে চোর-ডাকাতেরা নির্ভয়ে ঘুরছে। আমার বয়স তখন ষোল। তাসের টেক্কা-সাহেব সব আমার হাতে।

এবার আমার পালা। আমার হৃদয় লাফিয়ে ছুটছে সুখের চূড়ার দিকে। 'নিরাপত্তার আমার কি প্রয়োজন? যে পথে বিপদ নেই, শৃঙ্খলা আছে, সে পথ আমার জন্যে নয়'—আমি বলেছিলাম। সুখ-শান্তি, নিশ্চিন্ত অলস আরাম এবং প্রশংসিত না হয়ে শুধু শান্তিতে বেঁচে থাকা আমার কাছে অসহ্য। সুতরাং পেলোপনীসাস অন্তরীপ ঘুরে এথেনসের পথে যাবার সময় আমার প্রথম শক্তিপরীক্ষা হল। আমার হৃদয় এবং আমার হাত আমাকে শেখালো, আমার শক্তি কতো। আমি অনেক কুখ্যাত ও ঘৃণিত ডাকাতকে হত্যা করেছি। যেমন সিনিস, পেরিফেটিস, প্রোক্রাসটিস, জেরিয়ন(না, ওর সঙ্গে হারকিউলিস, আমি আসলে সারতিয়নের কথা বলতে চাইছিলাম। অবশ্য শিরন-এর ব্যাপারে আমার একটু ভুল হয়েছিল। পরে দেখা গেল, লোকটা ভালো ছিল, স্বভাবটাও ভালো, পথচারীদের উপকার করতো। কিন্তু যেহেতু আমি ওকে হত্যা করেছিলাম, পরে রটে গেল লোকটা বদমায়েস ছিল।

এথেনসের পথে শতমূলীর ঝোপের মধ্যে ঘটেছিল আমার প্রথম প্রেমের জয়। রূপসী পেরিগোন-এর শরীর ছিল দীঘল এবং স্পর্শিল। আমি ঠিক তার আগেই ওর বাবাকে হত্যা করেছি। ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি ওকে দিয়েছিলাম সুন্দর একটি সন্তান, আমার ছেলের নাম রাখা হয়েছিল মেনালিপপেস। আমি পরে ওদের দুজনেরই খোঁজ রাখিনি। বাঁধা ছিঁড়ে চলাই আমার জীবন। সময় নষ্ট করতেও আমার অনীহা। আমি অতীতকে কখনো আমার পায়ে জড়িয়ে ধরতে বা আমার পথরোধ করতে দিইনি। বরং নতুন করে যা আয়ত্ত করা যাবে, তাই আমাকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। এবং যা কিছু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, তা ভবিষ্যতের মধ্যেই নিহিত।

এই প্রেরণা এমনই যে এইসব প্রাথমিক সামান্য ব্যাপারগুলো আমার কাছে সামান্যই তাৎপর্য ছিল। আমি এক আকর্ষণীয় অ্যাডভেঞ্চারের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। হারকিউলিসও তার জীবনে এ ধরণের অ্যাডভেঞ্চার দেখেনি। ঘটনাটা আমি বিশদভাবে বলছি।

তিন

এই গল্পটা খুব জটিল। ক্রীট দ্বীপ তখন এক শক্তিশালী রাজ্য। মিনোস সেখানকার রাজা ছিল। সে বলতো, অ্যাটিকা-র অধিবাসীরা তার ছেলে অ্যানড্রেজিয়সের মৃত্যুর জন্য দায়ী। প্রতিশোধ হিসেবে সে আমাদের কাছ থেরে প্রতি বৎসর এক উপহার নিতো। সাতটি যবক এবং সাতটি যুবতীকে তার হাতে তুলে দেওয়া হতো। বলা হতো, ওরা দানব মিনোটর-এর ক্ষুধা মেটাবে। মিনোসের স্ত্রী প্যাসিফি এক ষাঁড়ের সঙ্গে যৌনমিলনের ফলে এই দানবশিশুর জন্ম িদিয়েছিল। প্রথম কাকে মিনোটরের খাদ্য হতে হবে, সেটা লটারী করে ঠিক করা হত।

যে বছরের কথা বলছি, সে বছর আমি সদ্য গ্রীসে ফিরেছি। যদিও লটারীতে আমার নাম ওঠার কথা নয়(কারণ রাজপুত্রদের এসব থেকে রেহাই দেওয়া হয়, আমিই জোর করলাম যে আমাকে ক্রীটে পাঠাতে হবে। আমার বাবা রাজা ঈজিয়স আপত্তি করলেন। কিন্তু আমি রাজপুত্র হওয়ার বিশেষ সুবিধে পছন্দ করি না। আমি চাই যে আমার যোগ্যতা আমাকে সাধারণ মানুষের থেকে বড়ো করুক। সত্যি কথা বলতে কি, আমার পরিকল্পনা ছিল, আমি পিনোটরকে হারিয়ে গ্রীসকে এই হিংস্র ঘৃণ্য দানবের হাত থেকে মুক্তি দেব। ক্রীট দ্বীপ থেকে অনেক সুন্দর দামী ও অদ্ভুত জিনিস আমাদের ওখানে প্রায়ই আসতো। তাই ওখানে যেতে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমি তাই ক্রীটের উদ্দেশ্যে পালতোলা নৌকায় যাত্রা শুরু করলাম। আমার তেরোজন সঙ্গীর মধ্যে ছিল আমার বন্ধু পিরিথিউস।

মার্চ মাসের এক সকালে আমি অ্যামনিসস নামের ছোট্ট এক শহরে নৌকো ভিড়িয়েছি। ওই বন্দরের কাছেই ক্রীটের রাজধানী নোসেস। সেখানেই ক্রীটের রাজা মিনোসের প্রাসাদ। ঝড় না হলে আগের দিনই আমাদের ওখানে পৌঁছোবার কথা। আমরা তীরে নামতেই সশস্ত্র প্রহরীরা আমায় ঘিরে ধরলো এবং আমায় ও পিরিথিউসের তরোয়াল ছিনিয়ে নিল।

ওরা যখন দেখলো, আমাদের কাছে আর কোন অস্ত্র নেই, ওরা আমাদের নিয়ে গেল ক্রীটের রাজা মিনোসের কাছে নোসেস্ থেকে সভাসদদের নিয়ে উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পুরুষদের বুক খোলা। শুধু মঞ্চের ওপর বসে-থাকা মিনোসের পরণে ঢিলে আলখাল্লার মত দীঘল গাঢ় লাল রঙের পোষাক, যার রাজকীয় ভাঁজগুলো কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি নেমেছে।

গ্রীক দেবতা জিউসের মতো চওড়া পুরুষালী বুকে তিন সারি নেকলেস। গলায় হার পরে ক্রীটের অধিবাসী অন্য পুরুষেরাও, তবে সেগুলো

সস্তা। মিনোসের গলার হারগুলো দামী পাথর ও সোনার তৈরী। দু-মাথওয়ালা একটা কুঠার তাঁর সিংহাসনের ওপরে ঝুলছে। মিনোসের ডান হাতে তার নিজের দৈর্ঘ্যের সমান লম্বা সোনার তরোয়াল, বাঁ হাতে মস্ত বড় তিন-পাপড়িওয়ালা সোনার ফুল। গলার হারেও একই ধরণের ফুলের ডিজাইন। তার মাথায় সোনার মুকুটের চূড়ায় মোরগ ও উটপাখীর পালক গোঁজা। সে আমাদের কয়েক লহমা দেখে নিয়ে ক্রীট দ্বীপে আমাদের শুভাগমনে আনন্দ জানিয়ে হাসলো। হাসিটা ব্যঙ্গের বলা চলতো। কারণ আমরা তো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে চলেছি। মিনোসের পাশে ওর রানী আর, দুই রাজকন্যা। আমি তখনই বুঝেছিলাম, বড় রাজকন্যার আমাকে পছন্দ হয়েছে। আমাদের প্রহরীরা যখন আমাদের নিয়ে যাবে বলে প্রস্তুত, তখন বড় রাজকন্যা তার বাবার দিকে ঝুঁকে গ্রীক ভাষায় বললো ঃ 'আমার অনুরোধ, ওকে পাঠিও না।' সে আঙ্গুল বাড়িয়ে আমাকে দেখালো। মিনোস আবার হাসলো এবং আদেশ যেন আমাকে সঙ্গীদের সঙ্গে না নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গী ও প্রহরীরা চলে যেতেই মিনোস জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলো।

যদিও আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে আমি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করবো এবং আমি যে রাজপুত্র বা আমি যে একটা দুঃসাহসিক উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি, সে কথা কাউকে জানতে দেবোনা, হঠাৎ আমার মনে হলো, তখন তাসের সব পাত্তিগুলো টেবিলে রাখাই ভালো। বিশেষতঃ যখন রাজকন্যার নেকনজর পেয়েছি। আমি যদি এখন সাফসাফ বলে দিই যে আমি রাজা পিথিয়সের নাতি রাজকন্যার নেকনজরে পড়া বা রাজার সাহায্য পাওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। আমি এমন ইঙ্গিতও দিলাম যে অ্যাটিকায় জনশ্রুতি আছে, আমি মহান পোসিডনের ঔরসজাত সন্তান। মিনোস জবাবে গম্ভীর হয়ে বললো, জলে পরীক্ষা করে কথাটা সত্যি না মিথ্যে জানা যাবে। জবাবে আমি খুব ঠাণ্ডা মেজাজে বললাম, সে যে কোন পরীক্ষাই নিতে চাক, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত। মিনোস নিজে কি ভাবলো জানিনা তবে রাজ্যসভার মহিলারা সবাই আমার আত্মবিশ্বাস দেখে খুশী হলো।

'এখন তুমি যেতে পারো'।

মিনোস বললো।

'খাওয়া দাওয়া করো। তোমার সঙ্গীরা খাওয়ার টেবিলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। রাতে তোমাদের যা ঝামেলা গেছে, তারপরে তোমাদের মেজাজ নিশ্চয়ই ভালো নেই। বিশ্রাম নাও। তোমাদের সম্মানে বিকেলে খেলাধূলো হবে, সেখানে তুমি উপস্থিত থাকবে আশা করি। তারপর, রাজকুমার থিসিয়স, তোমায় আমরা নোসস-এর প্রাসাদে নিয়ে যাবো। তুমি ওখানেই

শোবো এবং কাল আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে যোগ দেবে। নেহাৎই সাধারণ ব্যাপার। তোমার বাড়ির মতোই লাগবে পরিবেশটা। মহিলাঁরা তোমার প্রথম জীবনের নানা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনে খুশী হবেন। এখন আমি খেলাধূলোর প্রস্তুতির ব্যাপারটা দেখতে যাচ্ছি। খেলার সময় আমাদের আবার দেখা হবে। তুমি যুবরাজ, সুতরাং শিষ্ঠাচার অনুযায়ী তুমি রাজকীয় বক্স-এর নীচে বসবে। যেহেতু আমি খোলা-খুলিভাবে তোমার সঙ্গীদের ও তোমার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখাতে চাই না, তোমরা একসঙ্গেই বসবে।

খেলাধুলো হলো বিশাল অর্ধবৃত্তাকৃতি এরীনায়। এরীনার সমুদ্রের দিকটা খোলা। অজস্র মেয়েপুরুষ খেলা দেখতে এসেছে। ওরা এসেছে নসোস থেকে, লিটোস থেকে, এমন কি দুশো মাইল দূরবর্তী শহর গোরটিনা থেকে। অন্যান্য শহর এবং কাছের গাঁগুলো থেকে এবং জনবহুল মফঃস্বল এলাকা থেকেও লোক এসেছে। আমার খুব অবাক লাগছিল। বিদেশী ক্রীটবাসীদের অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। অ্যামফিথিয়েটার-এর গ্যালারীতে জায়গা না থাকায় ওরা প্রবেশপথে এবং সিঁড়িতে ধাক্কাধাক্কি করছিল। ওদের অধিকাংশ মেয়েরই বুক খোলা। কেউ হাল্কা ধরণের বডিস পরেছে বুকে। সেই বডিসেরও আবার এমনই কার্টিং, যা লজ্জা ঢাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ বডিস পরলেও দুই স্তনের সবটাই দেখা যাচ্ছে। পুরুষদের মধ্যে মেয়েদেরও কোমর ও পাছায় আঁটসাঁট বেল্ট ও কর্সলেট। পুরুষদের চামড়ার রঙ বাদামী। মেয়েদের মত তাদেরও হাতের আঙুল, কব্জি ও গলায় আঙটি, ব্রেসলেট ও নেকলেস। মেয়েদের সবাই রঙে ফর্সা। পুরুষদের সবারই দাড়ি কামানো। শুধু রাজার ভাই র‍্যাডাম্যানথাস আর তার বন্ধু ডিডেলাস-এর দাড়ি আছে। রাণী ও রাজকন্যারা বসেছেন আমাদের বসার জায়গায় ঠিক ওপরে উঁচু প্লার্টফর্মে। এরীণা থেকে অনেকটা উঁচুতে এই মঞ্চ। প্রত্যেকেরই পরণে ঝলমলে পোষাক ও অলঙ্কার। প্রত্যেকে ফুলেফেঁপে ওঠা স্কার্ট পরেছে, স্কার্টের ভাঁজগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ছড়িয়ে গেছে কোমরের নীচে, এমব্রয়ডারি পা ছুঁয়েছে, পায়ে সাদা চামড়ার ছোট্ট জুতো। রাণী বসেছে মঞ্চের ঠিক মাঝখানে।

মোটাসোটা বলে ওর চেহারাই প্রথমে চোখে পড়ে। তার হাত ও বুক খোলা। বিশাল স্তনদুটোর ওপরে মক্তো, পান্না ও অন্যান্য পাথর। মাথার কালো চুলের কোঁকড়ানো গুচ্ছগুলো মুখের দুপাশে এবং কপালে। ওর ঠোঁটদুটো পেটুকের মতো, নাকের ডগা ওপর দিকে বাঁকা, বড় বড় চোখ দুটোয় শূন্য দৃষ্টি। দেখলে গরুর চোখের কথা মনে পড়ে। তার মাথায় সোনার মুকুট চুলের বদলে কালো রঙের ছোট্ট টুপির ওপরে বসানো, মুকুটের ফাঁক দিয়ে অদ্ভুৎ ধরণের টুপিটা দেখা যাচ্ছে, টুপির ডগাটা শিঙের মত কপাল

থেকে উঁচিয়ে আছে। তার পোষাকের বুক থেকে কোমর অবধি খোলা কিন্তু পেছন দিকে উঁচু হয়ে গলার মস্ত কলারে শেষ হয়েছে। তার পরণে স্কার্ট ফুলেফেঁপে চারপাশে ছড়ানো। ঘি রং পাদভূমির ওপরে তিন সারি এমব্রয়ডারী। ওপরে বেগুনী রঙের আইরিশ ফুল, মাঝখানে হলুদ স্যাফ্রন এবং নীচে পাতাসমেত ভায়লেট ফুলের এমব্রয়ডারী। ঠিক নীচের মঞ্চে বসে আমি কাছ থেকে এইসব দেখছিলাম। রঙ, ডিজাইন ও পোষাকের কারুকাজের সৌন্দর্য্য দেখে আমার অবাক লাগছিল।

বড় মেয়ে অ্যারিয়্যাডনী বসেছিল ওর মায়ের ডানদিকে। ওর পোষাক এতো ঝকঝকে নয়, পোষাকের রঙও আলাদা। তার ও তার বোনের স্কার্টের দুসারি এমব্রয়ডারি। কুকুর ও পাখী পোষাক আঁকা।

ফেড্রা-কে দেখলেই মনে হয়, তার বয়স কম। সে বসেছিল প্যাসিফে-র বাঁদিকে। তার পোষাকে দুসারি এমব্রয়ডারী। প্রথম সারিতে ছেলেরা দড়ি নিয়ে লাফাচ্ছে। দ্বিতীয় সারিতে ছোট ছেলেরা বসে বসে মার্বেল খেলছে। ফেড্রা শিশুর মত খুসী হয়ে খেলাধূলার দৃশ্য দেখছিল। আমার কাছে সবকিছুই এমন নতুন যে আমি ঠিকমত মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। নাচ, গান ও কুস্তি শেষ হবার পর অ্যাক্রোব্যাটরা এরীনায় নামলো। মিনোটরের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধে নামতে হবে। তরোয়াল খোলার কৌশল দেখতে দেখতে ষাঁড়কে কিভাবে ক্লান্ত করে বোকা বানানো যায়, সে বিষয়ে অনেক কিছু শিখলাম।

চার

শেষ চ্যাম্পিয়নকে অ্যারিয়াডনী পুরস্কার দেবার পর খেলাধূলোর আসর বন্ধ বলে ঘোষণা করলো রাজা মিনোস। চারপাশে ওর সভাসদ, ও আমাকে আলাদা ডাকলো।

'যুবরাজ থিসিয়স, এবার সমুদ্রের ধারে একটা জায়গায় তোমায় নিয়ে গিয়ে আমরা পরীক্ষা করে দেখবো, তুমি সত্যিসত্যিই তোমার দাবী-মাফিক মহান পডিসনের ঔরসজাত সন্তান কিনা।'

আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ছোট্ট একটা পাহাড়ের ওপর! নীচে সমুদ্রের ঢেউ এসে পড়েছে। রাজা মিনোস বললো—

'আমি এখন আমার মুকুটটা ছুঁড়ে দেবো। আমার বিশ্বাস তুমি ওটা ফিরিয়ে আনতে পারবে।'

মহিলাদের উপস্থিতিতে উৎসাহিত হয়ে আমি প্রতিবাদ করলাম—'আমি তো কুকুর নই যে আমার প্রভু কিছু ছুঁড়ে দেবেন আর আমি সেটা তুলে

আনবো। জিনিসটা মুকুট হলেই বা কি এসে যায়? তার চেয়ে আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিই এবং এমন কিছু তুলে আনি যা আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবে।'

আমি আরও একটা সাহসের কাজ করলাম। সামুদ্রিক হাওয়ায় রাজকন্যা অ্যারিয়াডনীর কাঁধ থেকে মস্ত বড় একটা রুমাল খুলে গিয়ে আমার দিকে ভেসে আসতেই আমি হেসে ওটা ধরে ফেললাম। এমন একটা ভাব করলাম যেন এই রাজকন্যা কিম্বা কোনো দেবতা ওটা আমাকে উপহার দিয়েছেন। আঁটসাঁট পোযাক খুলে আমি রুমালটা ল্যাঙটের মত পরে নিলাম। ভাব দেখলাম যে পুরুযাঙ্গ মেয়েরা দেখুক এটা চাইছিনা। আসলে আমার কোমরে ছিল চামড়ার একটা বেল্ট। বেল্ট আঁটা ছোট্ট থলিতে ছিল গ্রীস থেকে আনা কিছু দামী রত্ন আর পাথর। সেটাই আমি ঢাকতে চাইছিলাম!

জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে আমি জলের নীচে ডুব দিলাম।

আমি নিপুণ সাঁতারু। জলের নীচে ডুব দিয়ে আমি ব্যাগ থেকে দুটো ক্রাইসোপ্রেসিস বের করলাম। তারপর জল থেকে শুকনো ডাঙায় ফিরে এসে আমি ওনিক্সটা দিলাম রাণীর হাতে আর অন্য দুটো পাথরের এক একটা এক এক রাজকন্যার হাতে। তখন আমি এমন একটা ভাব দেখালাম যেন আমি সমুদ্রের তলায় ওদুটো পেয়েছি, (কিম্বা যেহেতু দুস্প্রাপ্য এই সব পাথর, যা শুকনো জমিতেই ক্বচিৎ কদাচিৎ পাওয়া যায়, তা ওইভাবে একডুবে সমুদ্রের নীচে পাওয়া সম্ভব নয়), অথবা আমার পিতা শক্তিমান সমুদ্রদেবতা পোসিডিন ওগুলো আমায় দিয়েছেন যেন আমি ওগুলো মহিলাদের উপহার দিতে পারি।

সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল যে দেবতা পোসিডনের ঔরসে আমার জন্ম এবং পোসিডন আমাকে খুবই ভালোবাসেন।

এরপর রাজা মিনোস আমার তরবারীটা আমায় ফিরিয়ে দিলেন।

একটু পরেই রথে চড়ে আমরা নোসোসের দিকে রওনা হলাম।

পাঁচ

আমার এতো ক্লান্ত লাগছিল যে পরিবেশের নতুনত্ব দেখেও আমি ততটা চমৎকৃত হই নি। প্রাসাদের সামনে প্রকাণ্ড উঠোন, থামগুলো সিঁড়ি, ঘোরানো করিডর বেয়ে মশাল হাতে রাজভৃত্যেরা পথ দেখিয়ে চলেছে। দোতলায় একটা ঘরে আমায় থাকতে দেওয়া হয়েছে। আমি ঘরে যাবার পর অজস্র বাতির মধ্যে একটা ছাড়া বাতী সবগুলো নিবিয়ে দেওয়া হল।

বিছানাটা নরম, সুগন্ধ জড়ানো। ওরা চলে যেতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সন্ধ্যে অবধি ঘুমিয়েছিল। যদিও দীর্ঘ যাত্রার অবসরেও

আমিও ঘুমিয়েছিলাম। কারণ সারারাত পথে কাটিয়ে সকালে ক্রীটের রাজধানী নোসেসে পৌঁছেছিলাম।

আমার ব্যক্তিত্বে আন্তর্জাতিকতার ছাপ নেই। মিনোসের রাজ সভায় এসে আমি অনুভব করেছি যে আমি গ্রীক এবং আমি এখন প্রবাসে এসেছি। অপরিচিত সব কিছুই আমাকে চমক দিয়েছে।

যেমন, ক্রীটবাসীদের পোষাক, তাদের আচার-আচরণের ধারা, আসবাবপত্র (আবার বাবা রাজা হলেও আমাদের বাড়ীতে আসবাবের অভাব ছিল) গৃহস্থলীর জিনিসপত্র, এবং সেগুলো ব্যবহারের ধারা। এতো কিছু সুন্দর জিনিসের মধ্যে আমি যেন এক বন্য অরণ্যচর। আমি সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না এবং আমার ব্যবহারে লোকে হাসতে বলে আমার আরও খারাপ লাগতো। আমার অভ্যেস, হাতে খাবার নিয়ে আঙুল দিয়ে মুখে পোরা। ওরা ব্যবহার করে সোনার তৈরী ছুরি—কাঁটা-চামচ। ওগুলো ব্যবহার করা অনেক সোজা। লোকে আমার দিক থেকে চোখ সরাতে চায় না। আমি মুখ খুললে আমাকে আরও বোকা বলে মনে হয়। কেমন আমার নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে বেমানান মনে হতো।

আমি যখন নিজেকে ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে এলাকা কিছু করেছি, তখনই আমি ভালো কিছু করতে পেরেছি। এই প্রথম আমাকে সমাজের একজন হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এটা যুদ্ধ নয় কিম্বা শারীরিক শক্তিতে কোন কিছু তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার নয়। এটা অন্যকে আনন্দ দেওয়ার প্রশ্ন। এবং এ ব্যাপারে আমার সামান্যই অভিজ্ঞতা আছে।

খাওয়ার টেবিলে দুজন রাজকন্যার মাঝখানে আমি বসি। আমাকে বলা হয়েছিল খুবই সরল, সাদাসিধে পারিবারিক ব্যাপার। মিনোস এবং রাণী ছাড়া খাওয়ার আসরে ছিল রাজার ভাই র‍্যাডাম্যানথাস, দুই রাজকন্যা এবং তাদের ছোটো ভাই গ্ল্যকাস। এ ছাড়া ছিল রাজপুত্রের একজন গৃহশিক্ষক। করিনথ থেকে আসা এই গ্রীক যুবকের আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি।

ওরা আমাকে নিজের ভাষায় আমার অ্যাডভেঞ্চারগুলো বর্ণনা করতে বললো। রাজসভায় সবাই ওই ভাষা বোঝে এবং ওই ভাষায় কথাও বলতে পারে। যদিও এদের উচ্চারণে একটু টান আছে। আমি যখন প্রোক্রাসটিস-এর গল্প বলছিলাম—যে দানব পথচারীদের অদ্ভুত ভাবে শাস্তি দিতো এবং পরে একই শাস্তি সে আমার কাছ থেকেও পেয়েছিল—শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ মেপে যেটা নির্দিষ্ট মাপের চেয়ে বড়, সেটা কেটে নেওয়া—তখন গল্প শুনে ফেড্রা ও গ্ল্যকাস হাসিতে ফেটে পড়ছে দেখে আমি খুশী হলাম। কিন্তু ক্রীটে আমি কি উদ্দেশ্যে এসেছি, সেই ব্যাপারে কেউ কিছু বললো না। সবাই এমন ভাব দেখালো যেন আমি এখানে বেড়াতে এসেছি।

যতোক্ষণ খাওয়া দাওয়ার পালা চলছিল, অ্যারিয়্যাডসি টেবিলের নীচে আমার পায়ে বারবার চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু তরুণী ফ্রোডার শরীরের ওম্ আমার বেশী ভালো লাগছিল। গরুর মতো গোলগাল চোখে আমাকে এক নজরে দেখছিল রাণী প্যাসিফি এবং রাজা। মিনোসাসোর মুখে সব সময়েই হাসি লেগে আছে। শুধু রাজার ভাই দাড়িওয়ালা র‍্যাডাম্যানথাস-ই মেজাজে ছিল না। খাবারের চতুর্থ পদ শেষ হতেই রাজার সঙ্গে ও বেরিয়ে গেল। বলে গেল—ওরা সিংহাসনে বসতে যাচ্ছে। 'সিংহাসনে বসা' ব্যাপারটা আসলে কি, আমি পরে বুঝেছিলাম।

সমুদ্রযাত্রা-জনিত অসুস্থতায় তখনও আমি ভুগছিলাম। ভোজে বেশী খেয়েছি। মদ খাওয়া আরও বেশী হয়েছিল। আমাকে এতো নানা ধরনের মদ আর লিকার পরিবেশন করা হয়েছিল যে একটু পরে আমার জ্ঞান ছিলনা।

এর আগে অবধি আমি জল বা জলমেশানো পাতলা মদ খেতেই অভ্যস্ত ছিলাম। মদের নেশায় আমার চারপাশের দুনিয়া বন্‌বন্ করে ঘুরছে। আমি দাঁড়াতে পারছিনা। আমি তখন ওই ঘর ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। রাণী তাড়াতাড়ি আমাকে সংলগ্ন একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। শরীর খারাপ লাগছিল বলে আমি রাণীর সঙ্গে একই সোফায় বসলাম।

তারপর রাণী তার প্রেমালাপ শুরু করলো।

'আমার যুবক বন্ধু, কিছুক্ষণ আমরা একসঙ্গে কাটাবার সুয়োগ পেয়েছি, সুতরাং সময়টা সদ্ব্যবহার করা যাক। তুমি যা ভাবছো, আমি সেরকম নই। তোমার চেহারাটা সুন্দর হলেও ও ব্যাপারে আমার লোভ নেই।'

এবং যদিও রাণী বলছিলো, ও আমার আত্মা, মন বা অভ্যন্তরের কিছু একটার ব্যাপারে আগ্রহী, সে আমার কপালে হাত বোলাতে বোলাতে শেষ অবধি চামড়ার তৈরী জার্কিন খুলে আমার বুকে হাত বোলাতে লাগলো। যেন ও দেখতে চাইছিল, সত্যি সত্যিই আমি ওখানে আছি কিনা। রাণী বলছিল—

'আমি জানি, তুমি কি উদ্দেশ্যে ওখানে এসেছো।

তোমার ভুলের ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। তোমার উদ্দেশ্য হত্যা করা। তুমি আমার ছেলে মিনেটর-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এখানে এসেছো। তুমি তার সম্বন্ধে কি শুনেছো, আমি জানিনা, তুমি আমার মিনতি শোনো। যাকে তোমরা মিনোটর বলো, সে দানব কিনা আমি জানিনা কিন্তু সে আমার সন্তান।'

এই সময় আমি বাধা দিয়ে বললাম, দানবেরা দানব বলেই যে আমি তাদের বিরুদ্ধে, এটা সত্যি নয়। কিন্তু রাণী আমার কথায় কান না দিয়ে বলতে লাগলো—

'আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। স্বভাবের দিক থেকে আমি আধ্যাত্মবাদী। স্বর্গীয় যা কিছু, তাই আমার ভালোবাসার জাগায়। মুস্কিলটা হলো, কোথায় যে দৈবিক ব্যাপারের শুরু এবং কোথায় শেষ বোঝাই মুস্কিল। আমার খুড়তুতো বোন লিডি-র কাছে দেবতা এসেছিল রাজহাঁসের বেশে। মিনোস জানো, আমি তাকে ডায়োস্কুরোস-এর মত উত্তরাধিকারী দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেবতাদের বীর্য্যেও যে জান্তব উপাদান আছে, তা কেমন করে চেনা সম্ভব?

আমি আমার ভুলের জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু, থিসিয়স, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, ষাঁড়ের সঙ্গে সঙ্গমের মুহূর্তটা ছিল আমার জীবনের এক ঐশ্বরিক মুহূর্ত। কারণ, তুমি ভেবে দেখো, ষাঁড়টা সাধারণ ষাঁড় ছিল না। দেবতা পোডিসন স্বয়ং তাকে পাঠিয়েছিলেন। ওই ষাঁড়টাকে দেবতার কাছে বলি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ষাঁড়টা এতোই সুন্দর যে মিনোস তাকে বলি দিতে চাইলোনা। তাই পরবর্তীকালে আমি সবাইকে বুঝিয়েছি যে ষাঁড়ের জন্য আমার দৈহিক কামনা আসলে দেবতার প্রতিশোধের একটা রূপ। তুমি তো জানো আমার শ্বাশুড়ি ইউরোপাকে একটা ষাঁড় চুরি করে নিয়ে গিয়ে ছিল এবং সেই ষাঁড়ের ভিতরে ছিল দেবতা জিউস স্বয়ং। জিউসের ঔরসে ইউরোপার গর্ভে আমার স্বামী মিনোসের জন্ম। তাই এই পরিবারে ষাঁড়কে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়। সেই জন্যে, মিনোটরের জন্মের পর রাজা মিনেস ভুরু কোঁচকালেই আমি বলতাম—

'তোমার মায়ের কেচ্ছার কথা ভুলে গেলে।' মিনোসকে স্বীকার করতেই হতো, ভুলটা স্বাভাবিক। মিনোস খুবই জ্ঞানী। ওর ধারণা, জিউসের উত্তরাধিকারী হিসেবে ও এবং ওর ভাই র‍্যাডাম্যানথাস বিচারের অধিকার পেয়েছে। ওর মতে বিচার করার আগে ওকে ব্যাপারটা বুঝতে হবে এবং যতোক্ষণ না ও বা ওর পরিবাবের কেউ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যাপারটা না বুঝছে, ততোক্ষণ পর্য্যন্ত ওর পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়। ওর এই ধারণা থেকে আমরা পরিবারের সবাই নানারকম ভুল করতে প্রেরণা পাই। ওর মেয়েরা এবং আমি বিভিন্নভাবে নানারকম ভুল করি। যাতে বিচারক হিসেবে মিনোসের দিন দিন উন্নতি হয়। মিনোটরও তাই করছে, যদিও সে তা জানেনা। থিসিয়স, তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি যে তুমি মিনোটরের কোনো ক্ষতি করোনা। বরং ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলে ভুল বোঝাবুঝির ফলে ক্রীটের সঙ্গে গ্রীসের যে শত্রুতা হয়েছে, তার অবসান ডেকে আনো। কারণ এই ভুল বোঝাবুঝির ফলে আমাদের দু'দেশেরই যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে।'

এই সব নানা কথা বলে রাণী আমায় যত্ন করতে শুরু করলো এবং সমস্ত ব্যাপারটা এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছুলো যখন মদের গন্ধভরা নিঃশ্বাসের

সঙ্গে রাণীর স্তনের তীক্ষ্ণ গন্ধ মিশে আমার যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করলো।

'এবার আমার স্বর্গীয় ব্যাপারে ফিরে যাই।'

রাণী বলছিল।

'থিসিয়স, তুমি নিজেও কি কখনও কখনও বুঝতে পারো না যে তোমার ভিতরে কোনো না কোনো দেবতা লুকিয়ে আছে'?

আমার অসুবিধার আর একটা কারণ, রাণীর বড় মেয়ে অ্যারিয়াডনী (দেখতে অপূর্ব সুন্দরী, তবে আমার কাছে ওর ছোট বোন ফ্রেডার আকর্ষণই বেশী মনে হয়েছিল) আমাকে আগেই ইঙ্গিতে ও ফিসফিস করে বলেছে, সে আমার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করবে।

ছয়

কি সুন্দর বারান্দা! কি বিশাল প্রাসাদ! মনে হল যেন চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মত বাগনটা অজানিত কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে। সময়টা ছিল মার্চ মাস। কিন্তু বসন্তের আরামদায়ক ঈষৎ-উত্তাপ আমি এরই মধ্যে টের পাচ্ছিলাম। খোলা হাওয়ায় আমার বেশ ভালই লাগলো। বন্ধ দরজার আড়ালে থাকতে আমি অনভ্যস্ত। আমি ফাঁকা হাওয়ায় শ্বাস নিতে ভালোবাসি। আমাকে দেখেই ছুটে এল অ্যারিয়্যাডনী এবং কোনো কথা বলে তার তপ্ত ঠোঁটদুটো আমার ঠোঁটে চেপে ধরলো যে আর একটু হলে আমরা দুজনেই উল্টে পড়তাম।

'আমার পেছনে পেছনে এসো। অবশ্য কেউ আমাদের দেখে ফেললেও কিছু যায় আসে না, তবে গাছের ছায়ায় আমরা প্রাণ খুলে কথা বলতে পারবো। অ্যারিয়্যাডনী বললো বাগানের যে দিকে পাতার ভিড়, যেখানে বড় বড় গাছগুলো চাঁদকে আড়াল করলেও সমুদ্রের বুকে চাঁদের প্রতিফলন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আমাকে সেখানে নিয়ে যায় আমার সঙ্গিনী। সে এর মধ্যেই তার পোষাক বদলে ফেলেছে। এখন তার পরনে ঘাঘরা প্যাটার্ণ স্কার্ট আর আঁটসাঁট উর্ধ্বাবরনীর বদলে হাল্কা ঢিলে পোষাক, যার আড়ালে সে সম্পূর্ণ নগ্ন।

'আমার মা তোমায় কি বলেছিলো, আমি অনুমানে জানি। আমার মা পাগল। আমার মা তোমায় যা কিছু বলেছে, তুমি অনায়াসে তা ভুলে যেতে পারো। প্রথমতঃ, যে কথাটা তোমার বোঝা উচিত, এখানে এসেছো আমার সৎ ভাই দানব মিনোটরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে বলে। আমি নিশ্চিত তুমি জয়ী হবে। তোমাকে দেখা মানেই সংশয়কে মন থেকে নির্বাসন দেওয়াঃ (আমার কথার কাব্যিক ধরণটা কি তোমার কানে এলোনা? হয়তো তোমার কবিতা

শোনার কান নেই।) কিন্তু যে গোলকধাঁধাঁর ভেতরে মিনোটর থাকে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের সাধ্য নয়। যদি তোমার প্রেমিকা (তার মানে, আমি) তোমায় সাহায্য না করে, তুমিও ওখান থেকে বের হতে পারবে না। ওই গোলকধাঁধাঁটা কি ভীষণ জটিল, তুমি বুঝতে পারছোনা। কাল আমি তোমাকে ডিডেলাসের কাছে নিয়ে যাবো। সে এই গোলকধাঁধাঁ তৈরী করেছিল। কিন্তু কিভাবে ওখান থেকে বের হতে হয়, সে হয়তো এর মধ্যেই ভুলে গেছে। তুমি ডিডেলাসে কাছে শুনবে কিভাবে ডিডেলাসের ছেলে ইক্যারাস একবার সাহস করে ওই গোলকধাঁধাঁয় ঢুকে পাখার সাহায্যে হাওয়ায় ভেসে তবেই বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। আমি তোমাকে ওইভাবে গোলকধাঁধাঁ থেকে বের হবার চেষ্টা করতে বলবো না। ওটা খুবই বিপজ্জনক পন্থা।

তুমি এটা বুঝে নাও যে তোমার বাঁচার একমাত্র পথ হলো আমার কাছাকাছি থাকা। তোমাকে ও আমাকে—আমাদের এখন থেকে একসঙ্গে থাকতে হবে। জীবনে এবং মরণে। শুধুমাত্র আমার সাহায্যে, আমার দ্বারা এবং আমার ভিতরে তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। যদি তুমি আমাকে সঙ্গে না নাও ফলটা তোমার পক্ষে খারাপ হবে। সুতরাং তুমি এখন আমাকে সঙ্গে নাও।'

কথা শেষ করেই অ্যারিয়্যাডনী আর কোন সংযমের বাধা না মেনে আমার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়লো এবং ভোর অবধি আমাকে আলিঙ্গনে বেঁধে রাখলো।

আমার পক্ষে রাত্রির প্রহরগুলো যেন খুব আস্তে আস্তে কাটছিল। কারণ আনন্দের মুহূর্তেও দীর্ঘ সময় এক জায়গায় থাকা আমার পছন্দ নয়। নতুনত্ব কেটে গেলেই বাঁধন ছিঁড়ে দূরে যেতে চাই। কারণ পরবর্তী কালে অ্যারিরয়্যাডনী প্রায়ই বলবে ঃ 'থিসিয়স, তুমি কথা দিয়েছিলে। কিন্তু আমি কোন প্রতিশ্রুতিই দিইনি! সবার ওপরে আমার স্বাধীনতা। আমার প্রথম কর্তব্য আমার নিজের প্রতি।'

যদিও আমার স্নায়ু মদের নেশায় কিছুটা আচ্ছন্ন ছিল, যেভাবে অ্যারিয়্যাডনী তার কুমারীত্ব বিনা দ্বিধায় আমাকে সঁপে দিল, আমি স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, আমি তার জীবনে প্রথম পুরুষ নই। সুতরাং তাকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি বিবেকের কোন দংশন অনুভব করিনি।

তাছাড়া তার ভাবপ্রবণতা আমার কাছে ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সে আমাকে চিরদিন ভালোবাসবে, এই প্রতিশ্রুতি এবং সেসব নরম বিশ্লেষণে সে আমাকে ভোলাতে চাইতো সেগুলোও আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। আমি কখনো ছিলাম তার সাত রাজার ধন, কখনো বা ক্যানারী পাখী, কখনো বা

তার কুকুর, কখনো বা তার গিনী-ফাউল। এইসব প্রিয় নাম ধরে কেউ আমাকে ডাকুক, তা আমার আদৌ পছন্দ নয়। তাছাড়া অ্যারিয়্যাডনী বড্ড বেশী পড়াশুনো করেছিল। সে বলতো, 'প্রিয় আমার, আইরিশ ফুলগুলো শুকিয়ে যাবে, ঝরে যাবে। (আসলে কিন্তু ফুলগুলো সবে ফুটতে শুরু করছে।) আমি খুব ভালোভাবেই জানতাম যে কোনা জিনিস চিরদিন থাকবে না। কিন্তু আমার কাছে বর্তমান ছাড়া কোন কিছুরই গুরুত্ব নেই। তাছাড়া অ্যারিয়্যাডনী বলতো—'তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না। কথাটা শুনেই আমি ভাবতে শুরু করতাম, কিভাবে ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

'তোমার বাবা রাজা মিনোস কি বলবে?'

আমি ওকে প্রশ্ন করেছি।

ও উত্তরে বলেছে।

'মিষ্টি সোনা, মিনোস সবকিছুই সহ্য করে। যাতে বাধা দেওয়া যায় না তা হতে দেওয়াই ওর মতে বুদ্ধিমানের কাজ। আমার মা ষাঁড়ের সঙ্গে সঙ্গমে মেতেছিল বলে সে রাগারাগি করেনি। তবে সব শুনে সে বলেছিল, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝলাম না। তবে যা হবার হয়ে গেছে এবং যাই করা যাক, এখন আর ঘটনা বদলাবেনা। সুতরাং আমাদের ব্যাপারে সে ঠিক তাই করবে। বড় জোর ও হয়তো তোমায় রাজসভা থেকে নির্বাসন দেবে। তাতে কিচ্ছু এসে যায় না। তুমি যেখানে যাবে, আমিও যাবো।

আমি ভাবলাম...। আমি যেখানে যাবো, তুমি যাও কিনা সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

হাল্কা প্রাতরাশের পর আমি বললাম যে, আমি ডিডেলাসের সঙ্গে একা দেখা করতে চাই। আমাকে পেসিডনের নামে শপথ নিতে হল যে, কথা শেষ করেই আমি প্রাসাদে অ্যারিয়্যাডনীর কাছে ফিরে আসবে, তবে আমার প্রস্তাবে রাজী হল অ্যারিয়্যাডনী।

সাত

আমাকে স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়ায় ডিডেলাস। স্বল্পালোকিত ঘর। সামনে অনেকগুলো ড্রয়িং ছড়ানো। চারপাশে অদ্ভুত কিছু যন্ত্রপাতি। লোকটা খুবই দীর্ঘকায় এবং বয়স অনেক হওয়া সত্ত্বেও তার মেরুদণ্ড ঋজু। তার দাড়ির রং রুপালী। মিনোসের কালো দাড়ি বা র‍্যাডাম্যানথাসের সাদা দাড়ির চেয়েও বড় দাড়ি ডিডেলাসের। চওড়া কপালে অনেকগুলো গভীর ভাঁজ পড়েছে। সে নীচের দিকে তাকালে পুরু ভুরুজোড়ার নীচে চোখদুটো আধো-

ঢাকা পড়ে। সে আস্তে আস্তে ভারী গলায় কথা বলে। যে যখন চুপ করে থাকে, তখনও মনে হয়, সে কিছু ভাবছে।

ডিডেলাস আমাকে আমার নানা অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে অভিনন্দন জানালো। বললো, যদিও সে পৃথিবীর কলকোলাহল থেকে দূরে থাকে, আমার বীরত্বের কাহিনীগুলো তার কানেও পৌঁছেছে। কিন্তু তার চোখে, আমি নির্বোধ। কেননা অস্ত্রের সাহায্যে কে কি করলো, ডিডেসাসের কাছে তার কোন গুরুত্ব নেই এবং শারীরিক শক্তিকে সে ঐশ্বরিক কিছু বলে মনে করেনা।

ডিডেলাস বললো—

'একসময় তোমার পূর্বসুরী হারকিউলিস-এক সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। লোকটা নির্বোধ। বীরত্ব দেখানো ছাড়া অবশ্য কিছু ওর কাছে আশা করা যেতো না। কিন্তু তার মধ্যে যা আমার ভালো লেগেছিল, তা হল, যে কাজটা সে করছে, সেই কাজটা সে একমনে করে এবং তার দুঃসাহস কখনও পিছু হটে না। তোমার ও হারকিউলিসের অসীম সাহাসকে ঔদ্ধত্য বললেও ভুল হয় না। এই দুঃসাহস তোমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু তার আগে এই অসীম সাহস সেই কাপুরুষকে ধ্বংস করেছে, যে কাপুরুষ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরালে লুকিয়ে আছে। হারকিউলিস তোমার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট করেছে। ভালো কিছু করবে বলে তার যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ছিল। একটা অ্যাডভেঞ্চার শেষ হলে তাকে বিষণ্ন মনে হত। কিন্তু তোমার মধ্যে আমার যা ভালো লেগেছে, তা হলো, তুমি সবকিছু থেকে আনন্দ আহরণের চেষ্টা করো। এখানেই হারকিউলিসের সঙ্গে তোমার তফাৎ। তুমি তোমার মন বা চিন্তাশক্তিকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলো না বলে আমি তোমার প্রশংসা করছি। ওসব তাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভালো, যারা নিজেরা সক্রিয় নয়, কিন্তু কাজের লোকেদের কাজের ভালো ভালো উদ্দেশ্য উদ্ভাবনে পটু।

তুমি কি জানো যে তুমি ও আমি আসলে দূরসম্পর্কের ভাই। মিনোস কিন্তু কথাটা জানে না। ওকে ও ব্যাপারে কিছু না বলাই ভালো। আমাকে দুঃখের সঙ্গে আমার স্বদেশ অ্যাটিক ছাড়তে হয়েছিল। সে সময় আমার ভাগ্নে ট্যালোসোর সঙ্গে আমার মতভেদ দেখা দেয়। আমার মত সেও ছিল ভাস্কর। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাস্কর ট্যালোস খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সে দাবী করে যে ভাস্কর্যের বিভিন্ন দেবমূর্তির পায়ের দিকটা স্থির, গতিহীন, স্থানু ভঙ্গিমায় রেখে যে দেবতাদের মাহাত্ম্য রক্ষা করছে। অন্যদিকে আমি চেয়েছিলাম, দেবমূর্তির হাত-পায়ে গতির ভঙ্গিমা এনে দেবতাদের মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসতে।

আমারই চেষ্টার ফলে অলিমপাস আজ পৃথিবীর প্রতিবেশী হয়েছেন। এরই পরিপূরক হিসেবে আমি বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে মানবজাতিকে দেবতার ছাঁচে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

তোমার বয়সে জ্ঞান অর্জনই ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো বাসনা। আমি কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া মানুষের বাহুবল বিশেষ কিছুই করতে পারে না এবং 'শক্ত হাতের চাইতে ভালো যন্ত্রের দাম বেশী'—এই প্রবাদটা সত্যি। তোমার বাবা তোমাকে যে অস্ত্রগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো না পেলে তোমার পক্ষেও অ্যাটিকা ও পেলোপনীজ এর দস্যুদের দমন করা সম্ভব হতো না। আমি ভেবেছিলাম যে আমার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ হবে যন্ত্রগুলোর উন্নতি করা এবং সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন অঙ্কশাস্ত্র, যন্ত্রবিজ্ঞান ও জ্যামিতি আমার ততোটা আয়ত্ব হবে, যতোটা মিশরবাসীরা জানে। তত্ত্ব থেকে প্রয়োগে যেতে হলে আমাকে বিভিন্ন পদার্থের গুণাগুণ জানতে হবে। এমনকি যেসব পদার্থের এই মুহূর্তে কোন আপাতদৃষ্ট প্রয়োজন নেই, সেগুলোরও গুণাগুণ জানা দরকার। কেন না মানব জগতে যেমন জড়জগতেও তেমনি আমরা অপ্রত্যাশিত জায়গায় অসাধারণ গুণের সন্ধান পাই।

অন্যান্য ব্যবসা, অন্যান্য শিল্পকলা, অন্যান্য আবহাওয়া এবং অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে আমি দূরদেশে গেছি, বিখ্যাত বিদেশী পণ্ডিতদের শিষ্য হয়েছি এবং তাঁদের কাছে ততোদিন থেকেছি, যতোদিন তাঁদের আমাকে শেখাবার মত আর কিছু না থাকে। কিন্তু যেখানেই আমি থেকে থাকি এবং যতোদিনই থেকে থাকি, অন্তঃকরণের দিক থেকে আমি গ্রীকই রয়ে গেছি। এবং যেহেতু আমি জানি, তুমিও গ্রীকের সন্তান, আমি তোমার ব্যাপারে আগ্রহী।

ক্রীটে ফিরে আমি মিনোসকে আমার পড়াশোনা ও দেশভ্রমণের ব্যাপারে বললাম এবং যে পরিকল্পনাটা আমার মনে এসেছিল, সেটাও জানালাম। মিশরে মোয়েরিস হ্রদের তীরে আমি একটা গোলক ধাঁধাঁ দেখেছি। আমি প্রস্তাব দিলাম, মিনোস আমার পরিকল্পনায় রাজী হলে এবং আমায় সাহায্য করলে আমি অন্য প্ল্যানে একটা গোলকধাঁধাঁ তার প্রাসাদের কাছেই তৈরী করবো। সে সময় মিনোস একটা ঝামেলায় পড়েছিল। ষাঁড়ের সঙ্গে যৌনসঙ্গমের পর তার রাণী এক দানবের জন্ম দিয়েছে। কিভাবে সেই দানবশিশুর দেখাশোনা করা উচিত, মিনোস জানেনা। কিন্তু মিনোটরকে সকলের থেকে আলাদা করে রাখা এবং জনসাধারণের দৃষ্টির আড়ালে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে মিনোস আমাকে বললো, আমি যেন একটা একটা

বাড়ী এবং পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত একসারি বাগান তৈরী করি, সেখানে ঐ দানব ঠিক বন্দী থাকবে না অথচ ওখান থেকে পালাতেও পারবেনা! আমার সব জ্ঞান এবং আমার শ্রেষ্ঠ চিন্তা ফসল এই গোলাকধাঁধা।

কিন্তু যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে যদি কেউ প্রাণপ্রণে পালাবার চেষ্টা করে, কোন কারণেই তাকে আটকাতে পারেনা এবং সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে কোন পরিখা ও যে কোনো বেড়াই ডিঙোতে পারে, আমি ভেবেছিলাম যে বন্দীকে কারাগারে রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় কারাগারটা এমনভাবে গড়া নয় যাতে তার বের হবার পথ থাকবেনা, বরং এমনভাবে গড়া যেন সে কারাগার ছেড়ে যেতেই চাইছে না। সব ধরণের ইচ্ছাপূরণের উপাদন তাই ওখানে আমি জড়ো করেছিলাম। মিনোটরের চাহিদা বেশী নয়, চাহিদার বৈচিত্র্যও কম। কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার সময় সকলের কথাই ভাবতে হয়েছিল। সকলের অর্থাৎ যে কেউ ওই গোলকধাঁধাঁয় ঢুকবে, তারই রুচির কথা আমরা ভেবেছিলাম। আর একটা প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল যে কোনো আগন্তুকের ইচ্ছাশক্তিকে নষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যে ওখানে যে মদ পরিবেশন করা হয় তার সঙ্গে কিছু মাদবদ্রব্য মিশিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওটাই যথেষ্ট নয়। আমি আরও ভালো একটা রাস্তা খুঁজে পেলাম।

আমি দেখেছি যে কিছু কিছু গাছ আছে, যা আগুনে ফেলে দিলে এমন এক ধরণের ধোঁয়া বের হয়, যার গন্ধে নেশা হয়। আমার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এগুলো চমৎকার কাজে এলো এবং যে উদ্দেশ্যে আমি এগুলোকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম, ঠিক তাই হলো। আমি ওখানে দিবারাত্রি স্টোভ জেলে রাখার ব্যবস্থা করলাম এবং স্টোভের আগুনে এইসব গাছ পোড়ানো হতে লাগলো। ভারী গ্যাসগুলো শুধু যে মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, তাই নয়, তার মিষ্টি একটা নেশার ভাব আনে, আনন্দদায়ক দৃষ্টিবিভ্রম জাগায় এবং ইন্দ্রিয় সুখবর্ধক এইসব মরীচিকা দেখতে দেখতে মন 'অর্থহীন' ক্রিয়াকলাপে মেতে ওঠে। 'অর্থহীন' কথাটা আমি এই অর্থে ব্যবহার করছি যে এই ক্রিয়াকলাপের ফলাফল কল্পনাভিত্তিক। সেসব দৃশ্য দূরকল্পনা, অনুধ্যান ও বিবেচনা এই ক্রিয়াকলাপের ফসল, তার সঙ্গে পরম্পরা, যুক্তি ও বাস্তবতার কোনো মিল নেই। এই গ্যাস নিশ্বাসের সঙ্গে যাদের শরীরে ঢোকে, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক ফল হয় না। প্রত্যেকের নিজের মনে যে ধরনের জটিলতা আছে, তার নির্দিষ্ট প্রভাবেই সে আত্মহারা হয়। অন্যভাবে বলতে পারি, নিজের গোলক-ধাঁধাঁয় সে নিজেকে হারায়।

আমার ছেলে ইকোরাস্-এর ক্ষেত্রে এই জটিলতাগুলো অধিবিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত। আমার ক্ষেত্রে আমার দৃষ্টিবিভ্রম বিশাল, অগণিত ও জটিল

প্রাসাদ, সিঁড়ি ও করিডরের রূপ নেয়। আমার ছেলের দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত অনুধ্যান যেমন, আমার দৃষ্টিবিভ্রম তেমনি শেষ হয় একটা সাদা দেয়ালের মুখোমুখি রহস্যজনকভাবে। কিন্তু এই মাদক সুগন্ধিগুলোর সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ হলো কোনো মানুষ কিছুদিন এগুলোর ঘ্রাণ নিলে তার পক্ষে এগুলো অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। শরীর এমন মন দুইই এই খারাপ নেশার স্বাদ খোঁজে। নেশা না পেলে বাস্তব জগতের কোনো আকর্ষণ থাকে না এবং কেউ বাস্তবের কাছে ফিরে যেতেও চায় না।

যেহেতু মিনোটরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে তোমাকে এই গোলকধাঁধার ভেতরে ঢুকতে হবে, আমি তোমাকে আগে ডেকেই সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি একা কখনোই সফল হবে না। অ্যারিয়্যাডনী সঙ্গে থাকবে। কিন্তু ও ভেতরে ঢুকবে না এবং কোনো কারণেই যেন ও ওইসব মাদক বাষ্পের ঘ্রাণ না পায়। তুমি যখন নেশায় অভিভূত হয়ে পড়বে, ও যেন স্বাভাবিক থাকে। নেশা হলেও তুমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে। এর ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে। তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি যথেষ্ট না হতে পারে। কারণ মাদক বাষ্প এই ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে দেবে।

তাই আমি এই পরিকল্পনার কথা ভেবেছি। অ্যারিয়্যাডনী তুমি বাঁধা থাকবে সুতো দিয়ে। কর্তব্যের নির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও স্পর্শনীয় যোগসূত্র দিয়ে। সুতো তোমাকে সাহায্য করবে, তোমাকে বাধ্য করবে অ্যারিয়্যাডনীর কাছে ফিরে যেতে।

গোলকধাঁধার আকর্ষণ, অচেনার হাতছানি, তোমার দুঃসাহসের সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা—সবকিছু সত্বেও তুমি কোনো কারণে সুতো ছিঁড়ো না। তুমি ওর কাছে ফিরে যেও। নইলে সবকিছু এবং ভালো যা কিছু সবই হারাবে।

ওই সুতোটাই হবে তোমার অতীতের সঙ্গে তোমার যোগসূত্র। অতীতের কাছে, নিজের কাছে ফিরে যাও। কারণ শূণ্য থেকে কোনো কিছুই শুরু হয় না। তোমার অতীত থেকে এবং তোমার বর্তমান থেকেই তোমার ভবিষ্যত জন্ম নিতে পারে।

যদি তোমার ব্যাপারে আমার আগ্রহ না থাকতো, আমি এসব আরও সংক্ষেপে বলতাম। কিন্তু নিয়তির সঙ্গে সাক্ষাতে যাওয়ার আগে তুমি আমার ছেলে ইকেরাসের কথা শুনে যাও। ওর কথা শুনলে তুমি কি ধরনের বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছো, তা তোমার সামনে ছবির মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যদিও আমার সাহায্যে আমার ছেলে ইকোরাসের পক্ষে গোলকধাঁধার ডাইনী-জাল থেকে পালিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল, ওর মন আজও গোলকধাঁধার

অশুভ প্রভাবের দাস।

ছোট্ট একটা দরজার সামনে গিয়ে রঙ-করা পর্দাটা তুলে জোরাল গলায় হাঁক দেয় ডিডেলাস্—

'ইকেরাস, আমার প্রিয় পুত্র, বাইরে এসে তোমার কষ্টের কথা আমাদের বলো। কিম্বা বরং যা ভাবছো, তাই চেঁচিয়ে বলো। একা থাকলে তুমি যেমন করো। আমার বা আমার অতিথির দিকে নজরে হবে না। ধরে নাও, এখানে আমরা কেউ নেই।'

আট

আমি দেখলাম, আমারই বয়সেরই এক যুবক, আধো-অন্ধকারে তাকে অপূর্ব সুন্দর মনে হলো। মাথায় হাল্কা রঙের লম্বা চুল। চুলের গুচ্ছগুলো কাঁধে এসে পড়েছে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও বিশেষ কিছুর দিকে চেয়ে নেই। কোমর অবধি খোলা, কোমরে আঁটসাঁট ও ধাতুর তৈরী বেল্ট। চামড়া ও কালো কাপড়ের ফালি ল্যাঙটের মতো করে অদ্ভুত ধরনের গিঁট দিয়ে বাঁধা, তাতে উরু দুটোর ওপরের অংশই ঢাকা পড়েছে। তার পায়ে সাদা চামড়ার বুটজোড়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

মনে হলো, ও বাইরে কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু আসলে গতিটা শুধু ওর মনের। ও আমাদের দেখতেও পায়নি বলে মনে হল। নিজের অবিচ্ছিন্ন বিতর্কমূলক চিন্তাধারা অনুসরণ করে ইকেরাস বলে চলেছে ঃ

'এই পৃথিবীতে কে প্রথম এসেছিল? পুরুষ না নারী? তবে কি স্রষ্টা আসলে এক রমণী? বিচিত্র ও অসংখ্য প্রাণীরা, তোমরা কোন মহাজননীর গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছ? এবং উপাদানের কোন সেই মাতৃজঠর মাহাত্ম্য পেয়েছিল। সৃষ্টির দ্বৈতবাদ অনস্বীকার্য্য। সেক্ষেত্রে ঈশ্বর সেই মহাজননীর সন্তান। আমার মন ঈশ্বরকে ভাগ করতে চায় না। যেখানে বিভাজন, সেখানেই সংঘর্ষ। বহু দেবতার অস্তিত্ব মানেই দেবতার যুদ্ধ। বহু দেবতা কখনো ছিল না। ঈশ্বর এক ও অনন্য। ঈশ্বরের আলয় শান্তির নীড়। সবকিছুই সেখানে অভিনিবিষ্ট হয়। বিরুদ্ধ বস্তুর সমন্বয় সে মহান অস্তিত্বের গভীর।' একটু সময় চুপ করে থাকে ইকেরাস্। তারপর আবার বলে ঃ

'কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি সরলতা, স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার প্রতীক হলেও জীবন এতো জটিল কেন? এতো গোলযোগ এবং এতো সংঘর্ষের যুক্তি কি? এসব কিসের দিকে চলেছে? এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায়? কেন আমরা সবকিছুর যুক্তি খুঁজি? ঈশ্বর ছাড়া আমর কোনদিকে আমরা মুখ ফেরাতে পারি? কিভাবে আমরা আমাদের পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ

করবো? আমরা কোথায় থামবো?

কখন আমরা বলতে পারবো ঃ তাই হোক, আর কিছু করার নেই। মানুষ থেকে শুরু করে কিভাবে আমরা ঈশ্বরে উপনীত হতে পারি? এবং ঈশ্বর থেকে শুরু করলে কিভাবে আমি নিজের কাছে পৌঁছুবো? মানুষ যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়, তবে ঈশ্বরও কি মানুষের সৃষ্টি নয়? এইসব নানা পথ যেখান থেকে শুরু হয়ে নানা দিকে গেছে, সেই কেন্দ্রীয় বিন্দু খুঁজে ফিরছে আমার মন।'

কথা বলতে বলতে ইকেরাসের কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে। তার কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে যায়। আধো-আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার মনে হয়, দারুণ পরিশ্রম করে ইকেরাস যেন হাঁফাচ্ছে।

সে বলছে—

'ঈশ্বরের কোথায় সূচনা, আমি জানি না। কেথায় তাঁর সমাপ্তি, সে বিষয়ে আরও কম জানি। নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হলে আমার বলা উচিত যে ঈশ্বরের সূচনার সমাপ্তি নেই। তাই কিছু কিছু শব্দ আমাকে মন্ত্রণা দেয়। যেমন 'অতএব', 'যেহেতু' এবং 'এই কারণ'। উৎপত্তি এবং অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত আমার অসহনীয় মনে হয়। দুটি বাক্য থেকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুন্দরতম যুক্তি বা ন্যায়শাস্ত্র থেকে আমি এমন কিছু শিখিনা, যা আমি নিজে প্রথমে প্রয়োগ করি নি। ঈশ্বরকে আমি সূচনায় রাখি। তাই পরিসমাপ্তিতেও ঈশ্বর থাকেন।

আমি যদি তাঁকে সূচনায় না রাখি, সমাপ্তিতে তাঁকে আমি খুঁজে পাই না। আমি যুক্তির প্রত্যেকটি পথে ঘুরেছি! আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে হয়। তার চেয়ে পাখীর মত ডানা মেলে উড়ে যাওয়া ভালো, নিজের ছায়া থেকে দূরে যাওয়া ভালো, শরীরের গ্লানি থেকে দূরান্তে যাওয়া ভালো এবং অতীতের গুরুভার থেকে মুক্ত হওয়া অনেক ভালো। অনন্ত অসীম আমাকে ডাক দিয়েছে।

আমি এমন একটা অনুভূতির স্বাদ পাই যেন খুব উঁচু জায়গা থেকে আমাকে কেউ ওপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হে মানবমন, আমি তোমার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবো। আমার বাবা যন্ত্র বিজ্ঞানে অসাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে আমাকে আকাশে ভাসার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। আমি একা শুন্যে ভাসবো। আমি, ভয় পাই না। আমি এই দুঃসাহসের মূল্য দেবো এই আমার মুক্তির একমাত্র পথ। হে সহ্য মানবমন, সমস্যার জটিলতার দীর্ঘদিন বাঁধা থাকলেও নতুন এক পথ তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আমাকে কে ডাক দিয়েছে আমি বোঝাতে পারবো না। কিন্তু আমি জানি, আমার যাত্রার

একটাই সমাপ্তি। সেই সমাপ্তি ঃ ঈশ্বর।'

........তারপর ইকেরাস আমাদের ফেলে রেখে পেছনে সরে যায়, পর্দাটা তোলে ও ঘরের ভেতরে মিলিয়ে যায়।

'ছেলেটা হতভাগ্য।'

ডিডেলাস বলে।

যেহেতু ও ভেবেছিল যে ও কোনদিনই গোলকধাঁধাঁ থেকে পালাতে পারবে না এবং যেহেতু ও বোঝেনি যে এই গোলকধাঁধাঁ আসলে ওর নিজের অস্তিত্বের অন্তরালে লুকিয়ে আছে, ওর অনুরোধে আমি ওকে এক জোড়া ডানা তৈরী করে দিয়েছিলাম, যার সাহায্যে ও হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে, ওর মনে হয়েছিল, ওর সব পার্থিব পথের গতি রুদ্ধ এবং একমাত্র আকাশ পথেই ওর মুক্তি। আমি জানতাম, অধ্যাত্মবাদে ওর আসক্তি আছে। তাই ওর এই আকাঙ্খায় আমি আশ্চর্য হইনি। ওর কথা শুনেই তুমি সম্ভবতঃ তা বুঝেছো। আমি সাবধান করে দেওয়া স্বত্তেও খুব উঁচুতে উড়তে যেয়ে নিজের শক্তির সীমা লঙ্ঘন করেছিল। ও সমুদ্রে পড়ে গিয়েছিল। ও মরে গেছে।'

'তা কি করে হয়?'

আমি চেঁচিয়ে উঠি।

'আমি তো এক মুহূর্ত আগে ওকে জীবিত দেখলাম।'

'হ্যাঁ'।

ডিডেলাস বললো।

'তুমি ওকে দেখেছো এবং ওকে দেখে তোমার মনে হয়েছে, ইকেরাস জীবিত। কিন্তু ও মৃত। থিসিয়স, আমার ভয় হয়, যদিও তুমি গ্রীক, যদিও তুমি সত্যের সূক্ষ্ম ও অন্যান্য দিক অনুধাবনে অভ্যস্ত, তোমার মেধা আমার যুক্তি বুঝতে পারবে না। কেন না এই সত্যটা বুঝতে আমারও সময় লেগেছে। আমাদের মতে যে সব মানুষের মন ও মনন চিরন্তনের মাপকাঠিতে সামান্য নয়, আমরা শুধুমাত্র দিন-যাপন আর প্রাণধারণের সাধারণ অস্তিত্বে আবদ্ধ নই। নশ্বর মানুষের চোখে সময়ের যে পরিমাপ সেই পরিমাপে আমরা বড় হয়ে উঠি, নিয়ম নির্দিষ্ট কাজ করি এবং মরে যাই। কিন্তু আরও একটা চিরন্তন সত্যের স্তর আছে, যেখানে সময়ের কোন অস্তিত্ব নেই। সেই স্তরে মানবজাতির প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিটি ক্রিয়া তার বিশেষ গুরুত্ব অনুযায়ী স্থান পায়। আমার ছেলে ইকেরাস তার জন্মের আগে এবং মৃত্যুর পরেও মানুষের আত্মিক সংকট, মানুষের উদ্ভাবনী এবং কবিতার বাঁধনহারা আকাশচারি তার প্রতিভূ। তার সংক্ষিপ্ত জীবনে সে এইসবেরই প্রতিভূ ছিল, তা সে জীবন শোধ করেছে। কিন্তু এখানেই তার সমাপ্তি নয়। বীরের জীবনে যা ঘটে ঃ

তা হলো এই যে তার ছাপ রয়ে যায়। কবিতা এবং শিল্পকলা তার কীর্তিকে নতুন জীবন দেয় এবং তার জীবন এক চিরস্থায়ী প্রতীক হয়ে ওঠে। এইভাবেই শিকারী ওরিয়ন জীবনে যেমন অজস্র শিকার করেছে, আজও সে অ্যাসফোডেলের এলিসিয়ান পথে তেমনি শিকারযাত্রায় চলেছে এবং রাত্রের আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জে তার অশ্বের প্রতীক আঁকা আছে। এইভাবে অনন্তকাল জুড়ে ট্যান্টালাসের তৃষ্ণা কাটে না এবং সিসিফাস যখন করিনথের রাজা ছিল, তখন যেমন, আজও তেমনি সে পাহাড়ী চড়াই বেয়ে ভারী পাথর চূড়ায় তুলতে চেষ্টা করে, যদিও সেই পাথর চূড়োর কাছাকাছি পৌঁছে নীচে গড়িয়ে যায়। কারণ তুমি বুঝতে পারবে যে জীবনে যে সমস্ত কাজ আমরা অসমাপ্ত রাখি মৃত্যুর পর সেই সব কাজ বারবার করতে যাওয়াই নরকের শাস্তি।

এইভাবে প্রাণীজগতে একটি প্রাণীর মৃত্যু প্রাণীজাতির মধ্যে কোন অভাব আনে না। কারণ মানবেতর প্রাণী তার স্বাভাবিক আকার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখে। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর সমাজে ব্যক্তির কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু মানুষের পৃথিবীর ব্যক্তিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই নোসোসে মিনোস জীবনের যে ধারা অনুকরণ করে চলেছে, তাই তাকে মৃত্যুর পরে নরকে বিচারকের যোগ্যতা দেবে। চাই রাণী প্যাসিফী এবং রাজকন্যা অ্যারিয়্যাডনী তাদের নিয়তি নির্দিষ্ট পথে চলেছে। এবং তুমি, থিসিয়স, তোমাকে দায়িত্বহীন মনে হয় এবং তুমি হয়তো তাই থাকতে চাও, কিন্তু হারকিউলিস এবং জ্যাসন এবং পারসিউসের মত তুমিও নিয়তির দাস। কিন্তু জেনে রাখো(আমার চোখ বর্তমানের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যতকে জানার শিল্পকলা শিখেছে)—তোমার জীবনে তোমাকে মহৎ অনেক কিছু করতে হবে এবং তাও এমন একটা ক্ষেত্রে যা তোমার অতীতের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রে থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তোমার ভবিষ্যতের পাশাপাশি দেখলে তোমার অতীতকে তখন ছেলেখেলা বলে মনে হবে। তুমি এথেনস নগরী প্রতিষ্ঠা করবে এবং সেখানে মানুষের মন ও মননের এক চূড়ান্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

সুতরাং গোলকধাঁধার গভীরে কিংবা ভয়ংকর ওই সংঘর্ষে জয়ী হবার পর তোমার প্রেমিকা অ্যারিয়্যাডনীর আলিঙ্গনে বাঁধা পড় না। কোথাও স্থির হয়ে থেকো না। আলস্যের অন্য নাম বিশ্বাসঘাতকতা। তোমার নিয়তি যেদিন তোমার মৃত্যু ডেকে আনবে তার আগে পর্য্যন্ত বিশ্রাম নিও না। কেন না এইভাবেই আপাতদৃষ্টিতে যা মৃত্যু বলে মনে হয়, তার ওপারে তুমি এক চিরন্তন জীবন পাবে, যে জীবন তোমাকে উপহার দেবে কৃতজ্ঞ মানবজাতি। কখনও স্থির হয়ে, স্থানু হয়ে থেকো না। সামনের দিকে চলতে থাকো। হে বীর তোমার সঞ্চয় মন মনন ও জীবনের অজস্র নগরী তুমি তোমার আপন

পথ ধরে চলো।

এবং এখন আমি যা বলছি, যত্নের সঙ্গে শোনো ও মনে রাখার চেষ্টা করো। মিনোটরকে তুমি সহজেই যুদ্ধে হারাবে। সঠিকভাবে ভাবতে গেলে, লোকে যতোটা বলে, দানব ততোটা শক্তিশালী নয়। লোকে বলে, সে নিহত প্রাণীর মাংস খায়। কিন্তু ষাঁড় ঘাস ছাড়া কবে কি খেয়েছে? গোলকধাঁধাঁয় ঢোকা খুব সহজ, বের হওয়া খুবই শক্ত। পথ না হারালে গোলকধাঁধাঁয় ঢোকা যায়না। ওখানকার মেঝেয় পায়ের ছাপ পড়ে না। সুতরাং ফিরে আসার জন্যে তুমি অ্যারিয়্যাডনীর সঙ্গে সুতোয় বাঁধা থাকবে। আমি অনেকগুলো রীল সুতো তৈরী করেছি। ভেতরে যেতে যেতে তুমি সুতো ছাড়বে এবং একটা রীল ফুরিয়ে গেলে আর একটা রীল তার সঙ্গে বেঁধে নেবে যেন যোগাযোগের সূত্র কখনও বিচ্ছিন্ন না হয়। ফিরে আসার সময় তুমি সুতো গোটাতে গোটাতে থাকবে যতোক্ষণ না তুমি সুতোর প্রান্তে অ্যারিয়্যাডনীর কাছে এসে পৌঁছোয়। আমি জানি না, এ ব্যাপারে আমি কেন তোমাকে এতো সাবধান করে দিচ্ছি। সুতোয় শেষ ইঞ্চি পর্য্যন্ত গোলকধাঁধাঁ থেকে বাইরে যাবার ইচ্ছেটা বাঁচিয়ে রাখা সবচেয়ে শক্ত। কারণ মাদক বাষ্প তোমার স্মৃতিশক্তিকে আচ্ছন্ন করবে এবং তোমার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা তোমার ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করবে। এসব আমি তোমাকে আগেই বলেছি। আমার নতুন কিছু বলার নেই। সুতোর রীলগুলো নাও। বিদায়।'

ডিডেলারকে বিদায় জানিয়ে আমি অ্যারিয়্যাডনীর কাছে ফিরে এলাম।

নয়

ওই সুতোর রীলগুলো নিয়েই অ্যারিয়্যাডনীর সঙ্গে আমার প্রথম বিরোধ বাঁধলো। সে চাইছিল, সুতোর রীলগুলো তার কাছে থাক, ওগুলো খোলা ও গুটানো মেয়েদের কাজ, একাজে তার যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে এবং এইসব ঝামেলা থেকে সে আমাকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু আসলে সে আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছিল। আমি কিছুতেই তাতে রাজী হতে পারিনি। তাছাড়া, আমার সঙ্গেই ছিল, অ্যাডিয়্যাডনী সুতো ছাড়তে অনিচ্ছা দেখাতে পারে। কারণ যতোই সে সুতো না ছাড়তে পারে কিম্বা সুতো গুটিয়ে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমি যত দূরে যেতে চাই, যেতে পারবো না। আমি কিছুতেই রাজী হলাম না। মেয়েমানুষের শেষ অস্ত্র কান্নার বান ডাকানো। তাও প্রয়োগ করালো অ্যারিয়্যাডনী। কিন্তু আমি জানতাম, মেয়েমানুষের হাতে যদি কেউ একটা আঙুল ছেড়ে দেয়, সে গোটা হাতটা, তারপর পুরুষের সারা দেহটাই

কব্জা করতে চাইবে। সূতোট লিনেন বা পশমের ছিল না। ডিডেলাস অজানা কোন ধাতু দিয়ে ওটা তৈরী করেছিল এবং আমি তরোয়াল দিয়েও ওটা কাটতে পারিনি। তরোয়ালটা আমি অ্যারিয়্যাডনীর কাছে রেখে গেলাম। কারণ মানুষের বাহুবলের চেয়ে যন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আমার অতীতের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারে অস্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে ডিডেলাস যা বলেছিল, তারপর শুধুমাত্র বাহুবলে দানব মিনোটরকে হারাতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমি অ্যারিয়্যাডনীকে বললাম, সে যেন গোলকধাঁধার গেট ছেড়ে কোন কারণেই ভেতরে না ঢোকে। অ্যারিয়্যাডনী নিজের হাতে আমার মনিবন্ধে সূতো বেঁধে বললো, এটা নাকি প্রেমের বাঁধন এবং তারপর সে দীর্ঘসময় ধরে আটার মত আমার ঠোঁটে ঠোঁট এঁটে রাখলো, যদিও আমি ভেতরে ঢোকার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

যে তেরোজন যুবক যুবতী আমার সঙ্গী ছিল, তারা আগেই ভেতরে ঢুকেছিল। প্রথম বড় ঘরটা মাদক ধোঁয়ায় ভরা। সেখানে ওদের সঙ্গে দেখা হল। এরই মধ্যে ওদের নেশা ধরেছে। ওদের মধ্যে আমার বন্ধু পিরিথৌসও ছিল।

আমার আগেই বলা উচিত ছিল, সূতোর রীলের সঙ্গে ডিডেসাস আমাকে মাদক ধোঁয়ার প্রতিষেধক ওষুধে ভেজানো একটা ন্যাকড়া দিয়েছিল ও ওটা আমায় নাকেমুখে জড়িয়ে রাখতে বারবার বলেছিল। ওটার জন্য নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলেও মাদক ধোঁয়ার প্রভাব কাটিয়ে আমি মাথাটা সাফ রাখতে পেরেছিলাম।

সূতো ছাড়তে ছাড়তে আমি তিনটে অন্ধকার পার হয়ে একটা দরজার সামনে পৌঁছুলাম। আমার হাত দরজার হ্যাণ্ডেলে লাগলো। দরজার সামনের পৌঁছুলাম। দরজা খুলতেই রোদের ঝকমকে আলো। আমার সামনে বাটারকাপ, প্যানিসি, টিউলিপ ও কারনেশন, ফুলের মধ্যে বাগানে ঘুমিয়ে আছে মিনোটর। তখুনি ওকে খতম করা উচিৎ হলেও আমি থেমে গেলাম। ওকে অদ্ভুৎ সুন্দর দেখাচ্ছিল। অর্ধাঙ্গে মানবদেহ ও অর্ধাঙ্গে অদেহধারী সেন্টর-দের ক্ষেত্রে যেমন হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি দানবের শরীরে ও পশুর আশ্চর্য্য এক সম্মিলন। আমি খানিকক্ষণ চুপচাপ দেখলাম। তারপর ও একটা চোখ খুলতে বোঝা গেল, ও নির্বোধ এবং এবার কাজটা আমার শেষ করা উচিত......।।

তারপর আমি কি করছিলাম, ঠিক কি ঘটেছিল আমার সঠিক মনে নেই। নাকেমুখে ন্যাকড়াটা মুখোসের মতো বাঁধা থাকা সত্ত্বেও প্রথম ঘরে বেশ কিছুটা মাদক বাষ্প আমার স্নায়ুকে কিছুটা আচ্ছন্ন করেছিল। ফলে আমার স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক ছিল না। তা সত্ত্বেও যদি আমি মিনোটরকে হারিয়ে থাকি,

সেই জয়ের স্মৃতি আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। অভিজ্ঞতাটা ইন্দ্রিয়সুখবর্ধক ছিল, এইটুকু বলতে পারি। বাগানে কয়েকটা মুহূর্ত স্বপ্নের মতো মনে হলেও এবং জায়গাটা ছেড়ে যেতে অনিচ্ছা হলেও মিনোটরকে খতম করার পর সূতো গোটাতে গোটাতে প্রথম ঘরে ফিরে গিয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখলাম, কে কিভাবে যেন ওদের অনেক খাদ্য পাণীয় পরিবেশন করেছে। ওরা খাচ্ছে, মদ গিলছে, প্রেম করছে, উন্মাদের মতো চেঁচাচ্ছে। আমি ওদের মুক্তি দিতে এসেছি বলায় ওরা চেঁচালো, 'কিসের থেকে মুক্তি?' এবং হঠাৎ সবাই মিলে আমায় গালাগাল দিতে সুরু করলো। আমার বন্ধু পিরিথৌস যখন আমায় চিনতেই পারলো না এবং সাফ বলে দিলো যে পৃথিবীর সব সম্মানের বিনিময়েও বর্তমানের আনন্দ ছেড়ে যেতে তৈরী নয়, আমি খুবই দুঃখ পেলাম। যেহেতু ডিভেলাস আগেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, আমি ওকে দোষ দিতে পারি নি। আমি জানতাম, সাবধান না হলে আমারও ওদের মতো অবস্থাই হতো। ওদের ঘুঁসি মেরে, লাফি মেরে জোর করে ওদের আমার সঙ্গে নিয়ে এলাম।

মদের নেশায় বুঁদ হওয়ায় ওদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। গোলকধাঁধার বাইরে এসে আস্তে আস্তে এবং যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়কভাব ওরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলো। পরে ওরা আমাকে বলেছিল, ওদের মনে হচ্ছে, ওরা যেন সুখের চূড়া থেকে এক অন্ধকার ও সরু গলির মধ্যে নেমে এসেছে। ওরা প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে আবার তৈরী করে নিল সেই কারাগার, যা মানুষকে নিজের মতো পরিণত করে এবং যার থেকে কোনো মানুষের মুক্তি নেই। শুধু আমার বন্ধু পিরিথৌস তার মুহূর্তের পতনের জন্যে সত্যিই লজ্জিত হয়েছিল এবং সাহস ও বন্ধুত্বের আতিশয্য দেখিয়ে সে আমার ও নিজের চোখে তার মূল্য ফিরে পেতে চাইলো। অনতিকল পরেই সে বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাবার সুযোগ পেলো।

দশ

বন্ধুর কাছ থেকে আমি কিছুই লুকোইনি। অ্যারিয়্যাডনীর জন্যে আমার কামনা এবং সেই কামনা যে ক্রমশঃ ফুরিয়ে যাচ্ছে, আমি বলেছিলাম। অ্যারিয়্যাডনীর বোন ফেড্রা বয়সে ছোট হলেও তাকেও যে আমার বেশী ভালো লেগেছে, তাও বলেছি। দুটো পাম গাছে দোলনা ঝুলিয়ে যখন দোলনায় দুলতো ফেড্রা। তার খাটোঝুল স্কার্ট, হাওয়ায় ওপরে উঠে যেতো। আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসতো। কিন্তু এই দৃশ্যে অ্যারিয়্যাডনী দেখা দিলেই

আমি বড় বোনের ঈর্ষা জাগবার ভয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হতাম। তাহলেও এ ধরনের ব্যর্থ যৌন অভিলাষ স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু ফেড্রাকে চুরি করে নিয়ে যেতে হলে কোনো একটা প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে। এ ব্যাপারে পিরিথৌসের উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত প্ল্যান আমার বিষয়ে কাজে এলো। অ্যারিয়্যাডনী এবং আমি দুজনেই এই দ্বীপ ছেড়ে যেতে ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু অ্যারিয়্যাডনী যা জানতো না, তা হলে। ফেড্রাকে সংঙ্গে না নিয়ে আমি যাবো না। পিরিথৌস তা জানতো এবং সে আমাকে সাহায্য করেছিল।

আমার চেয়ে তার স্বাধীনতা বেশী ছিল। অ্যারিয়্যাডনী আমার পায়ে শৃঙ্খলের মতো এঁটে থাকতো। পিরিথৌস প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিল।

একদিন সকালে পিরিথৌস আমাকে বললো—

মিনোস এবং র‍্যাডাম্যানথাস। এই দুই আদর্শ আইন প্রণেতা ক্রীটের অধিবাসীদের নৈতিক জীবনের সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের সময় পায়ু মৈথুনের ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ক্রীটবাসীরা পায়ু মৈথুনে অভ্যস্থ এবং তাদের সংস্কৃতিতে সমকামিতার প্রভাব আছে। সুতরাং বয়ঃসন্ধিকালে কোনো পুরুষ যদি কোনো বয়স্ক পুরুষের সমকামিতার সঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত না হয়, তার নাম থাকে না। মিনোসের ছেলে গ্ল্যকাস, যে দেখতে ঠিক ফেড্রার মতোই, এ ব্যাপারে তার দুশ্চিন্তার কথা আমাকে জানিয়েছে। আমি তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে রাজপুত্র বলেই কেউ তার সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক গড়ে তুলছে না। সে বললো, এটা সত্যি হলেও দুঃখের কথা কারণ ছেলের কোনো পুরুষ বন্ধু নেই বলে রাজা মিনোসেরও খুব দুঃখ। যদিও এসব ব্যাপারে বংশমর্য্যাদাকে মিনোস খুব গুরুত্ব দেয় না, তোমার মতো এক বিখ্যাত রাজুপত্র যদি মিনোসের ছেলের ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়, মিনোস খুবই খুশীই হবে। অ্যারিয়াডনী বোনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত হলেও ভাইয়ের সঙ্গে তোমার সমকামিতার ব্যাপারে ঈর্ষা দেখালো কারণ কোনো পুরুষ কোনো অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক গড়ে তুললে মেয়েমানুষ ব্যাপারটাতে গুরুত্ব দেয় না।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললাম—

'যদিও আমি গ্রীক, সমকামিতার ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।' এ ব্যাপারে হারকিউলিসের সঙ্গে আমার তফাৎ আছে। হাইলাসের সঙ্গে তার সমকামিতার কথা আমি জানি। তাতে আমার লোভ নেই। গ্ল্যকাস তার বোন ফেড্রার মতে দেখতে হলেও আমি ফেড্রাকেই চাই গ্ল্যাকাসকে নয়।'

'অ্যারিয়্যাডনীকে ঠকাবার জন্যে এমন ভাব করতে হবে যেন তুমি

গ্ল্যাকাসকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো, ফেড্রাকে নয়। মিনোস এই দ্বীপে একটা প্রথা চালু করেছে। অল্পবয়স্ক ছেলের ওপরে বয়স্ক পুরুষের লোভ থাকলে বয়স্ক প্রেমিক প্রথমে তার সমকামিতার সাথীকে নিজের বাড়ীতে দু'মাস রাখবে এবং দু'মাস পরে অল্পবয়স্ক সঙ্গী জানাবে, বয়স্ক প্রেমিক তার পছন্দ কি না বা তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে কি না। সুতরাং গ্ল্যাকাসকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে হলে জাহাজেই নিয়ে যেতে হবে। মিনোস যদি জানে যে তুমি তার ছেলে গ্ল্যাকাসকে নিয়ে যাচ্ছো, মেয়ে ফেড্রাকে নয়, সে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু ফেড্রা রাজী আছে তো?'

'অ্যারিয়্যাডনী কখনো আমাকে তার বোনের সঙ্গে একা থাকার সুযোগ দেয় না। তাবে ফেড্রা যখন বুঝবে যে আমি ওকে ওর দিদির চেয়ে বেশী পছন্দ করি, ও নিশ্চয়ই রাজী হবে।

.....প্রথমে যদিও অ্যারিডনীকে বোঝাবার পালা। সে সহজেই রাজী হয়ে গেল। ওর ভাগ্যে কি ঘটতে চলেছে, বেচারা বুঝতেই পরে নি। গ্ল্যাকাসকে আমি সত্যিই সমকামীতার সঙ্গী হিসেবে সঙ্গে নিচ্ছি না বলায় সে আশাহত হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনায় রাজী হলো। ফেড্রাকেও সব খুলে বললো পিরিথৌস। কারণ ফেড্রাকে জোর করে জাহাজে তুলতে গেলে মেয়েটা চেঁচামেচি করতে পারে। কিন্তু ছোটরা বড়দের ঠকাতে আনন্দ পায় এবং সেই সেন্টিমেন্টটাই এক্ষেত্রে কজে লাগালো আমার বন্ধু। এক্ষেত্রে গ্লাকাস ঠকাচ্ছে তার বাবা-মাকে, ফেড্রা ঠকাচ্ছে তার বড় দিদিকে। মাথার চুল আঁটসাঁট করে বেঁধে মুখের দিকটা ঢেকে গ্ল্যাকাসের পোষাকে সাজলো ফেড্রা। তাকে গ্ল্যাকাস-এর মতোই দেখাচ্ছিল। এমন কি তার বড় দিদি অ্যারিয়ানডনীও লহমার জন্যে দেখলেও তাকে গ্ল্যাকাস বলে ভুল করতো। মিনোস আমাকে বিশ্বাস করে, আমার প্রভাব তার ছেলের পক্ষে ভালো হবে এই ধারণায় সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে এবং আমি তার অতিথি। ঠকাতে আমার ভালো লাগে নি। কিন্তু বিবেকের দংশন আমাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। কৃতজ্ঞতা এবং ভদ্রতা মৃদু কণ্ঠ কামনা সোচ্চার চীৎকারে চাপা পড়েছে। লক্ষ্য স্থির রেখে যে কোনো পথে সেই লক্ষ্যে পৌঁছুনো যুক্তিসঙ্গত। যা অবশ্যম্ভাবী, তা অবশ্যই ঘটবে।

প্রথমে জাহাজে উঠলো অ্যারিয়্যাডনী। রাতের ডিনারের পর ফেড্রা নিজের ঘরে শুতে যায় এবং সকালের আগে তার খোঁজ পড়ার সম্ভাবনা নেই। রাতের ডিনারে পর জাহাজে আনা হলো ফেড্রাকে। সমুদ্রযাত্রা শুরু হলো। ক'দিন পরেই ফেড্রার দিদি, সুন্দরী কিন্তু একঘেঁয়ে ধরনের মেয়ে অ্যারিয়্যাডনীকে আমি ন্যাক্সোসে নামিয়ে দিলাম।

আমার বাবা ঈজিয়স যখন দেখলো, জাহাজে কালো রাঙের পাল টাঙানো (পাল বদলাতে আমি ভুলে গিয়েছিলমা), সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলো। ঘটনাটার কথা আমি আগেই বলেছি। তবে একটা কথা। সমুদ্রযাত্রার শেষ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, আমি অ্যাটিকার রাজা হয়েছি। আমাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ও আমার সিংহাসনে আরোহণের আনন্দদায়ক ঘটনার সঙ্গে আমার বাবার মৃত্যুর শোকাবহ ঘটনা মিলে যাওয়ায় আমি আদেশ দিলাম আনন্দের গান ও দুঃখের গান ঐ দিনের উৎসবে পরপর শোনানো হবে। আমি ও আমার সঙ্গীরা নাচ গানে অংশ নিলাম। আনন্দ ও শোকে জনগণ একই সঙ্গে দুই চরম প্রান্তের দুটি অনুভূতির স্বাদ পাবে। এটাই আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল।

এগারো

অ্যারিয়্যাডনীর সঙ্গে আমার দুর্ব্যবহারের জন্যে অনেকেই আমাকে দোষ দিয়েছে। ওরা বলে, আমি নাকি কাপুরুষের মতো ব্যবহার করেছি। ওকে একটা দ্বীপে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হয় নি। হয়তো তাই। আমি চেয়েছিলাম, এখান থেকে ওর ও আমার মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান থাকুক। কারণ ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শিকারী ও শিকারের সম্বন্ধ। যখন ও জানতে পারলো, ওকে ঠকিয়ে ওর ছোট বোনকে আমি সঙ্গে নিয়েছি, ও চেঁচামেঁচি সুরু করে দিলো এবং আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা তুলে আমায় বকাবকি শুরু করলো। শেষে চলে গিয়ে বললাম, অ্যারিয়্যাডনীকে রেখে যাবো। ও আমাকে ভয় দেখালো, এইরকম জঘন্যভাবে তাকে ফেলে যাওয়ার বিষয়ে সে দীর্ঘ একটা কবিতা লিখবে। জবাবে আমি বললাম, সেই ভালো। যে রকম উত্তেজিত ও কাব্যিক ভাষায় অ্যারিয়্যাডনী কথা বলছিল, মনে হচ্ছিল, কবিতাটা ভালোই হবে। তাছাড়া কবিতা লেখার ব্যাপারটা ওকে সময় কাটাতে সাহায্য করবে এবং ইতিমধ্যে ও নিশ্চয়ই দুঃখের সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। কিন্তু আমার এইসব কথা শুনে ও আরও চটে গেলো। মেয়েমানুষকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলে এই রকম হয়। যে দ্বীপে ওকে রেখে গেলাম, সেটার নাম ন্যাক্সোস। একটা গল্প আছে, আমি তাকে এই দ্বীপে ছেড়ে যাবার পর দেবতা ডায়োনিসাস, (যিনি সুরার দেবতা), তিনি নাকি এই দ্বীপে এসে অ্যারিয়্যাডনীকে বিয়ে করেন। হয়তো অন্যভাবে বলতে গেলে, মদের নেশায় সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল অ্যারিয়্যায়ডনী। লোকে বলে, বিয়ের দিনে দেবতা তাকে হিফিস্টাস-এর তৈরী যে মুকুট উপহার দিয়েছিলেন, তা এখন আকাশের এক নক্ষত্রপুঞ্জ।

দেবরাজ জিউস নাকি অলিম্পাস পাহাড়ে ওকে স্বাগতম জানিয়েছিলেন। এবং ওকে অমরত্ব বর দিয়েছিলেন। অ্যারিয়্যাডনীকে নাকি দেবলোকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী আফ্রিদিতি বলে ভুল হতো। লোকে এসব বললে আপত্তি করিনি। ওকে দেবী করে যে ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি চালু হয়, সেটা আমারই চেষ্টায় এবং আমি নিজে সেই দেবীর মন্দিরে গিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে নাচতাম। একটা কথা শুধু আমি বলতে চাই। আমি যদি অ্যারিয়্যাডনীকে না ছেড়ে যেতাম, ওর এতো নামডাক কি হতে পারত?

আমার সম্বন্ধেও বেশ কিছু রূপকথা চালু আছে। রূপসী হেলেনকে চুরি করা, বন্ধু পিরিথৌসকে সঙ্গে নিয়ে নরক অরবতরণ বা পাতালের রাণী প্রসারপাইনকে ধর্ষণ-সংক্রান্ত কাহিনী। এই সব গুজবে আমি প্রতিবাদ করিনি। কারণ এতে আমার সম্মান বাড়তো অনেক সময় আমি নিজে গল্পগুলোতে রঙ চড়িয়েছি, কারণ অ্যাটিকার লোক এসব সহজেই অবিশ্বাস করে। কুসংস্কার থেকে জনগণের মুক্তি খুব ভালো জিনিষ। কিন্তু জনগণের অশ্রদ্ধা অন্য রকম ব্যাপার।

সত্যি কথা বলতে কি, এথেনস ফিরে যাওয়ার পর থেকে আমি আমার ভালোবাসার কাছে বিশ্বস্ত ছিলাম। আমি ভালবেসেছিলমা এক রমণীকে। সেই রমণী ফেড্রা। আমি ভালোবেসেছিলাম এক নগরীকে। সেই নগরী এথেনস।

কাজটা সহজ ছিল না। অ্যাটিকায় বিভিন্ন ছোট ছোট শহরের মধ্যে অনবরত সংঘাত ও সংঘর্ষ চলতো। ওদের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে আনার জন্যে আমাকে শক্তি ও বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে। আমার বাবা ঈজিয়সের ধারণা ছিল, এই ধরনের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ চলতে থাকলে তাঁর কর্তৃক অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমি দেখলাম, এই ধরনের সংঘর্ষ সাধারণ নাগরিকের স্বার্থের পরিপন্থী বেশীর ভাগ সংঘর্ষের মূলে ছিল অর্থনৈতিক অসাম্য এবং প্রত্যেকের ধনী হওয়ার চেষ্টা। আমার কাছে অর্থ বা সম্পদের কোন গুরুত্ব নেই এবং আমি অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্থ। ধনসম্পদের সমবন্টনের মাধ্যমে আমি একদিকে অর্থনৈতিক অসাম্যের এবং অন্য দিকে এই অসাম্য থেকে উদ্ভূত সংঘর্ষের অবসান ঘটিয়েছিলাম। ধনীরা এতে আমার ওপর ক্ষুব্ধ হলো আমি তাদের কয়েকজনকে ডেকে বললাম—'শুধু উদ্ভাবনী শক্তি, বাস্তব জ্ঞান বা অধ্যাবসায়ের জোরে তোমরা বড়লোক হওনি, অনেকক্ষেত্রেই সেটা সম্ভব হয়েছে অবিচার ও অত্যাচারের মাধ্যমে। ব্যক্তির গুণগত উৎকর্ষ ছাড়া অন্য কোনো মূল্যবোধে যেহেতু আমি বিশ্বাসী নই, সেহেতু ধনসম্পদের লোভ

কোনো সীমা মানে না। এবং এই অভিশপ্ত লোভ মানুষকে সুখও দেয় না, যে হেতু অর্থকে কেন্দ্র করে, তোমাদের পারস্পরিক সংঘর্ষ দেশকে দুর্বল করে তুলছে, আমি প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করে তোমাদের সম্পদ কেড়ে নেবো এবং দেশের মানুষের মধ্যে অর্থসম্পদ সমবন্টনের ব্যবস্থা করবো। আমি রাজা হলেও আমার জীবনযাত্রার মান দেশের দরিদ্রতম প্রজার মতো। নিজের জন্যে আমি শুধু চাই সেনাবাহিনী পরিচালনা ও আইনের শাসন বজায় রাখার অধিকার। আমি চাই যে আমার প্রতিবেশীরা, অ্যাটিকা কোনো স্বৈরাচারীর শাসনে নেই, সেখানে শাসন চালাচ্ছে জনগণের সরকার। দেশের প্রতেকটি মানুষ; জন্মমতে সে যাই হোক, শাসন সংক্রান্ত কাউন্সিলে বসার সমান অধিকার পাবে। যদি তোমরা স্বেচ্ছায় এতে রাজী না হও, আমি তোমাদের বাধ্য করবো। ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের রাজধানীতে এথেনস এলেই জানবে এবং দেবতাদের কাছে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, এথেনস সর্বকালের মানুষের কাছে এক চিরন্তন বিস্ময় হয়ে থাকবে।

আমার বন্ধু পিরিথৌস আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল—'সাম্য মানবজাতির পক্ষে স্বাভাবিক নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। শ্রেষ্ঠ মানুষ যদি নিকৃষ্টের ওপরে না ওঠে, যদি ঈর্ষা, অনুকরণ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা না থাকে, জনতা এক নিরাকার, পচনশীল, গতিশীল জড় বস্তুপিণ্ডের রূপ নেবে। যদি তুমি সবাইকে সমান সুযোগ দাও, গুণগত পার্থক্যের ফলে কিছু মানুষ অন্য মানুষের ওপরে উঠবেই। ফলে আবার দেখা দেবে পদদলিত জনগণের পাশাপাশি নবজাত এক অভিজাত সমাজ।'

আমি প্রবিাদ করে বলেছি—

যেহেতু নতুন সমাজে আভিজাত্যের ভিত্তি হবে গুণগত, অর্থ নয়, সুতরাং জনগণ নতুন অভিজাত গোষ্ঠির দ্বারা পদদলিত হবে না।' আমি চারিদিকে প্রচার করে দিলাম, যে কেউ এথেনসে আসতে চাইছে, কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে তাদের সবাইকে এখানে স্বাগত জানানো হবে। পরবর্তীকালে আমি এথেন্সবাসীদের মধ্যের গণগত উৎকর্ষের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ মেনে নিয়েছি। মানুষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং মাঝারি ধরণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ তার একমাত্র লক্ষ্য হবে, একথা আমি কখনও মানি নি। আমি জানি যে মানুষ স্বাধীন নয়, কখনও স্বাধীন হবে না এবং স্বাধীন হওয়া হয়তো তার পক্ষে ভালোও নয়। কিন্তু মানুষের সম্মতি ছাড়া তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। এবং যতোক্ষণ না তার মনে হবে যে সে স্বাধীন, সে সম্মতি দেবে না। মানুষ তার নিয়তিকে মেনে নিয়ে সন্তুস্ট থাক, এ আমি চাই নি। ডিডেলাস চেয়েছিল, মানুষ দেবতাদের সম্পদে

শক্তিশালী হয়ে উঠুক। আমিও প্রগতিতে বিশ্বাস করি।

পিরিথৌস আমাকে ফেড্রার দিকে আরও বেশী নজর দিতে বলতো। সে ঠিকই বলতো। কিভাবে আমার পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়েছিল এবং দেবতারা কিভাবে আমার সাফল্য ও অহঙ্কারের এক ভীষণ মূল্য আদায় করেছিলেন, তাই আমায় একবার বলতে হবে।

বারো

আমার স্ত্রী ফেড্রাকে আমি বিশ্বাস করতাম। সে দিনদিন সুন্দরী হয়ে উঠছিল। তাকে তার পরিবারের জঘন্য পরিবেশ থেকে অল্প বয়সে দূরে এনেছি বলে অমি বুঝতে পারিনি, উত্তরাধিকারসূত্রে সে তার রক্তে বয়ে নিয়ে এসেছে ব্যভিচারের বীজ।

আমার প্রথম পক্ষের ছেলে হিপ্পোলিটাস রাজসভা, পার্টি বা মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করতো না। সে ছিল অহঙ্কারী, সুন্দর, বাঁধনছাঁড়া। শিকারী কুকুরের পাল নিয়ে সে পাহাড়চূড়োয় উঠতো বন্যজন্তুদের খোঁজে সমুদ্রের ধারে সে বুনো ঘোড়াদের পোষ মানাতো।

ফেড্রা তার সৎ ছেলে হিপ্পোলিটাসকে ভালোবাসে, এটা আমার আগে থেকেই অনুমান করা উচিত ছিল। ফেড্রার সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ কম ছিল না। কিন্তু হিপ্পোলিটাস নিজেই ব্যাভিচারে আগ্রহী। আমি আমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করেছিলমা। আমি দেবতাদের কাছে। প্রার্থনা করেছিলাম, আমার নির্দোষ ছেলের ওপর প্রতিশোধ নাও। মানুষ জানে না, দেবতা যখন তার প্রার্থনা শোনেন, তার দুর্ভাগ্যই ওঁরা ডেকে আনেন। আমি আমার সন্তানকে হারিয়েছি। ফেড্রা নিজের দোষ বুঝতে পরে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু আজ আমি একা। আমার বয়স হয়েছে। থিবেস থেকে বিতাড়িত অন্ধ রাজা ওয়েদিপাউসকে কলোনাস্-এ আমি স্বাগত জানিয়েছি। দেবতারা আশীর্বাদ করেছিলেন, যে দেশে রাজা ওয়েদিপাউস সমাধিস্থ হবে, সেই দেশ দেবতার আশীর্বাদৃত হবে। ওয়েদিপাউস আমাকে বলেছিল—

'পিতৃহত্যা ও মায়ের সঙ্গে ব্যাভিচারের পাপের যে সাক্ষ্য চোখের সামনে ছিল, আমার চোখ তা দেখতে পায়নি বলে নিজের চোখ দুটোকে আমি শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি যখন চীৎকার করে বলেছিলমা, ' হে আঁধার, আমার আলো! আমি বলতে চেয়েছিলাম যে এখন আঁধারই আমার আলো। সেই মুহূর্তে আকাশের নীচে আঁধার নেমে এসে আমার মনের আকাশে জ্বলে উঠেছিল তারাদের দেওয়ালি। যে পৃথিবী

দৃষ্টির অতীত, সেই পৃথিবীটাই সত্য। যে পৃথিবী দৃষ্টির গোচর, সে শুধু মায়া। তাই অন্ধ ঋষি টিরেসিয়াস্ আমায় বলেছিল, যে মানুষ পৃথিবীকে দেখতে পায় না, সেই ঈশ্বরকে দেখতে পায়। আমি রাজা হয়েছিলমা একটি অপরাধের মাধ্যমে এবং তারপর যা কিছু হয়েছে, সব কিছুতে সেই অপরাধের ছাপ, আমার দুই ছেলে এখন রাজা হয়েছে। যেহেতু আমার মায়ের সঙ্গে ব্যাভিচারের ফলে তাদের জন্ম, তারা অভিশপ্ত এবং তাদের জঘন্য ক্রিয়াকলাপেই তাদের জন্মের পরিচয়! আমার মনে হয়, সমস্ত মানবজাতি এক আদিম পাপের জঘন্য চিহ্ন বহন করছে, যার থেকে অশুভ সব কিছুর জন্ম হয়। ঐশ্বরিক কৃপা ছাড়া মানুষ এই আদিম পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। হয়তো নিজের হাতে নিজের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়ে আমি আমার যন্ত্রণাকে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে নিয়ে যেতে চেয়েছি। হয়তো আমি অনুভব করেছিলাম, দুঃখের মহত্ব এবং বন্দীদশা থেকে মানুষকে উদ্ধার করায় দুঃখের ক্ষমতা ওয়েদিপাউসের সঙ্গে যখন আমি নিজের নিয়তির তুলনা করি আমার মনে হয়, আমি আমার নিয়তিনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছি। মানুষ, যে যাই হোক, তার গায়ে যে কোনো পাপের ছাপ থাক, শেষ পর্যন্ত তাকে মানুষের কাজ করে যেতে হবে। আমি চলে যাব। কিন্তু এথেনস নগরী থাকবে। যে নগরী আমার কাছে আমার স্ত্রী ও সন্তানের চেয়েও প্রিয়। আমি চলে যাব। কিন্তু আমার ভাবনাগুলো বেঁচে থাকবে। আমি একা। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। আমি পৃথিবীর ভালো জিনিষগুলো উপভোগ করেছি। একথা ভেবে আমি সুখী যে আমার পরে যারা আসবে, আমারই জন্যে তারা আরও ভালো এবং আরও স্বাধীন হবে, তারা নিজেদের চিনতে পারবে। আগামী দিনে যেসব মানুষ পৃথিবীতে আসবে, আমি তাদেরই কল্যাণের জন্যে কাজ করেছি। আমি বাঁচার মতো বেঁচেছি।

জন স্টেইনবেক

জন্ম ১৯৩১। দক্ষিণ বাহামার—ম্যাসিদোনা পিট অঞ্চলে। ছোটবেলা, শৈশব কেটেছে সমুদ্রপাড়ের আধা শহরটিতে। তারপর, কৈশোরের একেবারে শুরুতে চিকিৎসক বাবা ও মায়ের সঙ্গে চলে আসেন সেন্ট মরিনাল দ্বীপপুঞ্জে। মৎস ব্যবসায়ের জন্যে বিখ্যাত ছিল এই দ্বীপটি। জীবনের প্রথম ভাগটা এই সমুদ্রকে খুব কাছ থেকে দেখা—চেনা, প্রতিফলিত হয়েছে তার লেখাতেও পরবর্তী জীবনে। বারবার তার লেখায় ফিরে এসেছে সমুদ্র, তার পাড়ের মানুষজন, তাদের জীবন-যাত্রা, মৎসজীবীরা, মাছ সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলো, ইত্যাদি।

সেন্ট মরিনাল দ্বীপে পাঁচ বছর কাটানোর অভিজ্ঞতাই কি ফুটে উঠেছে—বর্ণিত হয়েছে 'ক্যানেরী রো' উপন্যাসে? হয়ত তাই।

তার বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে, 'ক্যানেরী রো' ছাড়াও আছে 'দা প্রাউ সিডস', 'অফ মাইস অ্যান্ড মেন', 'দা কাফ', 'ওম্যান অন দা হোয়াইট বোট' ইত্যাদি। স্টেইনবেকের গদ্য রীতি একটু অনন্য। সোজা সরল ভাবে গল্প বর্ণনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তার উপন্যাসে, লেখনভঙ্গীতে স্পষ্ট জটিলতা। গদ্যভঙ্গীতে বিমূর্ত্ততার শিল্প। হয়ত এই জটিল রহস্যের মত ভাষা ব্যবহারে তিনি মানবমনের জটিল আবছায়াগুলো, অবচেতনের অন্ধকার জটিলতার রহস্যকে উম্মোচন করতে চাইছেন।

অনন্য এই লেখন ভঙ্গী তাকে এনে দিয়েছিল ১৯৬১ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার।

ক্যানেরী রো

প্রাক কথন

মনটেরি, ক্যালিফোর্নিয়ার,—ক্যানেরী রো। আহ, এক কবিতা। তীব্রতর (দুঃ) গন্ধ। তুমুল কোলাহল উদ্দামতা সূর্যের প্রখরতর রশ্মিকিরণ। এক নির্ধারিত-ছন্দ ভাঙ্গা শব্দ ঢেউ। অভ্যাস। স্মৃতিমেদুরতা। নিঝুম ঘুম জারিত গহন স্বপ্ন। ক্যানেরী রো, সংহত এবং বিশৃঙ্খল। একত্রিত অথচ ব্যপ্ত। লোহা, জং, টিন, ভাঙ্গা-টুকরো কাঠ, যত রাজ্যের জঞ্জাল। টিনবদ্ধ মার্কিন মাছের পরিত্যক্ত 'স্যান' রাশি।। রেস্টোরেন্ট। বেশ্যা পল্লী, ভীড়াক্রান্ত মুদী দোকান, ছোট্ট, মশলার তীব্র গন্ধতে নাকে জ্বালা ধরা। ল্যাবরেটরী। সিনেমা ঘর। এবং এই শহরের বাসিন্দারা। আহ, সে কি সব চরিত্র যে সব, এক-একজন। সেই লোকটা, এই শহরেরই এক বাসিন্দা, সামান্য মাত্রায় বেশি পানাক্রান্ত সেই অধিবাসীটি, পানশালায় বসে এই শহর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিল, তার ভাষায় বললে—'বেশ্যা, দালাল, মাতাল, জুয়াড়ী, এবং বাকিগুলো বেজন্মা, কুত্তীর বাচ্ছা।' যদিও, এ শহরের সবাই তাই ভাবেনা। তারা অন্য একটা দরজার চাবির ফুটো দিয়ে উঁকি মারে জীবনের প্রতি। এবং সেইসব মানুষকে প্রশ্ন করলে, তারা নির্ঘাৎ বলবে, এই শহরটা হচ্ছে 'যাজক, সন্ন্যাসীনি, ধর্ম অবতারদের। জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ তো, মানুষে-মানুষে, থাকেই। তাই না? একই ঘটনার ভিন্নতর ব্যাখাও, দুজনের ক্ষেত্রে, লক্ষ্য করা যায়।

সকালে, সার্ডিন-শিকারীরা যখন কোন 'বড়' শিকার ধরে, পকেট ভরা টাকা নিয়ে তারা সমুদ্রপাড় ধরে ভীড় করে ঘুরে বেড়ায়, আপন মনে উচ্চস্বরে শিস দিতে দিতে। নৌকো গুলো, গভীর সমুদ্র জলোচ্ছাসের সঙ্গে যুদ্ধ ক্লান্ত, পাড়ে-জলের কিনারায় শান্ত ছেলের মত শুয়ে থাকে, বাঁধা অবস্থায়। এইসব মৎস্য শিকারীদের কাছে সমুদ্রটা, আসলে যেন এক প্রতীক—ইঙ্গিতবহতা। টিনবদ্ধ, ক্যানবদ্ধ, মাছ। সার্ডিন। সমুদ্র থেকে প্রতি নিয়ত যেন এই ইঙ্গিতময়তা আবির্ভূত হচ্ছে। অবশ্যই, অতি অবশ্যই, মেট্রাফোরিক্যালি এবং দৃশ্যটা, দৃশ্যগতভাবে মোটেই সুখপ্রদ নয়, বরং, কিছুটা আতঙ্কবহ। অতঃপর, সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দটা ছড়িয়ে পড়ে। এবং পুরুষ নারীর দল, পোষাকের মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিগত

শরীরটাকে গুছিয়ে ভরে নিয়ে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করে। কাজে যাবার জন্যে। ঝকঝকে চকচকে গাড়ীগুলো, তখন স্পষ্টতই একটা শ্রেণী বৈষম্য তৈরি করে। সুপারিটেনডেন্টস, ক্যাশিয়ার, ক্লার্ক, মালিক-রা সবাই, যে যার অফিসে হাজির হয়। অন্য দিকে, নিম্নতর-পিছড়ে বর্গের পোলক, চীনে, ইত্যাদিরা। তারা হাজির হয়, মাছ খামারে। বেছে, পরিষ্কার করে, কেটেকুটে (কখনো রান্না করে মশলা বার করে অথবা নেহাত সেদ্ধ করেও) 'ক্যান' বন্দী করতে, মাছগুলোকে। সমূদ্র পাড়ের রাস্তাগুলো উচ্ছ্বসিত, কোলাহল মুখর হয়ে ওঠে, যখন, যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল তারা ফিরে আসে। রূপালীরঙের ঢল নামে বিস্তীর্ণ সমূদ্র পাড় জুড়ে। মাছগুলোকে নৌকোর খোল থেকে বের করে জড়ো করা হতে থাকে। নৌকোগুলোও ভারমুক্ত হতে থাকে, জলের ওপর একটু-একটু করে ভেসে উঠতে থাকে। যতক্ষণ না শেষ মাছটি খোলের বাইরে চলে আসছে, ততক্ষণ এই কর্মশৃঙ্খল জারি থাকে।

ক্যানেরী রো-এর প্রাত্যহিক দৈনন্দিনতায় ছড়িয়ে থাকে এই একই ছন্দ, সুর। লি চং-এর মুদী দোকানটাকে হয়ত পরিপাট্যের দেখনদারীর হিসেবে আদর্শ বলা যাবেনা। কিন্তু এতে অফুরন্ত মজুত থাকে। ছোট্ট সর্বদা ভীড়াক্রান্ত, অথচ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে। মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর মধ্যে যা কিছু প্রয়োজন, হাত বাড়ালেই—চোখের নিমেষে, এই ছাদের নীচে পাওয়া যায়। নিশ্চিত ভাবেই। জামা থেকে বোমা। রেশমী বাহারী জাপানী কিমোনো থেকে রাবারের চপ্পল। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে দোকান খুলে যায়। আর দরজা বন্ধ হয়, শহরের শেষতম মানুষটিরও চাহিদা, সম্ভবত, পূর্ণ হবার পর। তা বলে, লি চঙকে টাকার খাঁইওয়ালা মানুষ ভাবা উচিত হবে না। না, সে তা নয়, নিশ্চিত ভাবেই। কিন্তু কেউ তার দোকানে টাকা খরচ করতে চাইলে, সর্বদাই লি স্বাগত জানায়। আবার, বিপদে-আপদে কেউ যদি ধার চাইতে আসে, লি তাকে বিফল মনোরথ করেনা। দীর্ঘ বছর গুলো ধরেই, ক্যানেরী রো-এর মানুষেরা তার থেকে নগদে এবং মালপত্রে উধার পেয়ে থাকে। টাকা পয়সার জন্যে লি তার গ্রাহকদের চাপ দেয়না। তবে, ধারের অঙ্কটা বাড়াবাড়ি রকমের অস্বাভাবিক বড় হয়ে উঠলে, লি মাল দেওয়া বন্ধ করে দেয়, বাধ্য হয়েই।

লি-এর মুখটা গোলাকার, সাহসী-কঠোর অভিব্যক্তিময়। লি সরল ইংরেজীতে কথা বলে, অন্যদের মত 'র'-এর বাহুল্য নেই তার চীনে-ইংরেজীতে। টঙ যুদ্ধ'র সময়, ক্যালিফোর্নিয়াতে, লি-র মাথার দাম ঘোষিত হয়েছিল। সেই সময় গোপনে—লুকিয়ে কানফ্রানসিসকোতে চলে গিয়েছিল সে। মাথা গোঁজবার—লুকিয়ে থাকবার সেরা আশ্রয় হিসেবে একটা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল।

যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক, শান্ত হয়েছিল। সে যাইহোক, সে অন্য ঘটনা। বাস্তব যেটা, লি-এর নিজস্ব একটা পরিচিতি আছে। শহরের মানুষদের, প্রতিবেশীদের কাছে চোখে, তার একটা সম্মান প্রতিপত্তি গড়ে উঠেছে। গ্রাহকদের সে বিশ্বাস করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা কেউ না করে করছে। মাঝে, মাঝে ভুল অবশ্য তারও হয়। কখনো ব্যবসায়িক ভুল, কখনো বা মানুষ চিনতে বা চরিত্র বুঝতে ভুল। সেটুকু বাদ দিলে, সব মিলিয়েই ব্যবসাটাকে সে ভালই চালাচ্ছে। দোকানে, সিগারেট কাউন্টারের পেছনে লি বসে। সেটাই তার জায়গা। ওর বাঁ পাশেই থাকে টাকা পয়সা দেবার কাউন্টার। সারা দোকানের অন্য কাউন্টার গুলোয় ছড়িয়ে থাকে ওর ভাইপো-ভাগ্নে-বোনপোরা। নিজের জায়গায় বসে লি সারা দোকানটায় নজর রাখে। ওর মোটা মোটা আঙুলগুলো কাউন্টারের কাঠের ডেস্কে বিরামহীন—অকারনে, নড়েচড়ে-ছুটে বেড়ায় ব্যস্ত ভঙ্গীতে। সেই আঙুলগুলোর একটায়, ওর একমাত্র অলঙ্কার, বিয়ের আংটিটা। সেখানে বসে, বাইফোকাল চশমার আড়ালের বুদ্ধিদীপ্ত ধূসর চোখদুটো দিয়ে সে নজর বুলিয়ে চলে গোটা দোকানটার ওপর। আর চেনা জানা কোন খদ্দেরের প্রতি নজর পড়লে পূর্ণ সৌজন্যের হাসিটা যখন দেয়—ঝলসে ওঠে সোনায় বাঁধানো দাঁতটা। নজর চালানো, সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার কাজটা সারতে-সারতেই, সে সারাদিনের বিক্রি-বাট্টা, লাভ-ক্ষতি, কমিশন রোজগারের হিসেব কষে চলে অব্যর্থ ভাবে।

সেরকমই এক সন্ধ্যায় নিজের জায়গায় বসেছিল লি। এখন সময় এসে দাঁড়াল হোরাস অ্যাববিভিলে। আজই ব্যবসা সামলাতে গেলে কত না অপ্রিয় কাজই করতে হয়। আজ যেমন—এখন যেমন তাকে করতে হবে। এই মুদী দোকানটা ছাড়িয়ে, কোনাকুণি কিছুটা হেঁটে, ঘাসের সরু এবড়ো-খেবড়ো পথটা ধরে এগোলেই দেখা যায় একটা বাড়ী, সামনে হেঁটে বেড়াচ্ছে কয়েকটা মুরগী, খুঁটে খুঁটে দানা খাচ্ছে। সেই বাড়ীটা, একটা বড়সড় ঘর বলা ভাল, উঁচু উঁচু চারটে জানালা, দুটো দরজা। আগে ওটা, মাছের খাবারের গুদাম ছিল। সেটাই এখন অ্যাববিভিলের বাড়ী। দুই স্ত্রী, ছয় সন্তান নিয়ে তার সংসার। ধারে মাল নিতে নিতে লি-এর দোকানে হোরাস-এর নামে একটা বিশাল দেনার অঙ্ক জমে-বেড়ে উঠেছে। সেই সন্ধ্যেতে হিম সন্ধ্যে, পায়র তলায় একটা খবরের কাগজ পেতে রেখে লি যখন মেঝের ভিজে-ঠাণ্ডা ভাব থেকে পায়ের উষ্ণতা বজায় রাখার চেষ্টা করছে, হোবাস এসে দাঁড়িয়েছিল। আরো কিছু মাল ধারে নেবার আবেদন জানিয়েছিল। ওর অনুভূতি-প্রবণ, অথচ ক্লান্ত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে লি বলে 'তুমি তো জানো তোমার নামে ধারের অঙ্কটা বিশাল হয়ে উঠেছে।' হোরাস মাথা নাড়ে 'জানি, সত্যিই, বড় অঙ্ক, ধার

হিসেবে।' লি, ওর আধা কাঁচের চশমাটা দিয়ে তাকায়, স্পষ্ট, সোজাসুজি 'না, হোরাস। নীতিগত ভাবে আমার অক্ষমতা আমি স্বীকার করছি।' হোরাস, স্থির-অপলক কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মাথা নাড়ে। সম্মতি সূচক ভঙ্গীতে। লি-এর সমস্যার যথার্থতা যেন সে বুঝতে পারছে। তারপর লি-এর দিকে তাকায় 'আচ্ছা লি, আমার বাড়ীটা, সেটা যদি তোমায় দিয়ে দি, তোমার ধার পুরোপুরি শোধ হবে কি?'

লি, মাথাটা পেছন দিকে এলিয়ে দেয়, চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে। এ মুহূর্তে ওর মনে, সক্রিয় এক ব্যবসায়ী, তার লাভ-ক্ষতির পেন্সিলের আঁকিবুকিসহ। অবশেষে, লি চোখ খোলে। আধ-কাঁচের চশমাটা দিয়ে হোরাসের দিকে স্থির-অপলক চোখে তাকায়। 'বেশ, তুমি যদি সেরকমই ভেবে থাকো, আমি রাজী।' এরপর ব্যাপারটা দ্রুত মিটে গেল। এবং এধরনের কাজের পক্ষে, যথেষ্ট সৌজন্যময় পরিবেশেই। মাছের খাবারের গুদাম, ওরফে হোরাস অ্যাববিভিল পরিবারের বাসস্থানটা, লি চঙ-এর সম্পত্তি হয়ে উঠল। প্রায় নিঃশব্দেই।

এর দিন কয়েক পরই লি খবর পায়, হোবাস নিজের মাথায় গুলি চালিয়েছে। নিঃসন্দেহে, মর্মান্তিক খবর। কিন্তু, একটা শোকবার্তা পাঠানো, আর সঙ্গে কিছু মুদী সামগ্রী। এর বেশি আর কি করার ছিল তার?

দোকানের দরজাটা খোলার শব্দে লি তাকিয়ে দেখে ম্যাক ঢুকছে। 'তুমি নাকি মাছ খাদ্যের গুদামটা কিনেছ?' ম্যাক সরাসরি প্রশ্ন করে। লি, আসলে ম্যাকের আচমকা আবির্ভাবের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ঐ বাড়ীটার কথাই চিন্তা করছিল। কিভাবে সেটাকে কাজে লাগিয়ে, ব্যবহার করা যায়। প্রথমে সে ঠিক করেছিল ওটাকে মালখানা-গুদামঘর বানাবে। কিন্তু কয়েক প্রস্থ চিন্তার পর সেই ইচ্ছে বাতিল করতে বাধ্য হয়। প্রথমত জায়গাটা তার দোকান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। মাল নিয়ে আসার খরচা, লাভের পরিমাণে ছুরি চালাবে ভালমতই। দ্বিতীয়ত, অপলকা জানালা-দরজাগুলো ভেঙ্গে যে কেউ, যখন তখন বিনা বাধায় পুরো গুদাম সাফ করে দিতে পারবে। এ মুহূর্তে, জিজ্ঞাসু চোখে ম্যাক-এর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর বক্তব্য স্পষ্ট জানবার অপেক্ষায়। ম্যাক, হাড় হাভাতে, শ্রেণী বঞ্চিত, পথবাসীদের—নেতা বললে নেতা, প্রতিনিধি বললে তাই, পৃষ্ঠপোষক বললেই বা ক্ষতি কি? ম্যাক ও তার জনাকয় বন্ধু, বারটেন্ডার এডি, বায়োলজি দফতরের জন্যে জোন্স এবং 'লা ইপডা' পানশালার কর্মী হিউজি, এরা সবাই নিঃশব্দে-নীরবে এবং যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণভাবে ঐ সব হতক্লিষ্ট-দারিদ্র্যজীর্ণ মানুষগুলোর জন্যে কাজ করে যায়। এই হিমকালের ভিজে-বরফকীর্ণ পরিবেশে, মানুষগুলোর বাসস্থান হয়ে উঠেছে, লি-এর দোকানের

অদূরে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা বড় বড়। জংধরা লোহার পাইপগুলো। আবার বসন্তের ছোঁয়ায় অথবা গ্রীষ্মের প্রথমে ফিরে এলেই বাসস্থান বদল্ করে ওরা গিয়ে উঠবে পাশের বনটায়, কালো সাইপ্রাসের ছায়ায়। যাইহোক, এ মুহূর্তে সে ম্যাকের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে। ম্যাককে ঢুকতে দেখে প্রথমটায়, তার শরীর শক্ত-টানটান হয়ে উঠেছিল। যেন কোন অশুভের অনুপ্রবেশ ঘটল।

'লি' ম্যাক বলে 'আমি এবং আমার বন্ধুরা ঐ বাড়ীটায় থাকতে ইচ্ছুক।' একটু থেমে আবার কথা যোগ করে 'আমরা তোমার সম্পত্তিটার দেখভাল করতে পারি তাহলে। কেউ যাতে দখল করতে না ঢুকতে পারে অথবা কোনরকম ভাঙচুর, ক্ষতি না করতে পারে, লক্ষ্য রাখতে পারি। এতদুর থেকে, বোঝোই তো, বাড়ীটার ঠিকঠাক দেখাশোনা করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।' লি মাথাটাকে এলিয়ে দেয়। ওর হাত দুটো ব্যস্ত-দ্রুত ভঙ্গীতে ডেস্কের ওপর ঘুরে বেড়াতে থাকে। আধ কাঁচের চশমার মধ্যে দিয়ে প্রখর দৃষ্টিতে ম্যাকের অভিব্যাক্তি নিরীক্ষণ—পরীক্ষা করতে থাকে সে। সেখানে, শুভ ইচ্ছা, সবাইকে সুখী করার চেষ্টা আর বন্ধুত্বের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায় না। অথচ তবু, লি-র কেন মনে হতে থাকে সে ফাঁদে পড়ছে? পরিস্থিতি ঘেরাও হচ্ছে? যেন মসৃণভাবে কাঁটাবন-এর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাবার চেষ্টা করছে সে, মনে এরকম একটা ভাব কেন আসছে? লি-এর মনে ভেসে উঠতে থাকে কতগুলো সম্ভাবনা। আহ্, না, আসলে, সম্ভাব্যতা। লি, ম্যাককে ফিরিয়ে দেবে। জানালাগুলো খুলে নেওয়া হবে। অতঃপর ম্যাক আরো কিছুদিন অপেক্ষা করবে। তারপর আবার লিকে অনুরোধ জানাতে আসবে। লি প্রত্যাখান করবে। এবার ধোঁয়া এবং আগুনটাকে, লি আরো স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখতে পায়। আহ্, লি মার খেয়ে গেছে, হেরে গেছে। ডেস্কের ওপর, ওর আঙ্গুলগুলোর অস্থির নড়াচড়া আরো দ্রুত ব্যস্ততর হয়ে ওঠে। একটা, একটা উপায় আছে, হঠাৎ লি-এর মনে হয়। 'তোমরা জায়গাটা ভাড়া নিতে চাইছ?' নিরীহ গলায় সে প্রশ্ন করে। ম্যাক চওড়া হাসি জড়ানো মুখে ওর দিকে তাকায় 'তুমি তাই চাও? বলে কতো?' লি চণ্ড, ম্যাকের আত্মবিশ্বাসী মুখের দিকে তাকায়। দুজনের মধ্যে দাবার চাল দেওয়ার মত এক খেলা শুরু হয়েছে। ওরা দুজনেই জানে, লি যতই যে অর্থই দর দিক, সেটা পাবেনা। আসলে, এটা হয়ত লি-এর তরফে, মুখ রক্ষার, সম্মান বাঁচানোর একটা সুযোগ 'সপ্তাহে পাঁচ ডলার' ম্যাক লি-এর প্রস্তাবে মাথা নাড়ে এবং ওর তরফে খেলার শেষ চাল দেয় 'বেশ, আমি বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটু আলোচোনা করতে চাই।' মাথা নীচু করে সে কয়েক পলক কি ভাবে। 'তুমি ওটাকে চার ডলার সপ্তাহ প্রতি করতে পারো?' 'পাঁচ ডলার প্রতি সপ্তাহ' অটল ভঙ্গীতে লি বলে। 'ঠিক আছে, বন্ধুরা

কি বলে দেখি। আলোচনা করি।'

সুতরাং, ব্যাপারটা এই ভাবে শেষ হলো, অথবা, নাকি শুরু হলো মাত্র। মাছ খাদ্যের বাড়ীটায় ভাড়াটেরা ঢুকে পড়ল। যদিও, সে জন্যে কোনদিন ভাড়া বাবদ লি একটি সেন্টও পায়নি, পাবেও না। যদি ঐ বাড়ীর বাসিন্দাদের খরচ করার মত কোন অর্থ হাতে থাকত বা কখনো আসেও, সে অন্য কোন ভাবে সে অর্থ খরচ করার কথা চিন্ত্যা করবে না শুধুমাত্র লি-র মুদী দোকান ছাড়া। সুতরাং, ভাড়া পাওয়ার কথা চিন্তা করা, বাতুলতা—অলীক কল্পনা ছাড়া কিছু না। এবং, রাস্তার পাইপে অথবা সাইপ্রাস বনের তুলনায় সে লি-এর ভাড়াটেরা যথেষ্ট আরামপ্রদ হিসেবে পছন্দ করেছিল জায়গাটাকে, তার প্রমাণ হিসেবে—প্রথমে একটা চেয়ার এলো। তারপর আরো একটা। কয়েকটা টুলও এসে পড়ল। একজন তো একটা চারপাইও জোগাড় করে আনল। অতঃপর এলো একটা খাবার টেবিল। সেটা আবার স্থানীয় রঙের দোকান মালিকের দাক্ষিণ্যে রঙীন হয়ে, এসেছিল। (যতই হোক, খাট, চেয়ার, ডিনার টেবিল, এসব তো রাস্তার পাপি বা সাইপ্রাস জঙ্গলে কাজে লাগানো, ব্যবহার করার উপায় ছিলনা। সুযোগটা ওরা ব্যবহার করছে কাজে লাগাচ্ছে মাত্র, লি, সেকারনে ওদের দোষ দিতে পারেনা) এভাবেই পরিত্যক্ত মাছ খাদ্যের গুদামটা, আবার ফিরে পেল প্রাক্তন বাসিন্দাদের ছেড়ে যাওয়া চেহারা।

অধ্যায় ঃ ২

বাক্য তো শুধুমাত্র প্রতীকই, মানুষ, দৃশ্য, পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা উজ্জ্বলতর আলো, সংযোগ রক্ষা। এক অভূতপূর্ব শৈলীতে বোনা এবং মোড়কিত। বাক্য, বাক্যই ক্যানেরী রো-এর যাবতীয়তা-প্রাত্যহিকতা, নানা রঙে-আকৃতিতে পরিপূর্ণ জীবনযাত্রাকে উপভোগ করে—হজম করে, এবং কি আশ্চর্য্য, ফিরিয়েও দেয় জীবনের পাত্রে। এবং ক্যানেরী রো তাকে ফিরিয়েও নেয়-গ্রহণও করে। যেভাবে, সমূদ্রের জলে ডুবে থাকে নীল আকাশের প্রতিফলন ছবি। লি চঙ, একজন সামান্য মুদী দোকানীর বেশি কিছু। অন্তত, সে তা হতে বাধ্য। তার মনে, অবশ্যই সাদা কালো চরিত্রের ভারসাম্য আছে। কখনো হয়ত বা, একটি অন্যটির ওপর চেপে বসে। চরিত্রের যে কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর ভার বেড়ে ওঠে। অন্য চরিত্রটির ওপর তখন সে কতৃত্ব শাসন করে। একজন ক্যানডবিনের মত অটুট শক্ত মানুষ। অন্যদিকে, উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত এক

সভ্য-ভদ্র-মানবি—নরম মনের চীনামানুষ। এই দ্বৈত আবহ সর্বদা বেজে চলে তার মন জুড়ে। এটা সে বেশি করে টের পায় যখন পণ্যের স্তূপে ভরা মুদী দোকানে নির্জন সাজাপ্রাপ্ত কোন বন্দীর মত, একলা, সে থাকে, এক ভৌতিক আবছায়া ঘিরে ধরে তাকে।"লি চঙ, তখন জড়ো করতে থাকে, সেই অপার্থিবতার কাঠামোগুলো। এই যে খুলি। এটা পশ্চাৎদ্দেশের। কনুই। খাড়ের ইষৎ বক্রতা। শির দাঁড়ার টানটান ঋজুতা। এই পায়ের পাতা। জড়ো করেই চলে। ওকে তখন ঘিরে ধরে ওর পূর্বপুরুষেরা। তাদের যাবতীয় চীনা পরম্পরা ঐতিহ্য গর্বসহ।

ম্যাক এবং তার বন্ধুরা। ওরাও নিজস্ব আবর্তে ঘুরছে। ওদের নিজস্ব কিছু সততা, অহঙ্কার, মর্যাদা আছে। আভিজাত্যও। এবং নিছক উন্মত্ততা পাগলামো। জাগতিক এক আতঙ্ক। এক তাড়িতবোধ। সেই আদিম, পাকস্থলী ভরানোর তাড়না থেকে উদ্ভুত এক ভয়। খাদ্য সংস্থান নিশ্চিত করার উন্মাদনা, যুদ্ধ। পৃথিবী জুড়ে আবহমান-চিরকালীন লড়াই চলেছে। যাদের খাদ্য সংস্থান নিশ্চিত করা রয়েছে—তাদের লড়াই প্রেমের জন্যে। পৃথিবীটা শাসন করছে বাঘেরা, যাদের অস্ত্র নালী ঘাময়—পৃথিবী সঙ্গমিত হচ্ছে ষাঁড়দের দ্বারা—ঝাড়ু দেবার মত নিন্দিত, ভর্ৎসিত হচ্ছে অন্ধ শেয়ালদের দ্বারা। ম্যাকের মত কেউ কেউ, অদ্ভুত সহাবস্থানে বেঁচে আছে-থাকছে। একটা মানুষের অথচ, কি লাভ হতে পারে—সেই পৃথিবীকে নিজের অধিকার-সম্পত্তি বানিয়ে, যার সারবত্তা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আলসার, বেড়ে ওঠা প্রস্টেট, এবং বাইফোকাল দৃষ্টি? অথচ ম্যাক এবং তার সঙ্গীরা, তেমন পৃথিবীটার শাসন ভারই হাতে তুলে নিতে চায়। চেষ্টা করে। যার জন্যে, সন্তর্পনে ফাঁদ এড়িয়ে, বিষ মাড়িয়ে, দমবন্ধ করা ফাঁস টপকে, বেঁচে আছে ওরা—অন্তত বেচে থাকার চেষ্টা করছে। সেই পৃথিবীতে, আমাদের প্রকৃতি পিতার উত্তরাধিকার সুত্রে যা আমরা লাভ করেছি। গিফট অফ সারভাইভাল।

অধ্যায় ঃ ৩

লি চও 'খালি' জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছিল। যদিও জায়গাটা মোটেই সেভাবে খালি নয়। জং ধরা ভাঙ্গাচোরা লোহার পাইপ, বড় বড় চৌকো কাঠের টুকরো, পাচ গ্যালন জলের ক্যান—এসবে বোঝাই জায়গাটা, দূরে রেল লাইন। আর জায়গাটার বাঁ দিকের সীমানা ঘেঁষে, ডোরা ফ্লাড-এর বেশ্যাপল্লী। না, মোটেই সস্তা আমোদের জায়গা ওটা নয়। ডোরা, তার বাড়ীটার একটা আভিজাত্য—শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে, রাখতে পেরেছে। ডোরা, নিজের বেশ্যাজীবনের এবং এখন মালকিন হিসেবে—৫০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই এটা পেরেছে। যে কারনে, পুরুষ খরিদ্দারদের মধ্যেও সে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠতে পেরেছে। যদিও, সেই সব পুরুষদের স্ত্রীয়েরা তাকে মোটেই ভগিনী প্রতিম দৃষ্টিতে দেখেনা। কারণ, সেইসব পুরুষ খদ্দেররা তাদের স্ত্রীদের প্রতি কর্তব্যশীল হলেও, প্রেমাস্পদ ছিলনা। তাদের আসল ভালবাসা—প্রেম থাকত—থাকে, ডোরার বাড়ীর মেয়েদের প্রতি।

মহিলা হিসেবে ডোরা সত্যিই অতুলনীয়া। বড়সড় চেহারা, জ্বলন্ত উজ্জ্বল কমলারঙ চুলের ডোরা, তার পতিতাপল্লীতে কোন অশালীনতার জায়গা দেয়না। ব্যাপারটা, একটু হাস্যকর শোনালেও (যেন, মাছ খাবো কাঁটা বাছব না, জলে নামব শরীর ভিজবে না) কঠোর ভাবে ডোরা নিয়মগুলো মেনে চলতে বাধ্য করে তার খরিদ্দারদের। ওর বাড়ীতে মোট ১২টি মেয়ে আছে। নানা বয়সী, সদ্য কিশোরী থেকে মধ্যবয়সী। এবং ডোরা ছাড়া, ঐ বাড়ীতে আর মাত্র দুজন বাস করে। এক গ্রীকদেশীয় রাঁধুনী এবং একজন মধ্যবয়সী শক্তপোক্ত পুরুষ মানুষ। যার পদমর্যাদা ওয়াচম্যানের। কিন্তু আসলে, অবাঞ্ছিত উপদ্রব ঘটনা যদি কখনো কিছু ঘটে তবে সেগুলো কঠোর হাতে সামলানোর দায়িত্ব পড়ে ওর ওপর। মারামারি থামানো, অতি উৎসাহী কোন খদ্দেরের কোন মেয়ের প্রতি মাত্রাহীন জুলুম বা অশালীনতর ব্যবহার যা অস্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়ে। মাতালদের উৎপাত, ঝগড়া। এইসব, ছোট খাটো—আপাত নিরীহ অথচ তীব্র অভিঘাতময় কাজগুলো, সামলায় সে। আলফ্রেড, তার নাম, সে পুরোমাত্রায় ওয়াকিবহাল পুরুষদের এখানে কি করা উচিত তাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, এবং তাদের কি করা উচিত নয়—আচরণ কেমন হওয়া উচিত নয়। সেটাকেই, আলফ্রেড বজায় রাখার চেষ্টা করে সত্যনিষ্ঠভাবে।

ডোরার ব্যাপারে বলা যায়, সে এক অতি সূক্ষ্মবিচারী অস্তিত্ব বহন করছে। যেহেতু সে আইনভঙ্গকারী একজন, অন্তত আইন বহির্ভূতদের একজন,

অন্যদিকে সে অন্যরকমভাবে আইনের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক সমর্থক, অক্ষর ধরে ধরে আইন মেনে চলাদের প্রতিভূ। এগুনটা, শহরের অন্যদের থেকে তার কয়েকগুণ বেশি। আইন ভেঙ্গে ব্যবসা করছে বলেই, আইন মেনে চলার ব্যাপারে সদা সর্বদা তীক্ষ্ণ নজর সজাগ থাকতে হয় তাকে। মনে করুন, পুলিশের পেনশন তহবিলের অর্থ জোগাড়ের মহৎ উদ্দেশ্যে এক নাচের আসরের আয়োজনে, অন্য আমন্ত্রিতরা এক ডলার অর্থ সাহায্য-চাঁদা যদি দেয়, ডোরা দেয় পঞ্চাশ ডলার। হ্যাঁ ওর আইন মান্যতা—সমর্থন এরকম বাস্তবমুখী চিন্তাধারার—সদর্থক দৃষ্টি ভঙ্গীর। শুধু মাত্র পুলিশই নয়, সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও ডোরার দৃষ্টিভঙ্গী মনোভাব একই রকম ইতিবাচক। চেম্বার অফ কমার্সের বাগানটাকে নতুন করে সাজানোই হোক, অথবা রেড ক্রশ, বয় স্কাউট, কমিউনিটি চেষ্ট, ডোরার মহৎ অংশগ্রহণ ছোট হয় কমে না।

ডোরার 'বিয়ার ফ্ল্যাগ' এর মেয়েরা, সবাই পরিশীলিত মার্জিত শৃঙ্খলাপরায়ন। রাস্তায় কোন পুরুষের সঙ্গে তারা কথা বলেনা। যদিও, হয়ত, আগের গত রাতেই পুরুষটি তার ঘরে ছিল। আলফ্রেডের আগে, বর্তমান ওয়াচম্যানের আগে, বিয়ার ফ্ল্যাগে যে কাজ করত, তার ক্ষেত্রে একটি বিয়োগান্ত পরিণতির করুণ ঘটনা ঘটেছিল। তার নাম ছিল উইলিয়াম। দিনের বেলা যখন তার তেমন কাজ থাকত না, একদঙ্গল মহিলার মাঝে সে হাঁফিয়ে উঠত। নিঃসঙ্গতা কাটাতে, সে তার পশ্চিমের ঘরের জানালায় এসে বসত। প্রায় প্রতিদিনই সেখান থেকে—'খালি জায়গা'টায় ম্যাক এবং তার দলবলকে আড্ডা দিতে, হৈ-চৈ করতে দেখত সে। এরা, একটার পর একটা 'ওল্ড টেনিস শু্য' বিয়ারের বোতল বা টিনপাত্র খুলত আর চুমুক মারত। দৃশ্যটা, দৃশ্যগুলো, প্রতিদিনই উইলিয়ামকে তাড়িত করত, উসকে দিত। একদিন সঙ্গলাভের প্রবল তাড়না থেকে সে হাঁটতে হাঁটতে ওদের মাঝে গিয়ে হাজির হলো। একটা জং ধরা পাইপে আয়েশ করে জমিয়ে বসে ওদের দিকে বন্ধুত্ব পূর্ণ ভঙ্গীতে তাকিয়ে হাসল। আর ঠিক তখন, গোটা দলটার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো। স্পষ্টতই, ওরা ইউলিয়মের উপস্থিতিতে বিঘ্নিত বোধ করছিল। এ রকম কয়েকটি অস্বস্তিকর—অসহ্য, দীর্ঘ মুহূর্তের পর, উইলিয়াম পায়ে পায়ে উঠে চলে আসে। নিজের জানালায় বসে সে দেখতে পায়, ওরা আবার আগের মত হাসি ঠাট্টা হৈ-চৈতে মেতে উঠেছে। পরদিন উইলিয়াম আবার গেল। এবার ওর সঙ্গে একটা হুইস্কির বোতল ছিল। ওরা সবাই সেটা থেকে পান করল যতই হোক ওরা তো পাগল নয় এবং মদের ঘোরেও কিন্তু, উইলিয়ামের প্রতি নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় কোন পরিবর্তন হলনা, এবং যেহেতু ওর মদ খাচ্ছে, সেই ভদ্রতাবোধ থেকে উৎসারিত সৌজন্য সূচক কিছু মাপা কথা, তার বেশি

এগোল না। উইলিয়াম ফিরে এলো, নিজের জানালায়। যেহেতু মদের ইষৎ ঘোর, তাই ওদের কথাবার্তা এখন বেশ উচ্চকিত, উইলিয়ামের কানে আসার পক্ষে। এবং নানা কথার মধ্যে, সে ম্যাককে এটাও স্পষ্ট বলতে শোনে 'নোংরা দালাল, ঘেন্না করি, আমি ওকে ঘেন্না করি।' নিশ্চিত ভাবেই এটা মিথ্যে।

উইলিয়াম স্পষ্ট বুঝতে পারে ম্যাক এবং তার দলবল তাকে পছন্দ করেনি। সামাজিক ভাবে সে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তা বলে, 'নোংরা দালাল?' সামাজিকভাবে সে হয়ত, তার অবস্থান হয়ত ওদের অনেক নীচে। তা বলে, সে কখনোই নোংরা দালাল নয়। ভগবান, বিশ্বের সবচেয়ে কদর্যতম পেশাটি ছাড়া, ওর সম্পর্কে আর কিছু খুঁজে পেলনা ওরা। এর প্রবল হতাশা, ভগ্ন হৃদয়-মন নিয়ে সে ভেবে চলে, তারও তো অধিকার আছে সুখী হয়ে বেঁচে থাকার, অন্যদের, অন্য সবার মত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সে তো একটা নোংরা দালাল, না ওয়াচম্যান নয়, একটা ঘৃণ্য বস্তু নোংরা দালাল। এই সমাজে তার কোন জায়গা নেই। সমাজে সে ব্রাত্য অপাংক্তেয়। ঠিক এই সময় বাড়ীর কোন মেয়েটা যেন গ্রামোফোন বাজাতে শুরু করল। সারা বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ল, অনির্বচনীয় এক সুর, বিষাদময় জড়টান সহ—হারভেস্ট খুন।' উইলিয়ামের মনে বিষাদপাত্র আরো কানায় কানায় ভরে ওঠে। ওর মনে পড়ে, এই বাড়ীরই একটা মেয়ে এ গানটা কি ভীষণরকম ভালবাসত, রোজ শুনত। এই বাড়ী ছেড়ে, উইলিয়ামকে দেওয়া যৌবনের দিকভ্রান্ত অথচ আবেগঘন প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে ছিঁড়ে পালিয়ে যাবার অন্য পুরুষকে বিয়ে করার, আগে পর্যন্ত। উইলিয়াম মারাত্মক, তীব্রদহন বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়। এক ধূসর মেঘ, তার হৃদয়ে যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল। সে, নিজের ভবিতব্যকে সেই মুহূর্তেই স্পষ্ট দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। অপ্রতিরোধ্য, মোহাচ্ছন্ন এক আকর্ষণের মত, যেন সম্মোহিত শক্তি নিয়ে, পায়ে পায় উইলিয়ামের দিকে এগিয়ে আসছিল। যাকে কিছুতেই এড়ানো যায় না। অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী এক ইঙ্গিত।

অধ্যায় ঃ ৪

ঘনিয়ে ওঠা সন্ধ্যার মুহূর্তে একটা ঔৎসুক্যজনক ঘটনা ঘটল। এটা ঘটল ঠিক সেই সন্ধি মুহূর্তে—সূর্য্য অস্ত গেছে অথচ রাস্তার আলোগুলো তখনো জ্বলেনি। সেই মধ্যবর্তী, ছোট্ট, ধূসর-শান্ত মুহূর্তগুলোর সুযোগে, এক বৃদ্ধ চীনে মানুষকে হেঁটে আসতে দেখা গেল পাহাড় অতিক্রম করে, 'খালি জায়গা'টা পাশ কাটিয়ে, প্যালেস ফ্লপ হাউস'কে পিছনে ফেলে। তার মাথায় আদ্যিকালের চ্যাপ্টা ধরন টুপি, নীল জিন্স, লম্বাঝুলের কোট। পায়ের জুতোর একটার গোড়ালীর তলা নিখোঁজ, ফলে প্রতিবার পা ফেলবার পর জুতোসহ পাটা দৃষ্টিকটুভবে মাটিতে ঘষটে যাচ্ছিল এবং হাঁটার যে নির্দিষ্ট একটা ছন্দ তাকে বিঘ্নিত করছিল। তার হাতে ঝুলছিল একটা ঢাকা বাস্কেট। তার মুখটা শীর্ণ পাতলা, চোখগুলো ধূসর এমন কি চোখের সাদা অংশটা পর্যন্ত বাদাবনের মত খোলাটে। রাস্তার পর রাস্তা অতিক্রম করতে করতে সন্ধ্যের ঘন অন্ধকারে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ বুঝতে পারলনা। কিন্তু পরের ভোরে, রাস্তার আলোগুলো যখন নিভে গেছে—অথচ দিনের আলো ফোটার মত অন্ধকার কাটেনি, বৃদ্ধ চীনেটিকে আবার যেন মাটি ফুঁড়েই আবির্ভূত হতে দেখা গেল। তার হালকা বাস্কেটটি এখন বেশ ভারী এবং ভিজে এবং ঝুলে পড়ছিল। সে আবার সেকেন্টস্ট্রীট ধরে হাঁটতে শুরু করে। পাহাড় পর্যন্ত। তারপর আবার ভোজবাড়ির মত মিলিয়ে যায়। সন্ধ্যে পর্যন্ত।

গভীর রাতে ক্যানেরী রোও-এর ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষদের কানে ভেসে আসে তার পা ঘষটে চলার বিশ্রী, ছন্দবদ্ধ শব্দটা, মুহূর্তের জন্যে তারা জেগে ওঠে। কেউ ভাবল সে মৃত্যু প্রতীক। আবার কেউ তাকে ভগবানের অবতার ভাবল। এবং শিশুরা, তাদের অতি প্রবল কল্পনাশক্তির জোরে নানারকম আজগুবী ব্যাপার গল্প ভাবতে শুরু করল। বহু বছর ধরে এটা ঘটে চলল। মানুষ এক সময় ফলত, ব্যাপারটায় অভ্যস্থ হয়ে উঠল। এবং শিশুরাও, আসলে, হয়ত তাদের মনে লোকটা সম্পর্কে এক রহস্য মেশা ভয় জড়িয়ে থাকত। যার ফলে, বিচিত্র সাজ পোষাক হওয়া সত্বেও এবং চরিত্র হিসেবে যথেষ্ট কৌতূহল উদ্রেককারী হওয়া সত্বেও, বাচ্ছারা তার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাত না কাছে ঘেঁষত না। শুধু একজন ছাড়া। সেই সাহসী শিশুটির নাম অ্যান্ডী, বয়স ১০। একদিন, সাহসী অ্যান্ডীর সামনে দিয়ে যখন সেই চীনে মানুষটি যাচ্ছে, সাহসী অ্যান্ডীর বুকের মধ্যেও এক ভুতুড়ে মেঘ ছমছম করে উঠল। কিন্তু অ্যান্ডী জানে, লোকটার উদ্দেশ্যে তাকে দুষ্টুমী করা আওয়াজ ছুঁড়ে দিতেই হবে। নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যেই এটা তাকে করতে হবে। প্রতি সন্ধ্যেতে, সন্ধার

পর সন্ধ্যা, সামনে দিয়ে বৃদ্ধ চীনেটিকে হেঁটে যেতে দেখত আর কর্তব্য অ্যান্ডিকে সজাগ সচকিত করত। অথচ সন্ত্রাসজড়িত মন কর্তব্য পালন থেকে বিরত করত তাকে। কিন্তু, অতঃপর, একদিন অ্যান্ডি প্রবর্তনা রোধ করতে পারল না। বৃদ্ধ চীনেটির পেছন পেছন—অনুসরণ করে, ব্যাঙ্গাত্মক সুরে গাইতে গাইতে চলল—চিং চং চীনে ব্যাটা, ছিল একা বসে।

তখন এলো এক সাদা মানুষ এসে।

দিল ব্যাটার বিনুনী কেটে শেষে।

লোকটা থেমে গেল। ঘুরে দাঁড়াল। অ্যান্ডিও থমকে দাঁড়াল। লোকটা অ্যান্ডির দিকে তাকাল। তার দুটো প্রখর বাদামী ধূসর চোখ। তারপর কি হলো, —অ্যান্ডি কাউকে বলতে পারবেনা। অথচ আবার সারাজীবন ভুলতেও পারবেনা। ধূসর—বাদামী দুটো চোখ নয়, কোন চীনেমানুষ নয়, এক বিশাল কোন কৃষ্ণ গহ্বরের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রশস্ততা দীপ্তীহীন ব্যপ্ত, চরাচরহীন অসীম। এ সুবিস্তীর্ন নির্জন প্রান্তর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাহাড়—যেগুলোর আকৃতি, ছাগল-কুকুর-বিড়ালের মাথার মত। গাছগুলো সব যেন দানবীয় ব্যাঙের ছাতা। সেই রুক্ষ্ম-নির্জন প্রান্তরটিতে জড়িয়ে থাকা তীব্র নিঃসঙ্গতা—বোবা একাকীত্ববোধ, অ্যান্ডিকে চরম আতঙ্কিত করে তুলল। নির্বাসনসম, কি চরম অসহ্যকর, যেন সারা পৃথিবীর থমকে গেছে প্রজননগতি। দুঃসহতায়, অ্যান্ডি চোখ বুজে ফেলে। যেন এই অপার্থিব নিষ্ঠুররালৌকিক নির্জনতার নগ্ন একাকীত্ব তাকে দেখতে না হয়। কয়েক মুহূর্ত পর অ্যান্ডি যখন চোখ খুলল, সে ক্যানেরী রোও এর পথের মাঝে, যেখানে একটু আগেই দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

বৃদ্ধ চীনেটি, তার পরিচিত 'ঘষটে চলা পা'-এর ভঙ্গীসহ হেঁটে চলেছে, ওয়েস্টার্ন বায়োলজিক্যাল পার হয়ে হেডিওনডো ক্যানেরীর দিকে। এর আগে কেউ সাহস করেনি। শুধুমাত্র অ্যান্ডিই কাজটা করার সাহস দেখিয়েছিল। আর কোনদিন সে এরকম কিছুর চেষ্টা করেনি।

অধ্যায় ঃ ৫

রাস্তার ডানদিকটা ওয়েস্টার্ন বায়োলজিক্যাল। ঠিক তার মুখোমুখি অবস্থিত 'খালি জায়গাটা।' ওয়েস্টার্ন বায়োলজির ডানদিকে কোণাকুণি লি চঙের মুদী দোকান। আর বাঁ দিকটাতে পড়ছে ডোরার বেশ্যাবাড়ী 'বিশর ফ্ল্যাগ রেস্টুরেন্ট।' ওয়েস্টার্ন বায়োলজিক্যাল একটু অদ্ভুত ধরনের ব্যবসা করে। তারা নানা ধরনের সামুদ্রিক জিনিষপত্তর—মাছ, স্পঞ্জ, শ্যাওলা, জলজ ক্যাকটাস, জলজ উদ্ভিদ এবং ফুল, লতা ইত্যাদি এবং পাথর, এসব বিক্রিবাট্টা করে। নীচুছাদের বাড়ীটা রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বেসমেন্টটাই ওদের গুদামঘর। সারসার তাকে সাজিয়ে রাখা, কাঁচের নানা আকৃতির জারে—রাসায়নিক তরলজারিত নানাবিধ দ্রব্য। কি নেই? জেলিফিস থেকে হাঙরের বাচ্ছা। তিমির মাথার খুলি থেকে বিরল নীল কাঁকড়া অথবা বিষাক্ততম জলজ 'সাদা পা' মাকড়শা। ওপরে মূল অফিসের পেছনদিকে, ছাদওয়ালা বিশাল হলঘরটায় নানা আকৃতির বেশ কয়েকটা জলভরা চৌবাচ্চা। না মৃত নয়, এইসব চৌবাচ্চাগুলোর একেকটা একেক রকম সমুদ্রপ্রাণীরা কিলবিল করছে। মাছ, অকেটাপাস, কাঁকড়া, জেলিফিস, বাচ্ছা হাঙর-তিমি, চলমান উদ্ভিদ 'স্যাটেওলা' ইত্যাদি। আর অফিসঘরের পাশের ঘরটা, এটা পরীক্ষাগার। মাইক্রোস্কোপসহ কিছু যন্ত্রপাতি, তিন আলমারী ভর্ত্তি ওষুধপত্র, আর দুটো তাক ভর্তি নানা রাসায়নিক। আর অফিসঘরের বাঁ দিকে লাইব্রেরী। সেখানে যা থাকা উচিত তাই থাকে। বায়োলজিক্যাল-এর মালিক হচ্ছেন ডাক্তারবাবু। সাবা ক্যানেরী রোও তাকে এই নামেই চেনে জানে। ডাক্তার একজন ছোট্ট খাটো, নজর কেড়ে নেবার মতই ছোট্ট খাটো মানুষ। অথচ, বেশ শক্তপোক্ত। দাড়িময় মুখ, অনেকটা যীশু-যীশু দেখায়। এবং তার মুখ অনেক কথা অনেক সত্যি বলে দেয়। লোকে বলে, তার হাত দুটো মস্তিষ্ক শল্যবিদের আর শীতলতম উষ্ণতর মনের অধিকারী। ডাক্তার, বহু মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে বাঁচিয়ে, অন্য বিপদে জড়িয়ে দেন। তিনি যখন শহরের পথে গাড়ী চালিয়ে যান—এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষ করা যায়। নিজের মাথার টুপিটাকে তিনি পাশে-র আসনে বসা তার কুকুরটার মাথায় পরিয়ে দেন৷ আর কুকুরটা, বিজ্ঞের ভঙ্গীতে, তার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। দৃশ্যগতভাবে, স্মরনীয় বৈকি। তিনি, নিজের প্রয়োজন পূরন করতে হত্যা খুন করতে পারেন। যে কোন কিছুকে। কিন্তু নিছক আনন্দ পাবার কারনে আনন্দের জন্যে তিনি সামান্য আঘাতও করতেন না কাউকে, কোন কিছুকে। আর হ্যাঁ, তার অদ্ভুত একটা ভীতি ছিল ভিজে

যাওয়া সম্পর্কে, ঠান্ডা লাগা সম্পর্কে। সে জন্যে সারাবছর তিনি মাথায় টুপি পরে থাকতেন। শীতকালে বুক আটকানো হাওয়া নিরোধক পোষাক ও টুপি হত তার আবশ্যক পোষাক। বর্ষাকালে, এক ফোঁটা জলও, যদি তার গায়ে পড়ত, এক হিস্টিরিয়া রোগীর মত আতঙ্কতাড়িত হাবভাব আচরণ করতেন তিনি।

এক আজব চরিত্র হিসেবে ডাক্তার সবার চোখে বজায় ছিলেন। যদিও কেউ তার দিকে কোনরকম সন্দেহের আঙুল তুলত না। ক্যানেরী রোওতে, দর্শন এবং বিজ্ঞানের চলমান প্রস্রবন হিসেবেই দেখত সবাই তাকে। মাঝে মাঝেই, তার ল্যাবরেটরীর লাইব্রেরী থেকে নানারকম গানের সুর ভেসে আসতে শোনা যেত। ডোরার বাড়ীর মেয়েরা সেইসব সুরের বাজনা শুনে আশ্চর্য চকিত, উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। মোটকথা, জীবন, এবং জীবন সম্পর্কিত সবকিছুর ব্যাপারেই ডাক্তারের একটা নিজস্ব দর্শন ছিল। যেকোন পরিস্থিতিকেই তিনি নিজের মত করে সামলাতে পারতেন।

অধ্যায় ঃ ৬

ডাক্তার তার সামুদ্রীক প্রাণী বস্তুগুলো, পেনিনসুলার টাইড পুল থেকে সংগ্রহ করতেন। জায়গাটা অসাধারণ। যখন বড় বড় ঢেউগুলো এসে পাড়ে—পাহাড় ঘেরা তার সৈকতে আছড়ে পড়ে, ফেনা আর ফেনায় ভরে ওঠে—যেন রাশিরাশি তুলোর পেঁজা অথবা বরফের, তীব্র শিষের মত শব্দ তুলে সেগুলো আছড়াতে থাকে ছোট্ট ফেরীঘাট বন্দরটিকে ঘিরে। সে এক সশব্দ সামুদ্রিকতা। কিন্তু যখন ঢেউয়ের তীব্রতা ততো থাকেনা, পুরো পরিবেশটাকে ঘিরে জড়িয়ে ধরে এক তন্ময় নীরবতা। বিচিত্র শান্ত স্তব্ধতা এক। সমুদ্রটাও এত স্বচ্ছ যে একেবারে তলদেশ পর্যন্ত নজর চলে যায়। যে সমুদ্রের গহনে লড়াই করছে, বেঁচে আছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, প্রজনন করছে—ডাক্তারের প্রয়োজনীয় সামুদ্রিক প্রাণী বস্তুগুলো। সুন্দর, রঙীন বর্ণময় এক আশ্চর্য জগত। কতরকম বিস্ময় যে ছড়িয়ে আছে সেই অতলতায়।

ডাক্তার আর হেজেল এক সঙ্গে কাজ করেন। হেজেল থাকে প্যালেস ফ্লপ হাউসের কাছে। হেজেলকে, তার জীবনধারনের ভঙ্গী ও ধরনের জন্যে, তার বন্ধুরা ডাক নাম দিয়েছে 'হ্যাপাযার্ড' হেজেলের মা, আট বছরে সাতটি ক্রমাগত সন্তানের জন্ম দান করেও ক্ষান্ত হননি। হেজেল তার অষ্টমগর্ভ। হেজেলের জন্মের পর তার লিঙ্গ বিষয়ে মহিলা নাকি বিভ্রান্ত ছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন।

কেন? তা এক রহস্য। তাছাড়া, মহিলা সর্বদাই আটটি সন্তান এবং তাদের অকমর্ন্য বাবাকে খাইয়ে পরিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সারাটা দিন নানাভাবে পয়সা রোজগারের চেষ্টায়, কখনো কাগজের ফুল বানিয়ে বিক্রি করে, কখনো মাশরুম কখনো বা ইঁদুরের মাংস, সবকিছু বিক্রিযোগ্য যা কিছু, চেষ্টা করতেন বেচবার। মহিলার দুর সম্পর্কিত কাকীমার নাম ছিল হেজেল। অষ্টম সন্তানের নাম তিনি হেজেলই পছন্দ করেন, উপযুক্ত হিসেবে বাছাই করেন। যেহেতু, অষ্টম গর্ভজাত সন্তানটির লিঙ্গ বিষয়ে তিনি বিভ্রান্ত দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। পরে, বড় হবার পর যখন নিশ্চিত হয় যে সে ছেলেই, নাম বদলানোর ব্যাপারটাকে হেজেল মনোযোগ বা গুরুত্ব দেবার বিষয় বলে মনে করেনি। ততদিনে, এই মেয়েলী নামে সে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিল। হেজেল বড় হয়ে উঠতে থাকে। চারবছর স্কুলে পড়াশোনা করে। কিন্তু তার আচার আচরণ এমন হয়ে ওঠে ততদিনে, যে তাকে সংশোধন স্কুলে পাঠাতে হয়, পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও চারবছর কাটায় সে। কিন্তু দুই স্কুলের কোনটা থেকেই সে বিন্দুমাত্র কিছু শেখেনা, শিক্ষিত হয়না।

সংশোধন স্কুলগুলো আসলে অসামাজিক পাপী দাগী অপরাধী বানিয়ে তোলারই আখড়া, যদিও, বোধ হয় হেজেল সেসব ব্যাপারেও মনোযোগী হয়নি। তাই সেব্যাপারগুলোও ভালভাবে শিখে উঠতে পারল না সে। সংশোধন স্কুল থেকে সে যখন বের হয়ে এলো, অপরাধমনস্ক সরল নিষ্পাপ এক যুবক। ২৬ বছরের, কালো চুল, উজ্বল চোখ। হেজেল, কারো সঙ্গে কথা বলার সময় শব্দে মনোযোগ দেয়না, কথার তাল ওঠা পড়া খাদগুলো তাকে বেশি আকর্ষণ করে। সে লোকের সঙ্গে কথা বলে, নানা রকম প্রশ্ন করে, শব্দময় উত্তর শোনার জন্যে নয়—সে তখন মন দেয় কথার শব্দের, মধ্যে থেকে উঠে আসা প্রবাহের গহনতায়। হেজেল, শক্তপোক্ত, আগ্রহী, কর্ম উৎসুক। সে তাই ডাক্তারের সঙ্গী হয়। তার সঙ্গে কাজ করে। সে জানে তার কাছে কি চাওয়া হচ্ছে, এবং সেটা সফলতর ভাবে করতেও জানে সে। শিকার করতে সে বাস্তবিকই শিহরনজারিত আনন্দ বোধ করে। আজ, তারা মাছ শিকার করতে এসেছে তারা যেমন। তিনশো মাছের আদেশ—বরাত পেয়েছে তারা। একটা হৃষ্টপুষ্ট বেগুনীরঙ তারামাছ হাতে তুলে সে নাইলনের (ব্যাগটায় সেটা প্রায় ভরে এসেছে) ভরে, 'আমি ভাবছি, এতগুলো মাছ ওদের কি কাজে লাগবে?' পড়াশোনার কাজে লাগবে। ছাত্রদের নিরীক্ষনের কাজে লাগানো হবে', ডাক্তার জবাব দেন হেজেলের প্রশ্নের। ডাক্তার, তার একটি অদ্ভুত মানসিক সমস্যা আছে। যার বাইরে তিনি কিছুতেই বেড়িয়ে আসতে পারেননি। কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করলে যতক্ষণ না তিনি নিশ্চিত হন যে শতকরা ১০০ ভাগ বিষয়টি

প্রশ্নকর্তার মাথায় প্রোথিত করে বোঝাতে পেরেছেন, তিনি থামেন না। আর হেজেল যেহেতু, কথকতার স্রোতের ছন্দে ডুবে থাকতে চায়—শব্দের চড়াই উৎড়াই বেয়ে চলতে চায়, কথার পালা তাই সে চালিয়েই যায়। ওদের কথোপকথনও তাই, অন্তহীন ভাবেই যেন চলতে থাকে চলতেই থাকে। ওরা কি পড়াশোনা করবে? একটা তারা মাছ নিছকই, তার মধ্যে আবার নিরীক্ষণ করার কি থাকতে পারে আছে?' 'আহ, তুমি বুঝবে না। এরা গঠনগত বিচারে অত্যন্ত জটিল এবং রহস্যময় জীব, কৌতুহলকারী। তাছাড়া, এগুলো যাবে উত্তর-পশ্চিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'ওখানে 'তারা' মাছ পাওয়া যায় না?' 'ওখানে কোন সমুদ্রই নেই।' ডাক্তার তার জ্ঞান প্রত্যয়ী আত্মবিশ্বাসের গলায় বলেন। এরপর ওদের কথোপকথনে বিরতি পড়ল। হেজেল যেটাকে ঘৃণা করে। সে বিরতিহীন টানা কথোপকথনে আনন্দ উপভোগ করে। মনে মনে দ্রুত প্রশ্ন খুঁজে হাতড়ে বেড়ায়। আর সেই ফাঁকে ডাক্তার তাকে একটা প্রশ্ন করেন। আহ, এই জিনিষটা হেজেলকে বিরক্তি উৎপাদন করতে বাধ্য করে। সে, অন্তহীন ভাবে অন্যের কথা শুনে যেতে চায়। কিন্তু ওকে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে হলে, নিজেকে, যেন এক মিউজিয়ামের হিরন্ময় অলৌকিক স্তব্ধতার মধ্যে, একা, খুঁজে পায় সে। আসলে, সে কিছু ভোলেনা, প্রখর তার মস্তিষ্ক, স্মৃতি। কিন্তু কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে—চাইলে, নিজের চিন্তাকে একত্রিত করতে, জড়ো করতে হয় কোন এক নির্দিষ্ট রকম বিন্দুকে। হেজেল, সেটা ঘৃণা করে, আহ, ঘৃণা করে।

'তোমাদের ফ্লপ প্যালেসের সব কেমন চলছে?' ডাক্তার প্রশ্ন করেন। হেজেল ঘন কালো চুলে লম্বা লম্বা আঙুলগুলো চিরুনীর মত চালায় 'মোটামুটি। সমকামী একটা লোক এসে ভিড়েছে। লোকটা বৌয়ের মার খেয়ে এসে ভিড়েছে।' 'তাই নাকি?' ডাক্তারের গলায় আগ্রহ। 'হ্যাঁ, লোকটা তার বৌকে পেটাতো। আর তারপর ক্লান্ত হয়ে সে যখন ঘুমিয়ে পড়ত বৌটা ওকে মারতে শুরু করত। লোকটা ঘুম থেকে জেগে উঠে আবার বৌকে পেটাত।' 'অদ্ভুত, নতুন ধরনের ঘটনা তো। কিন্তু বৌটা তো পুলিশকে বলে স্বামীকে জেলে পাঠাতে পারত?' হেজেল গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে 'হ্যাঁ, লোকাটা জানত, তার বৌ এরকম করতে পারেনা। তাই সে পেটাত। কিন্তু পরের দিকে বৌকে পিটিয়ে তার কোন উত্তেজনা হত না, সুখ পেত না সে। তবু, কাজটা করতেই হতো তাকে। অন্তত নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যেও। ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল এই একঘেয়েমীতে। আমার মনে হয়, তাই সে আমাদের ওখানে থাকতে এসেছে।' ডাক্তার সোজা হয়ে টানটান দাঁড়ান। সমুদ্রের দিকে চোখ রাখেন। হাওয়ার তেজ বাড়ছে। ঢেউগুলোও বড় হয়ে উঠছে। গর্জন বেড়ে উঠছে

তাদের। সশব্দে পাহাড়ের খাঁজগুলোয় গিয়ে আছড়ে পড়ছে। ডাক্তার তার টুপিটা ভাল করে মাথায় চেপে এঁটে বসায়। বর্ষাতি টাকে টেনে বোতাম লাগিয়ে বন্ধ করে। তারপর বলে চলছে, আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে। বর্ষাটা জোর আসছে মনে হচ্ছে। জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে ওরা হাঁটতে শুরু করে। ডাক্তার আগে আগে, হেজেল তার পেছনে।

তারা মাছের ঝোলটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হেজেল বলে 'বউ পেটানো লোকটা, হেনরী যার নাম, জানেন সে একজন শিল্পী।' ডাক্তার মুখ ফেরান 'সত্যি, তাই?' তার গলায় যথেষ্ট বিস্ময়। 'হ্যাঁ। আর শুধু রঙ দিয়ে ছবি আঁকেনা, জানেন? ওর আঁকার মাধ্যম নানারকম আশ্চর্য বস্তু। মুরগীর পালক, বাদামের খোসা। এসব।' ডাক্তার মাথা নাড়েন 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি। কিছু কিছু শিল্পী ছবি আঁকার মাধ্যম হিসেবে নানারকম আশ্চর্য জিনিষ ব্যবহার করেন। আজকাল এই রীতিটা খুব উঠেছে।' হেজেল, কয়েক মুহূর্তের এক দীর্ঘ নীরবতাময় বিরতির পর, সংশয় মাখা গলায় বলে, 'আচ্ছা ডাক্তার, আপনার কি মনে হয়? লোকটা পাগলাটে?' ডাক্তার মাথা নাড়েন। 'আসলে, হেজেল, জানো, ঐ 'পাগলামী'—শব্দটা দ্ব্যর্থবোধক। কিছুটা অনিশ্চিতও। প্রত্যেক মানুষের সত্ত্বাতেই ব্যাপারটা প্রচ্ছন্ন থাকে। কারো কারো চরিত্রে প্রবলতর হয়ে তা বাহ্যিকতা, প্রকাশ ঘটায়।' এরকম কোন কথা হেজেল আগে শোনেনি। সে বিস্ময় মেশান চোখে ডাক্তারের দিকে তাকায় 'পাগলাটে, আমরা প্রত্যেকেই কিছু পরিমানে। শুধু, আমাদের প্রত্যেকের প্রকাশ ভঙ্গীটি আলাদা, ধরনটা অলাদা।' ডাক্তার বলেন। ডাক্তারের এই কথাগুলো হেজেলকে কিছুটা তাড়িত করে। সে নিজের জীবনটাকে, দেখার চেষ্টা বোঝার চেষ্টা করে দেখে। স্বচ্ছ জলের কোন পুলের বদলে, তার মনে হয়—দুর্বোধ্য, ঝাপসা-ঘোলাটে কোন কাঁচের মধ্যে দিয়ে সে তাকাবার চেষ্টা করছে। 'কিন্তু নৌকো? নৌকোটা?' বিড়বিড় করে সে। তারপর ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলে 'হেনরী, একটা নৌকো বানাচ্ছে।' 'সে তো ভাল কথা।' হেজেল মাথা নাড়ে সংশয় অস্থিরতা দুর্বোধ্যতা মিশে যায় ওর আচরনে 'গত সাত বছর ধরে নৌকোটাকে বানিয়ে চলেছে সে। যতবারই নৌকোটা শেষ হয়ে আসে, সেটাকে খুলে ফেলে। আবার নতুন করে, প্রথম থেকে বানাতে শুরু করে আগাগোড়া।' একটু থেমে সে আবার বলে 'একটা নৌকা, সাত বছর ধরে বানিয়ে চলেছে। সত্যিই, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি। বড়ই বেশি। বলতে গেলে অবিশ্বাস্যই।'

ডাক্তার মাথা নাড়েন 'না হে, এটাও মানুষের সত্ত্বার বৈপরীত্যের প্রকাশ। বলতে পারো, দুই বিপরীত সত্ত্বার যুদ্ধ, মনের মধ্যে। তোমার হেনরী আসলে সমুদ্রকে ভয় পায়।' হেজেল বিস্ময় সংশয় জড়ানো গলায় বলে 'সত্যি?' 'হ্যাঁ।

কিন্তু ওর মনে সমুদ্র সম্পর্কে কোন গোপন রাগ আছে অথবা লোভ। নৌকো বানানো হলেই সমুদ্র অভিযানে যাবে—সমুদ্রকে শাসন করবে গোপন বাসনা আছে ওর মনে। যার ফল হিসেবে সে নৌকোটা বানায়। তার সমুদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই অথবা লোভের, গোপন বাসনার প্রতীক ঐ নৌকো বানানো। অথচ নৌকো বানানো শেষ হলেই, লোকে সবাই বলবে, ওটাকে জলে দিচ্ছে না কেন? ওটা নিয়ে সমুদ্রে যাচ্ছে না কেন? যে সাহস ওর নেই। আসলে, সমুদ্রকে ভয় করে তোমার হেনরী। তাই নৌকোটা শেষ হবার মত হয়ে এলেই তাই আবার নতুন করে শুরু করে। মনের দুই দ্বৈত সত্ত্বার অবিরত যুদ্ধর প্রমান এই ঘটনা।'

অধ্যায় ঃ ৭

প্যালেস ফ্লপ হাউস থমকে আছে, উন্নতিহীন একটি স্থির বিন্দুতে। প্রথমে ম্যাক, এডি, হেজেল, হিউজি, জোন্স, ওরা সবাই যখন এখানে উঠে এসেছিল—বসবাসের জন্যে, জায়গাটাকে শুধুমাত্র রোদ বৃষ্টি থেকে মাথা গোঁজবার ঠাঁইয়ের থেকে একটু বেশি কিছুই ভেবেছিল তারা গুরুত্ব দিয়েছিল। যখন তাদের যাবার অন্য সব জায়গা পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বাগত জানাবার আশ্রয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন ওরা উঠে এসেছিল, আচম্বিত পাওয়া সুযোগের এই বাসস্থানে। জায়গাটা, অথচ, একটা বিশাল মাছ খাদ্যর বোঁটকা গন্ধ ভরা ঘর আর দুটো জানালা ছাড়া আর বেশি কিছুই ছিলনা। কাঠের দেওয়াল রঙবিহীন, শক্ত কংক্রীটের মেঝে। জায়গাটাকে ওরা পছন্দ করেনি। ম্যাক কিন্তু বুঝেছিল একটা ধরন সংস্থাগত শৃঙ্খলাবোধ জরুরী। যেখানে, নানা ভিন্ন চরিত্রের, উদ্ভট মানসিকতার এতগুলো মানুষ এক সঙ্গে—একই ছাদের নীচে বসবাস করবে। ইদানীং, এযাবৎ যা কখনো ওরা করেনি। তাই প্রথমেই, সে একটা চক দিয়ে মেঝেতে কতগুলো চৌকো খোপ তৈরি করে। সাতফুট লম্বা চার ফুট চওড়া, প্রত্যেকটা খোপে সে নাম লিখে দিল। এটা হলো, একেকজনের বিছানা। সীমা পরিধি নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেকের জন্যে রইল নিজস্ব জমির অধিকার যা নাকি ভাঙ্গা চলবে না, অতিক্রম করার অযোগ্য, আইনত। (অবশ্যই ওদের নিজস্ব গোষ্ঠীতান্ত্রিক আইন মতে) ঘরের বাকিটাতে, সবার সমান অধিকার বজায় রইল।

ক্রমে ধীরে ধীরে বাড়ীটাকে তারা ভালবেসে ফেলল। এর আগে, তারা কোনদিন স্বাধীনভাবে কোন বাড়ীর দখলদারী ভোগ করেনি। শীত-রোদ-বৃষ্টি, তাদের জীবন কেটেছে প্রকৃতির ব্যপ্ততায়। নগ্ন, অসহায় এবং রুক্ষ্ম। কখনো সজল, হিমার্ত। প্রথমবার, ওদের সবার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, নিজস্ব

আশ্রয়ের ছাদের তলায় দাঁড়িয়ে। তারপর একদিন, হিউজি একটা সামরিক খাটিয়া নিয়ে বিজয়গর্বে ফিরল। চৌকিটার ক্যানভাসটা জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া। সবাই মিলে ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে সেলাই করে সেটাকে ব্যবহার যোগ্য বানিয়ে তুলল। সেই রাতে, সবাই মাটিতে শুয়ে দেখল, হিউজি তার রাজশয্যায় শুয়ে গভীর আরামের নিঃশ্বাস ফেলছে। অন্যদের সবার আগে সে ঘুমিয়ে পড়ল, তার নাক ডাকতে শুরু করল। পরদিনই, ম্যাক কোথা থেকে একটা সোফা কাম বেড ঘাড়ে করে এনে হাজির হলো। যার গদী প্রায় নিঃশেষিত—স্প্রিংয়ের কঙ্কাল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। এরপরই, ওদের মধ্যে বাড়ীটার শ্রী ফেরানো—খোলতাই করার অলিখিত, তীব্র প্রতিযোগীতা শুরু হলো। একটা চেয়ার, (আসনটা অর্ধেক ভাঙ্গা) পুরনো কার্পেট (অবশ্যই, যথেষ্ট ছেঁড়া) একটা দেওয়াল ঘড়ি (কাঁটা বিহীন, সময় প্রদানে অক্ষম) এক খাবার টেবিল মাস খানেকের মধ্যে, বাড়ীটা অতি সজ্জিত অথবা সজ্জা জর্জরিত হয়ে উঠল। দেওয়াল গুলো চুনরঙ করা হলো। যাতে সেটা আরো ঘোলাটে-—অস্বচ্ছ, প্রায় অপার্থিব ছোঁয়া লাগা, মনে হতে লাগল। এবং সেই দেওয়ালে ছবি টাঙানোর কাজও শেষ হলো স্বল্পবাস-স্বর্ণকেশী সুন্দরীরা, যাদের হাতে কোকাকোলা অথবা বিয়ারের কৌটো—বিজ্ঞাপিত যে পণ্যটির সে মডেল হয়েছে অবশ্য, হেনরী আসবার পর, মৌলিক শিল্পকর্মের অভাবটা মিটে গেল। দেওয়ালে জায়গা পেল তার শিল্প নমুনা। দু-দুটি। এমনকি একটা 'যদিও ভাঙ্গা তবুও যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য' স্টোভও জোগাড় হয়ে গেল পর্যন্ত।

বাড়ীটার প্রতি, এভাবেই ওদের মনে গর্ব জন্ম নিলো। এবং গর্ব জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে—আশ্রয় হয়ে উঠল, আশ্রয় হিসেবে পরিপূর্ণতা পেলো। এডি মর্নিং গ্লোরী ফুলের সারি বসালো। আর হেজেল, খুঁজে খুঁজে কোথা থেকে যেন দুষ্প্রাপ্য 'ফুশচিয়া' গুল্ম এনে বসালো। ফলে, প্রবেশ দরজাটা যথেষ্ট আভিজাত্যের সম্ভ্রান্ততা পেলো। ম্যাক এবং তার দলবলের প্রিয় হয়ে উঠল জায়গাটা। এবং তারা মাঝে মধ্যেই, তাদের অহঙ্কারের জায়গাটাতে অতিথি আনতে লাগলো। আশ্রয়হীন, কোথাও যাবার নেই, এরকম মানুষদের মাঝে মধ্যে দু একদিন অতিথি করে আনত। আসলে যা নাকি, নিখাদ আতিথ্যের থেকেও, তাদের অহঙ্কারবোধের গর্বটাকে প্রদর্শীত করার উদ্দেশ্য থেকেই করা হতো।

এডি, 'লা ইডা' বারের বার টেন্ডার হিসেবে কাজ করে। যদিও অনিয়মিত হিসেবে। বারের নিয়মিত কর্মী হোয়াইটি অসুস্থ হলেই সে কাজ করার সুযোগ পেত। আর সে সুযোগ সে ঘনঘনই পেত। কারণ হোয়াইটির অসুস্থতা প্রায় প্রাত্যহিক ছিল। অসুস্থ হোয়াইটিও, পরিবর্ত হিসেবে এডিকে পছন্দ করত। কারণ, সে জানত, এডি বিশ্বাসযোগ্য সে কখনো তার চাকরীটা খাবার—নিজে সেই

কাজটা হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করবে না। তা এডি করেও নি। আর বার মালিকও এডিকে পছন্দ করত। কারণ, অন্য কর্মীদের মত এডি পানীয়ের বোতল চুরি করত না। তবে, বার মালিকের সঙ্গে অলিখিত চুক্তির মত, সে তার পায়ের কাছে একটা বড় জগ রেখে দিত। যার মুখে একটা ফানেল লাগান। খদ্দেরদের কাছ থেকে গ্লাসগুলো ফিরে আসার পর ধোবার আগে, গ্লাসগুলোর মধ্যে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত সেটা সেটুকু ফানেল গলিয়ে জগের মধ্যে চালান করে দিত। একটু রাতের দিকে, যখন গ্রাহক খদ্দেরদের হিসেব বুদ্ধি বোধ ঘোলাটে হয়ে উঠত, এডি গ্লাস পুরো করে নিত তারপর গ্রাহকের কাছে সেটা পাঠাবার আগে, সেটার কিছুটা ফানেল গলিয়ে নিজস্ব সংগ্রহে চালান করে দিত। কারণ, নিজস্ব অভিজ্ঞতায় এডি জানত—বুঝেছিল, ঐ সময়টায় খদ্দেররা—আধ গ্লাস পান করেও ততটাই মাতাল হতো হয়, এক গ্লাসেও যতটা হতো। তখন, তারা মাতাল হয়ে ওঠার অপেক্ষায় মাতাল হয়ে যাবার মানসিকতায় থাকে, সেকারণেই ব্যাপারটা ওরকম ঘটে—হয়ে ওঠে। সে যাইহোক, ফলে এডি যখন রাতে বাড়ী ফেরে, তার এক গ্যালনের জগটার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পুর্ণ হয়ে ওঠে। তবে অসুবিধা বা সুবিধা (ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে, মদ্যপান রুচির তারতম্য বিচারে) হলো এই যে, জগটা নানা মদের মিশেল হয়ে ওঠে। রাম, হুইস্কি, বিয়ার, জিন, বরবোন, স্কচ, এরকম নানা স্বাদে ঐ ককটেল এক অন্য মাত্রা পাওয়া পানীয় হয়ে ওঠে।

অধ্যায় ঃ ৮

এপ্রিল ১৯৩২। হেডিয়ানডো ক্যানেরী-তে আবার একটা বয়লার পাইপ বিস্ফোরণ ঘটল। গত দু সপ্তাহে এটি তৃতীয় ঘটনা। ফলে, বোর্ড অফ ডাইরেক্টরী, যার মধ্যে শ্রী র‍্যানভলফ-ও ছিলেন, সিদ্ধান্ত নেয়, নতুন একটা বয়লার বসিয়ে নেওয়াই, বারবার সারাই করার থেকে কম ব্যয়সাপেক্ষ হবে। সুতরাং পুরনো বয়লারটিকে খুলে খালি জায়গাটায় রেখে দেওয়া হল। লি চঙের দোকান এবং বিয়ার ফ্ল্যাগ রেস্টোরেন্টের মাঝামাঝি জায়গায়। শ্রী র‍্যানভলফ ভাবতে উপায় খুঁজতে থাকলেন, কি ভাবে ওটার থেকে দু পয়সা কামানো যায়। কিন্তু তার আশায় ছাই দিয়ে প্ল্যান্ট ইনজিনীয়ার পুরনো বয়লার পাইপটাকে আরেকটি পুরনো যন্ত্র সাবানোর কাজে ব্যবহার করে ফেললেন। শুধু খোলের কিছুটা অংশ পড়ে রইল। সেটাকে দেখে এক—চাকাবিহীন লোকোমোটিভ ইঞ্জিন মনে হত। নাকের দিকে একটা বড় দরজা ছিল। আর নিচের দিকে একটা আগুন

নির্গমন দরজা। বাইরে পড়ে থাকতে থাকতে ক্রমে ওটার রূপালী রঙ চলে গেল—জং ধরল। ওটাকে ঘিরে গাছ-গাছালি, লতার ঝোপঝাড় গড়ে-বেড়ে উঠতে লাগল। ১৯৩৫। শ্রী এবং শ্রীমতী ম্যালোয়ী ওটাতে বসবাস করতে শুরু করলেন। বেশ সুন্দর একটা অ্যাপার্টমেন্ট হয়ে উঠল জিনিষটা। যথেষ্ট সুখে বসবাসযোগ্য। হ্যাঁ, আগুন নির্গমন দরজাটা দিয়ে প্রবেশ করতে হলে হাঁটু গেড়ে, হাত মেঝেতে ঠেকিয়ে ঢুকতে হতো। এবং তাতে হাঁটু এবং হাতের তালু নোংরা হয়ে যেত। এই সমস্যা এড়াতে ম্যালোয়ীরা ভেতরের মেঝেতে—দরজার সামনেই একটা ম্যাট্রেস পেতে দেয়। ফলে নোংরা হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এটুকু ছাড়া, এরকম শুকনো, বড়সড় জায়গা, এবং গরম, বাসস্থান পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

এই বড় পাইপটার আশেপাশে হেডিয়ন ডোর আরো বেশ কিছু পরিত্যক্ত বড়-ছোট নানা আকারের পাইপ রাখা ছিল। ১৯৩৭তে সমুদ্র থেকে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতে লাগল। মাছের কারবারে জোয়ার এলো। বাইরে থেকে প্রচুর কর্মী এলো ক্যানেরী-তে কাজ করার জন্যে। তাদের বাসস্থানের আকাল, মেটাতে স্ত্রী ম্যালোয়ী পাইপগুলোকে ভাড়া দিতে শুরু করলেন। খুব শস্তায় মাথা গোঁজবার রাতে ঘুমোবার জায়গা পেয়ে শ্রমিকরাও খুশি হলো। পাইপের দু মুখে মোটা 'টার' কাগজ আটকে দেওয়া হলো। মেঝেতে কার্পেট টুকরো। চমৎকার আরামদায়ক শোবার ঘর হয়ে উঠল। সব মিলিয়ে শ্রী ম্যালোয়ী বেশ ভাল ব্যবসা করলেন। এসবের সঙ্গে, একটা ছোট্ট পরিবর্তনও ঘটল। সেটা শ্রীমতি ম্যালোয়ীর চরিত্রে। যতদিন পর্যন্ত শ্রী ম্যালোয়ী বাড়ীর মালিক বাড়ীওয়ালা না হয়ে উঠেছিলেন ততদিন কোন অসুবিধা হয়নি সব ঠিকঠাকই চলছিল। কিন্তু বাড়ীওয়ালী মর্যাদা রক্ষার্থে ক্রমেই সচেষ্ট হয়ে উঠতে লাগলেন শ্রীমতি ম্যালোয়ী। বদলাতে শুরু করলেন। প্রথমে এলো একটা উলের কম্বল। তারপর হাত মুখ ধোবার বেসিন। এবং সিলকের রঙীন কাপড়ের ঢাকনা লাগানো দেওয়াল বাতিও এসে পড়ল। এসব পর্য্যন্ত তবু ঠিক ছিল। কিন্তু যেদিন, শ্রীমতি ম্যালোয়ী বললেন 'হলম্যান-তে লেস লাগানো সুন্দর সুন্দর নীল আর গোলাপী রঙ পর্দা বিক্রি হচ্ছে সেলতে, ১.৯০ ডলার মাত্র দাম পড়ছে।' শ্রী ম্যালোয়ী আঁতকে উঠলেন 'পর্দা পর্দা আমাদের কোন কাজে লাগবে?' 'ওটা কোন কথাই নয়। সুন্দর জিনিস যে কোন জায়গাতেই ব্যবহার করা চলে। যে কোন্ জায়গার—পরিবেশের সৌন্দর্য খুলে যায়-পাল্টে যায় এসব জিনিষের ব্যবহারে।' গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলেন তিনি। শ্রী ম্যালোয়ী

আর্তনাদের গলায় বলেন 'কিন্তু প্রিয়তমা, আমাদের পর্দা কোন কাজে লাগবে? আমাদের তো কোন জানালাই নেই।' উত্তরে, প্রথমে শ্রীমতির নাকের পাটা ফুলে উঠল। বুক উঠতে নামতে শুরু করল। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠল। অতঃপর তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন 'মাত্র, মাত্র ১.৯০ ডলার, তারই জন্যে তুমি আমায় খোঁটা দিচ্ছ।' শশব্যস্ত ভঙ্গীতে শ্রী ম্যালোয়ী বললেন 'সোনা, আমি তোমায় মোটেই খোঁটা দিচ্ছি না। অথবা আমি পর্দার বিরোধীও নই। আমি শুধু বলতে এবং বোঝাতে চাইছি, পর্দা কেনাটা, আমাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়' তবুও শ্রীমতির কান্না থামল না 'পুরুষেরা, মেয়েদের অনুভূতিগুলো কখনোই বোঝার চেষ্টা করেনা। তারা কখনো নিজেদের মেয়েদের জায়গায় রেখে পরিস্থিতি বিচার করার চেষ্টা করে না।' কথাগুলো, খেদময় ভঙ্গীতে স্বামীর দিকে ছুঁড়ে দেবার সময় তার কানার তাল লয় বরং আরো দ্রুততর হয়ে উঠল।

এর পরবর্তী ঘটনাটি, স্বামী স্ত্রীয়ের ব্যক্তিগত। নিছক মান-অভিমান ভঞ্জনের ব্যাপার। আমাদের উচিত হবেনা সে ঘটনায় উঁকি মারা।

অধ্যায় ঃ ৯

ডাক্তারের গাড়ী যখন আবার ল্যাবরেটরীতে ফিরে এলো, ম্যাক এবং তার দলবল আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিল—হেজেল, ডাক্তারকে সহায্য করছে তারামাছের বস্তাগুলো ভেতরে বয়ে নিয়ে যেতে। কিছুক্ষণ বাদেই, সে বাইরে বের হয়ে আসে। তার শরীর-পোষাক—জিনের প্যান্ট, সব কিছুতেই ভিজে ভাব। যাতে, স্পষ্ট-সাদাটে আভা। সামুদ্রিক লবণের ছোপ। একটা থামের ওপর বসে হেজেল তার ভিজে—সপসপে ক্যাম্বিশ জুতোটাকে শুকোবার চেষ্টা করছিল। ম্যাক ও তার দলবল এগিয়ে যায় 'ডাক্তারবাবুর খবর কি?' 'ভাল। সব ঠিকই আছে।' 'ডাক্তার-এর মনের ভাব কি ভাল আছে?' 'হ্যাঁ, আমরা ৩০০ তারামাছের চাহিদা পূরণ করলাম। ওর মন ভালই আছে।' ম্যাক সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলে 'সবাই মিলেই যাই তাহলে চলো।' তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয় 'না সবাই মিলে দল বেঁধে যাওয়াটা উচিত হবেনা। ডাক্তার হয়ত কিছু মনে করতে, অসন্তুষ্ট হতে পারেন। একজন কি দুজন যাওয়াই ভাল' হেজেল সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকায় 'ব্যাপারটা কি?' ম্যাক কাঁধ নাচায় ছোট একটা দরকার আছে।' ও হেজেলকে এখনি এমুহূর্তে ভেঙ্গে খুলে বলেনা ব্যাপারটা। আসলে গতরাতে, এডি-র চালান করে আনা 'মিশ্র' পানীয় পান

করতে করতে ওরা কজন হঠাৎ করেই ঠিক করে, ডাক্তার অত্যন্ত ভালমানুষ। তাদের বন্ধু হেজেলের জন্যে ডাক্তার অনেক কিছু করেছেন। তাই তাঁর জন্যে একটা পার্টি দেওয়া উচিত। তাকে সেকথা বলতেই আজ তারা এসেছে। হেজেলকে তারা এটা এক চমক দিতে চায়। তাই এখনি তাকে জানাতে চায় না।

ম্যাক ল্যাবরেটরীতে ঢুকল। ডাক্তার টুপিটা খুলে, তারা মাছের বস্তাগুলো থেকে ভিজে মাছ গুলোকে বের করে শুকনো মেঝেতে পেতে পেতে দিচ্ছিলেন শুকোবার জন্যে। লম্বা সার হয়ে মেঠেতে ফুটে উঠছিল তারার দল, যেন আকাশ থেকে খসে পড়া। এমন সময় ম্যাক ঘরে ঢুকল। ডাক্তার সামান্য বিপন্ন বোধ করলেন। কাজ করতে-করতে তার সুঁচোলো দাড়ি ঘামে ভিজে উঠেছিল। তিনি তাতে হাত বুলোলেন। অস্বস্তি তবু কাটলনা। না, ম্যাককে নিয়ে তার কোন সমস্যা নেই। এটা ঠিক সত্যিই সেরকম ব্যাপার নয় যে প্রতিবার ম্যাক কোন সমস্যা নিয়ে আসে। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তাই-ই। কিছুনা-কিছু, প্রতিবার, ওর সঙ্গে ঘরে ঢোকে। 'কেমন আছেন ডাক্তার?' 'ঠিকঠাক, ভালই' অস্বস্তি, তার ভঙ্গীতে। 'ফিলিস মায়ে-কে শুনলাম, বিয়ার ফ্ল্যাগ-তে একটা মাতাল ঘুঁষি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। দাঁতটা আমায় দেখিয়েছে সে' 'হ্যাঁ শুনেছি। ও কি কোন ডাক্তার দেখিয়েছে?' 'না, সেরকম কিছু তো শুনলাম না।' 'ওর জন্যে কিছুটা সালফা পাঠিয়ে দেব।' ডাক্তার অপেক্ষা করতে লাগলেন। চারদিক জুড়ে প্রবল ঝড়টা ভেঙ্গে পড়ার জন্যে। সময় গুনতে লাগলেন। তিনি জানেন ম্যাক এমনি আসেনি, বিশেষ কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তার আসার কারণ ঘটেছে। ম্যাক আবার বলে 'ডাক্তার, আপনার এখন আর কোন প্রাণীর দরকার আছে?' ডাক্তার একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে 'কেন?' ম্যাক এবার প্রকাশিত হয় 'আসলে ডাক্তার, আমার এবং দলের অন্যদের, কিছু বাড়তি রোজগারের দরকার পড়েছে। একটা মহৎ উদ্দেশ্যের কারণেই, বাড়তি অর্থটার প্রয়োজন পড়েছে।' ডাক্তারের মুখে হাসি ফোটে 'ফিলিস মায়ের দাঁতের চিকিৎসার জন্যে, আশাকরি?' ম্যাক একটা শ্বাস ছাড়ে 'ইয়ে, মানে—না। এটা, একটা বেশ্যার দাঁতের চিকিৎসা করানোর চেয়ে অনেক বেশি দরকারী-গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন? যদি আপনার কিছু প্রয়োজন থাকে। আমরা, ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলাম, বাড়তি—তাড়াতাড়ি, রোজগারের এটাই শ্রেষ্ঠ পথ।' ডাক্তার আবার তারামাছগুলোকে সাজাতে লাগলেন। তিনি ভাবছিলেন। এখনো পর্যন্ত ব্যাপারটা সহজ এবং নিষ্পাপ সরল, সন্দেহাতীত। 'হ্যাঁ, আমার তিন-চারশ ব্যাঙ দরকার। অবশ্য আমি নিজেই ওগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারতাম। কিন্তু আজরাতে আমায় 'লা জোললা'তে

যেতে হবে। ওখানে আজ জোয়ার আসবে। ভাল কিছু অক্টোপাসের চাহিদা পূরণ করতে হবে। যা আজ ওখানে পাবার সম্ভাবনা আছে।' 'ব্যাঙের জন্যে কত দর দেবেন আপনি?' 'এক্ষেত্রে সাধারণ দরই। পাঁচ সেন্ট প্রতিটির' ম্যাক খুশির গলায় বলে। ঠিক আছে। ব্যাঙের ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ফারমেল নদীর কাছে একটা জায়গা আমি জানি, সেখানে প্রচুর নানা জাতের ব্যাঙ পাওয়া যায়।' 'বেশ, তোমরা যতগুলো আনবে সব আমি নিয়ে নেব। আমার দরকার কিন্তু তিনশ।' এবার ম্যাক তাকে বলে, 'ডাক্তার, আমরা কি আপনার গাড়ীটা ব্যবহার করতে পারি?' ডাক্তার মাথা নাড়ে 'না, আমি তোমাকে বললাম না, আমায় আজ রাতে লা জোললা-তে যেতে হবে।' ম্যাক মাথা দোলায়, 'ও হ্যাঁ, ঠিক আছে, আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা না হয় লি বঙের ছোট ট্রাকটা নিয়ে যাব।' কথা শেষ করে ম্যাক ডাক্তারের দিকে তাকায়। ডাক্তার দেখেন ম্যাকের মুখটা হঠাৎই যেন ঝুলে পড়েছে। দ্বিধাগ্রস্থ, সেই ভঙ্গীতেই সে বলে, 'ডাক্তার আপনি কিছু অগ্রিম দিতে পারেন? পেট্রলের দামের জন্যে?' ডাক্তার মাথা নাড়েন। এই ফাঁদে তিনি পা দিতে পারেন না। এর আগে একবার হেনরীর সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছিল। এবং বিশ্বাস করে তিনি ওকে অগ্রিমও দিয়েছিলেন। তারপরই, ব্যাটা বৌ পেটানর আপরাধে জেলে চলে যায় কয়েকদিনের জন্যে। চুক্তি পূরণ তো করেইনি, টাকাটাও আর ফেরত দেয়নি। না, এদের বিশ্বাস করা যায় না। ম্যাক, ডাক্তারের মাথা দোলানোর নেতিবাচক ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে। গভীর হতাশার ভঙ্গীতে অতপর সে বলে 'তাহলে বোধহয় আমাদের যাওয়া সম্ভব হবে না।' ডাক্তার মুশিকলে পড়ে যান। ব্যাঙগুলো তার সত্যিই দরকার। তাড়াতাড়ি। তিনি একটা পদ্ধতি খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে চাইলেন, যেটা ব্যবসা, কিন্তু তার প্রতারিত হবার সম্ভাবনা থাকবে না। পেয়েও গেলেন। 'আমি তোমাকে বরং আমার পেট্রল ষ্টেশনের কার্ডটা দিচ্ছি। সেটা ব্যবহার করে তমি দশ লিটার পেট্রল পাবে। কোন দাম দিতে হবে না।'

সুতরাং ব্যাপারটা সেরকমই হলো। যদিও, ম্যাক যখন কার্ডটা নিয়ে তাকে নিশ্চিন্ত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর থেকে চলে যাচ্ছিল, তখনো তিনি অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিলেন। মাক এবং তার দলবলের সঙ্গে কোন কাজই তার জন্যে লাভজনক হয়নি। ল্যাবরেটরী ছেড়ে বের হয়ে এসে রাস্তা পার হয়ে লি চঙের দোকানের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে ম্যাককে ঢুকতে দেখেই, লিয়ের কাউন্টার ডেস্কের ওপর জড়ানো আঙুলগুলো দ্রুততর অস্থির হয়ে ওঠে, নড়েচড়ে। ম্যাক সময় নষ্ট না করে সোজা সরাসরি কাজের কথায় চলে যায় 'লি, আমার ডাক্তারের কাছ থেকে ব্যাঙ ধরার বরাত পেয়েছি। আজ রাতে কারমেল নদীর

কাছে যাব আমরা। তোমার ট্রাকটা প্রয়োজন।' ডেস্কের ওপর লি-এর হাতটা থেমে যায়। সতর্ক চোখে ম্যাককে লক্ষ্য করতে থাকে। তার সেই নজরের মধ্যে উৎকণ্ঠিত—ভীত বেড়ালের, লেজের ভাব ছড়িয়ে পড়ে। টানটান, অধীর। তারপর চীনা শীতলতার চোখে সে বলে 'ট্রাকটা ভাল নেই। বিগড়েছে।' ম্যাক তীব্র চোখে লি-এর দিকে তাকায় 'দেখো লি, কাজটা আমরা নিয়ে ফেলেছি। এখন আর সেটা ফেরান যাবেনা। এমন কি, ডাক্তার আমাদের দশ লিটার পেট্রলের কার্ডও দিয়ে দিয়েছেন। এখন আর ওকে নিরাশ করা যাবেনা। গে, মানে হেনরী, ভাল মিস্ত্রি। ও তোমার ট্রাকটাকে নিশ্চয়ই সরিয়ে তুলতে পারবে।' লি মাথাটাকে পেছনে হেলিয়ে দিয়ে তাকাল, যাতে সে অর্ধেকটা কাঁচের চশমাটা দিয়ে ম্যাকের মুখটাকে ভাল করে দেখতে পারে। সেখানে আপত্তিজনক কিছু খুঁজে পেলনা সে। ম্যাকের উদ্দেশ্য সত্যই মনে হচ্ছে। 'তোমরা কখন রওনা হবে?' সে বলে। 'সময়ই লাগবে মোট কতক্ষণ?' 'রাতে। হয়ত গোটা রাতও লাগতে পারে। আবার অর্ধেক রাতেই কাজ সারা হয়ে যেতে পারে। আসল কথা হচ্ছে—আমাদের ঝোলায় তিনশটি ব্যাঙ কতক্ষণে ভরতি হবে।' উদ্বিগ্ন লি, চারপাশ থেকে আটকে পড়া লি, উপায়ন্তরহীন-ফাঁদে পড়া লি বলে 'ঠিক আছে।'

অধ্যায় ঃ ১০

ফ্র্যাঙ্কি ওয়েস্টার্ন বায়োলজিক্যালে আসতে শুরু করেছে এগার বছর বয়স থেকে। প্রথম দিকে সে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর একদিন, হঠাৎই, সে ভেতরে ঢুকে আসে। তারপর সংগৃহীত প্রাণীগুলোর কৌটোয় লেবেল লাগাতে লাগাতে ডাক্তার তার দিকে ফিরে তাকালেন, 'বাচ্ছা, তোর নাম কি রে?' 'ফ্র্যাঙ্কি' 'থাকিস কোথায়?' আঙুল তুলে পাহাড়ের দিকটা দেখায় সে। 'স্কুলে যাসনি কেন?' ডাক্তারের প্রশ্নের জবাবে সে বলে 'আমি স্কুলে পড়িনা' ডাক্তার অবাক চোখে ওর দিকে ভাল করে তাকান। আর তখনি তার নজরে পড়ে ওর এলো মেলো চুল, নোংরা আঙুল, কাদামাখা পোষাকের দিকে। 'কি নোংরা রে তুই। কখনো স্নান করিস না—হাত পা ধুসনা?' ফ্রাঙ্কির সারা শরীরে একটা অচেনা স্রোত বয়ে যায়—কিছুটা লজ্জা, কিছুটা অপমান মেশা। তারপর থেকে প্রতিদিনই ফ্র্যাঙ্কি হাত পা ভাল করে ধুতো ঘষে ঘষে। এবং, তারপর থেকে প্রতিদিনই নিয়মিত ল্যাবরেটরীতে আসতে শুরু করে সে। এক নারীর সহমর্মীতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে। ডাক্তার ফোন করে খবর

নিয়েছিলেন, ফ্র্যাঙ্কি যা বলেছে সত্যি 'স্কুলে ওরা আমাকে চায়না।' আসলে ছাত্র হিসেবে ফ্র্যাঙ্কি তেমন তুখোড় নয়। তাছাড়া, সহযোগের ক্ষেত্রেও সমস্যা ছিল ওর। ফলে ওর জায়গা হয়নি, অবাঞ্ছিত হয়ে উঠেছিল, অথচ, সে কিন্তু বোকা-হাঁদা নয়। 'তুই এখানে কেন আসিস রে?' 'তুমি আমায় মারোনা, তাই' 'বাড়ীতে তোকে মারে বুঝি? কে মারে?' 'কাকারা' 'আর তোর বাবা, সে মারেনা?' 'বাবা নেই। মরে গেছে' 'আর মা?' 'মা কাকাদের সঙ্গে থাকে।' ডাক্তার ওর মাথার চুল ঘেঁটে দেন আদর করে। এক বিষন্নতায় ভরে যায় তার মন। লি চঙের দোকান থেকে তিনি ওর জন্যে একজোড়া জুতো আর ডোরাকাটা সোয়েটার কিনে দেন। সে, ডাক্তারের ক্রীতদাস হয়ে ওঠে।

প্রতিদান হিসেবে সে ল্যাবরেটরীর কাজ করে দিতে চাইত। ধোয়া মোছা ঝাঁটা দেওয়া। সবকিছু গুছিয়ে রাখা, পরিষ্কার করে রাখা। ডাক্তার না চাইলেও সে এসব করত। যদিও, সব কাজ ছোট্ট হাতে ঠিকঠাক ভাবে করে উঠতে— সামলে উঠতে পারত না সে। ডাক্তার অবশ্য ওকে সব বুঝিয়ে দিতেন। আকার অনুযায়ী প্রাণীগুলোকে বাছাই করা, সাজিয়ে রাখার ব্যাপারে দক্ষ ছিলনা সে। গুলিয়ে ফেলত, খেই হারিয়ে ফেলত। ডাক্তার ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, কিভাবে আঙুল ফেলে, আকার বাছাই করতে হয়। তবে ফ্র্যাঙ্কির সব থেকে ভাল লাগত-আন্দাজ পেতো যখন এ বাড়ীর দোতলায় পার্টি হতো। ডাক্তারের চেনা জানা-বন্ধু, আত্মীয়েরা আসতেন। আলো, ভালমন্দ খাবার-পানীয়, গ্রামোফোনটা বাজত সুরেলা আ্যায়াজের গান বাজনা সহ। হৈ-চৈ, ঠাট্টা ইয়ার্কি-আড্ডা। একতলার চেয়ারটায় বসে সে সবকিছু শুনত। অনির্বচনীয় এক আনন্দে তার মন ভরে উঠত। পুরো ব্যাপারটা যেন বিশাল, উজ্জ্বল, রঙীন ছবির মত মনে হত তার কাছে। খুশীতে উদ্বেল হয়ে উঠত সে। সুন্দর সাজপোষাকে কত পুরুষ। সুন্দরী সব মেয়েরা। কত লোক আসত, ঐসব পার্টিতে। একদিন ফ্র্যাঙ্কি একটা চরম দুঃসাহসের কাজ করল। ছোট একটা পার্টি চলছিল ল্যাবরেটরীর দোতলায়। ডাক্তার রান্নাঘরে গ্লাসে বিয়ার ভরছিল। ফ্র্যাঙ্কি তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎই, সে একটা গ্রাস তুলে নেয়। ডাক্তারের পেছন পেছন ঘরে ঢুকে আসে। সামনের যুবতী সুন্দবী মেয়েটির দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দেয়। 'ওহ, ধন্যবাদ' যুবতীটি আন্তরিক গলায় হাসে। ডাক্তার ওর পিঠ চাপড়ে দেয় 'সাব্বাশ ফ্র্যাঙ্কি। আমার অনেক উপকার করলে।'

ফ্র্যাঙ্কি ঘটনা ভুলতে পারে না। মেয়েটির হাসি, 'ওহ, ধন্যবাদ', ডাক্তারের পিঠ চাপড়ানোর উৎসাহদান। এর দিন কয়েকদিন পর বাড়ীতে একটা বড় পার্টি ছিল।' ফ্র্যাঙ্কির মনে একটা পরিকল্পনা তৈরি হলো। সে স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছিল, কি ঘটবে—কেমন ভাবে ঘটবে। সমস্ত ছক তৈরি করে ফেলে সে। তারপর উৎসবের দিন, সবাই যখন ব্যস্ত হৈ-চৈ করতে। কথাবার্তা-হাসির শব্দ। গ্রামোফোনটা বাজছে। ফ্র্যাঙ্কি নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকে যায়। ট্রে-এর ওপর গ্লাসগুলোকে সাজায়। বিয়ার ঢেলে গ্লাসগুলো পরিপুর্ণ করে। তারপর দরজা খুলে, শক্ত হাতে ট্রে-টাকে আঁকড়ে ধরে ঢুকে পড়ে ঘরে। সে জানে, কি করতে হবে—কেমন ভাবে করতে হবে। লম্বা একটা শ্বাস টেনে সে এগিয়ে যায়। প্রথমে সেই সুন্দরী যুবতীটি, যে বলেছিল 'ওহ্, ধন্যবাদ।' ফ্র্যাঙ্কি ট্রে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে যায়। বাড়িয়ে ধরে। এবং তার মুখের দিকে তাকায়। ঠিক সেই মুহূর্তে চরম অপ্রত্যাশিত অঘটনটা ঘটে। যুবতীটির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই-চোখে চোখ পড়তেই, ওর শরীর বিশ্বাসঘাতকতা করে। শরীরের সহযোগ শৃঙ্খল ভেঙ্গে যায়। হাতটা কেঁপে ওঠে। হাঁটু দুটে নড়বড় করে ওঠে। কি অসহায় পরিস্থিতি। ফ্র্যাঙ্কি প্রাণপণে ভারসাম্য শারীরিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। অথচ ক্রমে তা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে থাকে। মাংসপেশীতে আতঙ্ক ছড়ায়। সুক্ষ্মতর স্নায়ুগুলো এক মৃত অপারেটারের কাছে সংকেত প্রবাহ পাঠায়, যার কোন উত্তর ফিরে আসেনা।

হুড়মুড় করে গ্লাসগুলোসহ ট্রেটা ওর হাত থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে। কাঁচ ভাঙ্গার, ট্রের মেঝেতে আছড়ে পড়ার, সশব্দ তার পর—ঘর জুড়ে নেমে আসে এক পিনপতন স্তব্ধতা। নৈঃশব্দ্য। কয়েক মুহূর্ত, হতভম্ব-চলৎশক্তিরহিত, বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থালার পর ফ্র্যাঙ্কি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালায়। নিচে নেমে আসে। সোজা এসে ল্যাবরেটরীর বড় চেয়ারটার আড়ালে বসে, দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার নিচে নেমে আসেন। ফ্র্যাঙ্কির সামনে এসে দাঁড়ান। তখনো, অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে সে। কয়েক মুহূর্ত, ওর সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন ডাক্তার। অপেক্ষা করেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ধীর ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ান। চলে যান।

এ মুহূর্তে, তার, পৃথিবীর কারুরই, কিছু করনীয় থাকতে পারেনা। নেই।

অধ্যায় ঃ ১১

লি চঙের 'টি-ফোর্ড' মডেলের ট্রাকটির একটি আভিজাত্যপূর্ণ—ঐতিহ্যময় ইতিহাস আছে। ১৯২৩-তে প্রথম মালিক ডাক্তার ডব্লিউ. টি. ওয়াটার্সের সময়ে এটা একটা যাত্রীবাহী বাস ছিল। তারপর নানা হাত ঘুরতে-ঘুরতে, শেষে ফ্র্যান্সিস আলসোনেস-এর কাছে যখন সেটা এলো, সেটার এমন অবস্থা—জরাজীর্ণ দশা যে, তিনি সেটার শরীর-অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটছাঁট করে, একটা ট্রাক হিসেবে দাঁড় করান। কয়েক মাস বাদে, এক বিশাল অঙ্কের অপরিশোধিত মুদীখানার পাওনা হিসেবের বদলে, গাড়ীটা লি চঙের হাতে আসে। স্খলিত হতে হতে, সেসময় চালকের আসনের সামনের কাঁচটি পর্যন্ত বেমালুম হজম হয়ে গেছে। ইঞ্জিনটিও গড়বড় করছিল। পাকা হাতের দক্ষতাপূর্ণ মেরামতী-শুশ্রুষা চাইছিল। নেহাতই, লোহার কাঠামো আর চারটে চাকা ছাড়া, বলতে গেলে গাড়ীটার আর কিছুই সুস্থ ছিলনা। এবং লি-ও গাড়ীটাকে তেমন শুশ্রুষা দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। ফলে, বেশির ভাগ দিনই, চলৎশক্তিহীন অনড় হয়ে মুদীখানার পেছনের মাঠে গাড়ীটাকে অনড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যেত।

ম্যাক ও তার দলবল সকাল-সকাল উঠে পড়ল। কফি বানিয়ে খেয়ে নিল। তারপর ট্রাকে উঠে বসল। তাদের যাত্রা শুরু হলো। এর আগে, গতকাল অবশ্য গে-এর গোটা দিনটা কর্মব্যস্ত থাকতে হয়েছে গাড়ীটাকে দীর্ঘ যাত্রার ধকলের উপযোগ্য করে তুলতে। এছাড়া, ছোটখাটো কিছু তাত্ত্বিক সমস্যা ছিল। যেমন বর্তমানের কোন লাইসেন্স প্লেট ছিলনা। হেডলাইট ছিলনা। গে এবং ম্যাকের দলবল সারাদিন পরিশ্রম করে গাড়ীটাকে দৌড় উপযোগী করে তুলল। এই অভিযানের মালপত্র অবশ্য অতি সামান্যই ছিল। লম্বা হাতলওয়ালা জালের বাটি। এবং কয়েকটা শক্ত নাইলনের বস্তা। যদিও, শহরে শিকারীরা অভিযানে যেতে প্রচুর মদ এবং খাবার দাবার সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু ম্যাক সেসবের পক্ষপাতী নয়। এটা কোন অভিযান নামের বিলাসিতা নয়, রুটি রুজির প্রশ্ন। তাই ওরা সঙ্গে নিলো রুটি এবং পানীয় হিসেবে, গতরাতে এডির নিয়ে আসা মিশ্র পানীয়ের জগ। সেটা কাল রাতে নিজেদের উপভোগ বঞ্চিত রেখে ওরা সঞ্চিত রেখেছিল আজ কাজে লাগাবার জন্যে। অতএব, ট্রাক ছুটতে শুরু করে তার গন্তব্য পথে। প্রথম কাজ হিসেবে অবশ্য পথে—রেড উইলিয়াম সার্ভিস স্টেশনে থেমে ডাক্তারের কার্ড ব্যবহার করে দশ লিটার জ্বালানী ভরে নেওয়া হলো। এবং অবশেষে তারা কারমেল উপত্যকায় পৌঁছল। মুল হাইওয়ে থেকে চারমাইল ভেতরে ঢুকতে হয় কারমেল উপত্যকায় পৌঁছতে হলে। যতটা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার হবে ওরা ভেবে ছিল, তার কিছুই প্রায় ঘটল না। নিতান্ত

বাধা বিঘ্নহীন ভাবেই ওরা জ্যাক পাহাড়ের শীর্ষ অতিক্রম করে ঢাল বেয়ে নেমে এলো নদীর পাড়ে।

নদীর পাড় জুড়ে—সারা কারমেল নদীকে আবছা-ধোঁয়াটে করে তুলে সন্ধ্যা নামল। ক্রমে ঘন-চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক অন্ধকারে ডুবে গেল সমগ্র উপত্যকাটা। ছেলেরা অগ্নিকুন্ডের পাশে বসে গল্প জমানোর সাথে সাথে, নিজেদের শরীর গরম করার কাজটাও সেরে নিচ্ছিল। নদীর বুক থেকে হিম ঢেউ মাখা বাতাস যেন হাড়ে কামড় বসাচ্ছিল। ওরা বেশ কয়েক ছড়া পাইন পাতার ঝাড় মাটিতে বিছিয়ে দিল। বিছানার কাজ সারছিল সেটা। সেই পাইন পত্র শয্যা'য় শুয়ে ওরা পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা তীব্র ঝলককে, মনোরম—তারায় ভরা আকাশটাকে দেখতে পাচ্ছিল— দেখছিল। সে মুহূর্তে, ওদের ঘিরে সম্পূর্ণই ভিন্নতর এক পরিপার্শ্ব। ক্যানেরী রোও এর ভীড়—আঁশটে গন্ধমাখা-—প্রাচীনতা জর্জর—হট্টগোল, থেকে অনেক দুরতর, যে পরিপার্শ্ব।

অধ্যায় ঃ ১২

মনটেরী শহরের একটা ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্যিক ধারা আছে। রবার্ট লুই স্টিভেনসন এই শহরেই বাস করতেন। এবং, নিঃসন্দেহে, 'ট্রেজার আইল্যান্ড' উপন্যাসে ধরা রয়েছে এই শহরের প্রাকৃতিক অনেকটা প্রতিচ্ছবিই। এছাড়াও, এ শহরে আগে-পরে বাস করেছেন, এখনো বাস করেন—নানা মাপের, সাহিত্যিক উৎকর্ষতার বিচারে ছোট-বড়, বেশ কয়েকজন লেখক-সাহিত্যিক। যদিও, বর্তমানের লেখকদের মধ্যে পুরনো লেখকদের সেই সাহিত্য প্রজ্ঞা, সুগন্ধ, আভিজাত্য, কিছুই আর পাওয়া যায় না। জোস বিললিংসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে। মনটেরীর সাহিত্য খ্যাতির-অহংকারের, পারদ কয়েক ধাপ নিচে নেমে এসেছে দ্রুত, অতি দ্রুত। একটা নতুন পোস্ট অফিস হয়েছে। যার সামনেই নতুন টিউব কলটা। টিপলেই, যার মুখ ভরে জল ওঠে পোস্ট অফিসের উল্টো দিকেই থাকেন অতি বৃদ্ধ এক ডাক্তার। শহরের যাবতীয় অসুস্থতা-জন্ম-মৃত্যু, তার চোখের সামনেই, বলতে গেলে তার হাত দিয়েই ঘটে।

এক সকালে শ্রী কাররিগা তার বাড়ী থেকে বের হয়ে ঢাল পথ বেয়ে আলভারাডো স্ট্রীটের দিকে চললেন। সাঁকো পার হয়ে তিনি যখন পাকা রাস্তায় উঠতে যাচ্ছেন, তার নজর পড়ল ব্যাপারটায়। একটা ছেলে, তার হাতে একটা লিভার। পেছনে, তার পোষা কুকুরটা, বাধ্য ছেলের মত লেজ নাড়াতে-নাড়াতে হেঁটে আসছে। কুকুরটার মুখে পুরো কয়েক গজ জট পাকানো, সমগ্র

ইনটেস্টাইনটা, যার শেষ ভাগে ঝুলে রয়েছে স্টম্যাকটাও। কাররিগা থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন 'এটা দিয়ে কি হবে?'র ছেলেটা সরল মুখে হাসে 'এটাকে টুকরো-টুকরো করে ম্যাকারেল মাছ ধরার বঁড়শীতে গাঁথব চার হিসেবে' কাররিগা স্মিত হেসে কুকুরটাকে দেখিয়ে বলেন 'উনিও কি ম্যাকারেল ধরবেন?' ছেলেটা মাথা নাড়ে ওগুলো ও পেয়েছে। কি করবে ওগুলো দিয়ে—সেটা ওরই ব্যাপার। 'কিন্তু তোমরা পেলে কোথায় এগুলো?' 'ঐ তো, জলের কলটার পেছন-দিকে।' শ্রী কাররিগা হাসলেন 'তাই বুঝি?' কিন্তু তার মন কাজ করতে শুরু করল। এটা শুয়োর বা গরুর লিভার নয়। লাল টুকটুকে লিভারটা, এতই মানবিক যে ছাগল মেষ বা ঐ জাতীয় কোন পশুর বলেও বিশ্বাস হচ্ছে না। তার মন টানটান সজাগ, সতর্ক হয়ে ওঠে। আরো কিছুটা এগোতেই শ্রী রায়ানের সঙ্গে দেখা হলো তার। উৎসুক গলায় কাররিগা প্রশ্ন করলেন 'কাল মনটেরীতে কেউ মারা গেছে কি?' 'কই, সেরকম কিছু তো শুনিনি।' 'কেউ খুন হয়েছে, আশেপাশে, গত কয়েক দিনে?' 'না তো' তাহলে ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, আশ্চর্য্যজনক বলতে হয়।

ওরা দুজনে এক সাথে হাঁটতে লাগলেন। শ্রী কাররিগা ছেলেটা এবং পুরো ব্যাপারটা রায়ানকে বিস্তারিত বললেন। ওরা এসে ঢুকলেন 'আডোবে বারে।' ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন এসে ভীড় জমিয়েছে, প্রভাতী বাক্যালাপ সম্বলিত আড্ডা জমে উঠেছে। কাররিগা বৃত্তান্তটিকে সবিস্তারে আবার বললেন সবার সামনে। এক দীর্ঘ-হিরন্ময় নীরবতা ছেয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর একজন, কে যেন, ভীড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠল 'জোস বিল লিংস পরশু রাতে হোটেল ডেল মন্টে-তে মারা গেছে।' জোস বিল লিংস? মহান লেখকদের শেষতম নমুনা ধারাটি? নিমেষে, খুব বেশি কথাবার্তা ছাড়াই, যেন একটা কমিটি তৈরি হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরই গোটা দলটা বৃদ্ধ ডাক্তারের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। ডাক্তার অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাজ করেন। তাই সকালে ঘুম ভাঙ্গতে তার দেরী হয়। সদ্য ঘুম থেকে উঠে তিনি দরজা খুললেন। 'আপনি, জোস বিল লিংসের দেহের ময়না তদন্ত করেছেন?' রায়ান প্রশ্ন করে। 'হ্যাঁ। কেন?' 'ওর দেহের প্রত্যঙ্গগুলো-ভেতরের অংশগুলো কি করেছেন?' 'সবারটা যেখানে ফেলি, সেখানেই ফেলেছি। আমার বাড়ীর পেছনে, লাশকাটা ঘরের জানালাটার নিচেই যে জঞ্জালের স্তুপ, সেখানে।'

নিঃস্ব হলেও-দারিদ্র্যতর হলেও, কোন গুণী-প্রতিভাবানের অসম্মান মনটেরী ক্ষমা করেনা। তার ওপর সেটা যদি আরেকজন শিক্ষিত মানুষ করে থাকেন।

জোস বিল লিংস-এর শবদেহ বহনের জন্যে, দামী-মহার্ঘ্য একটি শবাধারের ব্যবস্থা ডাক্তারকেই করতে হলো।

অধ্যায় ঃ ১৩

'গভীর রাতই হলো ব্যাঙ ধরার পক্ষে উপযুক্ত সময়' ম্যাক বলে। অতএব, রুটি ও মদ খেতে খেতে ওরা অপেক্ষা করতে থাকে অন্ধকার আরো গহন ঘন হবার জন্যে। 'দিনের আলোয় ব্যাঙ বিশেষ নড়াচড়া করেনা। ফার্ণ অথবা শ্যাওলার আড়ালে শরীর লুকিয়ে বসে থাকে। রাতে 'মিথ্যেবাদীকে আমি একদম পছন্দ করিনা' ওদের চারপাশ ঘিরে তখন এক নির্জন—স্তব্ধতা থমথম করছে। যেন গোটা পৃথিবী থেকে ওরা তীব্রতর ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সমূদ্র, এই স্তব্ধ-নির্জনতার প্রেক্ষাপট হিসেবে এক আশ্চর্য্য বৈপরীত্যময়তা প্রকট করছে। ঠিক সেই পটভূমিতে, ম্যাকের এই আচমকা কথাটা ওদের সচকিত করে তোলে 'কে তোমায় মিথ্যে বলেছে?' এডি প্রশ্ন করে। 'হা-হ' ম্যাক সখেদে মাথা নাড়ে, তারপর তাকিয়ে আছে দেখে ও আবার বলে 'সত্যি কথা বলতে কি, আমরা প্রত্যেকেই বোধহয় নিজেদের সঙ্গে মিথ্যাচারণ প্রতারণা করে চলেছি। আমরা এই কাজটা করছি—বাড়তি রোজগারের আশায়। কারণ আমরা ডাক্তারকে একটা পার্টি দিতে চাই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমরা নিজেদের ঠকাচ্ছি না তো! শেষ পর্য্যন্ত, হাতে টাকা পেলে, ডাক্তারকে পার্টি দিয়ে উঠতে পারব এরকম কোন নিশ্চয়তা আমি পাচ্ছিনা। ডাক্তারের মত ভাল লোক, তাকে আমরা ঠকাচ্ছি না, অথবা ঠকাব না তো? ডাক্তারের ভাল মানুষীর অবৈধ সুযোগ আমরা নিচ্ছিনা তো?' শেষের দিকে ম্যাকের কথাগুলো, টানা-বিরতিহীন শব্দ, বাক্যগুলো, কেমন যেন অপার্থিব—থমথমে হয়ে ওঠে। 'একবার, আমার খুব, মারাত্মক টাকার দরকার পড়েছিল। কুড়ি ডলারের জন্যে, আমি ডাক্তারকে বানিয়ে-বানিয়ে ভয়ঙ্কর, দুর্দশার একটা গল্প বলছিলাম। ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে শুনছিল। বানানো গল্পটা অর্ধেকও এগোনোর আগে, আমি আর সহ্য করতে পারলাম না ডাক্তারের ঐ চোখ দুটো—আমার দিকে যা স্থির নিবদ্ধ ছিল, আমি সে চোখের দিকে তাকিয়ে গল্পটা চালিয়ে যেতে পারলাম না। আমি বুঝতে পারছিলাম, ডাক্তার সব জানে—আসল, সত্যি। আমি গল্প থামিয়ে বলে উঠলাম—ডাক্তার, এসব মিথ্যে, বানানো।' এক হতাশা তখন আমায় ছেয়ে যাচ্ছিল। কারণ, আমি বুঝতে পারছিলাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ২০ ডলার আমি হারালাম।'

'অথচ, ডাক্তার, আমার কাঁধে হাত রাখলেন, বললেন—'ম্যাক, আমি বুঝতে পারি যতখানি নির্মম প্রয়োজন পড়লে, টাকার জন্যে কতটা মরীয়া হয়ে উঠলে, একজন মানুষকে বাড়িয়ে মিথ্যে গল্প বলতে হয় রোজগারের জন্যে।' 'হে ভগবান, এর পরেও, ডাক্তার ২০ ডলার, আমায় দিয়েছিলেন। লোকটা। বড্ড

ভাল, বাড়াবাড়ি রকমের ভাল, মানুষটা। মানুষ হিসেবে।' 'তোমার মানসিকতা আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু, নিশ্চিত, এবার আমরা ডাক্তারকে একটা জমকালো পার্টি দেব। এমন পার্টি, যা ডাক্তার উপভোগ করবেন' হেজেল বলে। ম্যাক মাথা নাড়ে 'জানিনা, আমার পুরো ব্যাপারটাই অনিশ্চিত, সন্দেহাবকাশমুক্ত মনে হচ্ছে' অধৈর্য্য গলায় এডি বলে 'তাহলে তুমি কি করতে চাও?' 'জানিনা, জানিনা সত্যিই' ম্যাক পথ হারানো গলায় বলে। হেজেল এবার বলে 'আচ্ছা, আমরা যদি ডাক্তারকে হুইস্কির একটা বোতল উপহার দিই? এবার তিনি ওটা নিয়ে যা ইচ্ছে করে করবেন-করুন।' ম্যাক, আচমকা উৎফুল্ল গলায় চেঁচিয়ে ওঠে 'আহ, এটা সত্যিই ভাল প্রস্তাব বটে' এডি মাথা নাড়ে। আমি মোটেই তা বলতে পারছি না। পার্টি হলে, ডাক্তারকে যে বোতলটা দেওয়া হতো, তার থেকে আমরা পাঁচজন ভাগ বসাতাম। আর বোতলটা ওর হাতে তুলে দিলে, গন্ধ শুঁকে শুঁকে ২০ জন চলে আসবে ভাগ বসাতে। ডাক্তার আমাকে শুঁকতে গোটা ক্যানেরী রোও শহরটাই ভোজ খেতে এসে হাজির হয় টের পেয়ে।' ম্যাক 'সমর্থন সুচক ভঙ্গী করে বলে 'তুমি হয়ত ঠিকই বলছ।' হেজেল বলে, 'তাহলে আমরা ডাক্তারকে কোন উপহার দিতে পারি। কোটের হাতার বোতাম' 'ঘোড়ার ডিম, ডাক্তার ওসব পছন্দ করেন না, ব্যবহারও করেন না' এডি রাগত স্বরে বলে। ওদের তর্ক যখন ঘোরতর ভাবে জমে উঠতে যাচ্ছে, আচমকা, পেছন থেকে ভেসে আসা পায়ের শব্দ ওদের বাধ্য করল ঘুরে তাকাতে। একটি পুরুষ, কালো—লম্বা, দ্রুত পায়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ায়। হাতের শটগানটা ওদের দিকেই উঁচিয়ে তাক করা। 'তোমরা এখানে করছটা কি?' 'কিছু না, কিছু না' ম্যাক জবাব দেয়। লোকটা খর চোখে ওদের দিকে তাকায়। এই অন্ধকারেও চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে, যেন জ্বলছে, কোন শ্বাপদ চক্ষু 'এই উপত্যকায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। শিকার, মাছধরা নিষেধ। তবু তোমরা ঢুকেছ?' ম্যাক উঠে দাঁড়ায় 'আমরা জানতাম না। বিশ্বাস করুন ক্যাপটেন আমরা জানতাম না, সত্যি বলছি।' 'পুরো জায়গাটায় চিহ্ন দেওয়া—নোটিশ লাগানো রয়েছে, আর তোমরা বলছ তা জানোনা—দেখোনি?' 'না, সত্যিই তাই। আমরা সাধারণ মানুষ মহাশয়। কোন খারাপ উদ্দেশ্য আমাদের নেই।' 'তোমরা এখানে কি করতে এসেছ?' 'আমরা এক বৈজ্ঞানিকের কাজে এসেছি। তার হয়ে ব্যাঙ ধরতে' 'ব্যাঙ?' অফিসারটি অবাক চোখে তাকিয়ে বলে 'ব্যাঙ দিয়ে কি হবে? কি কাজে লাগবে?' ম্যাক গভীর আত্মপ্রত্যয়ী ভঙ্গীতে বলে 'আমি যতটা জানি, ক্যানসার গবেষণার কাজে লাগানো হবে ওদের। ওদের শরীরে ক্যানসার জীবানু ঢুকিয়ে লক্ষ্য-নিরীক্ষা চালানো হবে।'

অফিসারটির ব্যবহারে এবার ইতস্ততা ধরা পড়ে। গোঁফে হাত বুলোতে—

বুলোতে কয়েক মুহূর্ত তিনি কি যেন চিন্তা করেন। তারপর বলেন 'তাই যদি হয়, আমার বাড়ীর পেছনের পুকুরটায় প্রচুর ব্যাঙ আছে। রাতে ওদের ডাকাডাকির ঠেলায় ঘুমোতে পারি না। তোমরা সেখান থেকে তাহলে ব্যাঙ ধরতে পারো তো?' 'অনেক ধন্যবাদ, আপনার মহানুভবতার জন্যে। আমরা তা করতে পারি।'

অধ্যায় ঃ ১৪

ভোরটা, যেন এক সময়-ম্যাজিক ক্যানেরী রোওতে। ধূসরতা ছড়ানো প্রাক ভোরে, আলো যখন সবে ফুটতে শুরু করেছে, শহরটা যেন এক অলৌকিকতায় ঝুলে অথবা ডুবে থাকে, নরম রুপোলী আলো, রঙ মাখামাখি হয়ে। ইস্পাতের দীর্ঘ চুল্লী শীর্ষগুলো ঝকঝক করতে থাকে। পরিবেশ জুড়ে নির্জন-স্তব্ধতা। রাস্তাগুলো, জনমানব শূন্য, যেন আগামী মুখর ব্যস্ততার প্রস্তুতি হিসেবেই। এমনকি, সমুদ্রের ঢেউগুলো, ক্যানেরীর দেওয়ালে এসে আছড়ে পড়ে—সমস্ত শব্দই শুনতে পাওয়া যায়, স্পষ্ট—অতি স্পষ্ট। তখন চরাচর জুড়ে—সময় জুড়ে, ছড়িয়ে থাকে শান্তি। সময়, ক্যানেরীর দৈনন্দিন ব্যস্ততা—কোলাহল সরিয়ে তখন যেন একটু বিশ্রাম নেয়। সেই শান্তিপূর্ণ সময়ে বেড়ালগুলো নিঃশব্দে বেড়া টপকায়, মাঠগুলোয়, সমুদ্রপাড়ে, মাছের অবশিষ্ট অংশ খুঁজে বেড়ায় অথবা বাতিল হওয়া মাছ। কুকুরগুলো, রাজকীয় ভঙ্গিতে—যেন সাম্রাজ্যটা ওদেরই, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কোনটায় মুখ দেবে—কোনটা খাবে, বেছে নিতে থাকে, দামী রেঁস্তোরায় ঢোকা কোন অভিজাত খদ্দেরের মত। সীগালগুলো নিঃশব্দে উড়ে এসে ক্যানেরীর ছাদে বসে, ডানা ঝাপটাতে থাকে। বাতাসও তখন তাজা, ঠান্ডা। সমুদ্র পাড়ে, এ এক সময়, রাত ভেঙ্গে দিন হয়ে ওঠার মধ্য-বিরতি পর্ব। যখন, সময় থমকে পড়ে নিজেই নিজেকে বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত করতে থাকে। অলৌকিক আত্মবিশ্লেষণ।

এই রকমই এক সকালে, বলা ভাল প্রাক্-ভোরে, দুজন সৈনিক এবং দুজন মেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। ডোরার বাড়ী থেকে ওরা বেড়িয়েছে। চারজনেই, ক্লান্ত অথচ সুখী। ওদের সবারই পোষাক অবিন্যস্ত, চুল এলোমেলো, চেহারায় রাত জাগা ক্লান্তি। অথচ ওরা আনন্দিত-উৎফুল্ল। সুখী। হাত ধরাধরি করে তারা হাঁটছিল। এবং হাতগুলো ছন্দে-তালে তালে তুলছিল। সৈনিক দুজনের একজনের হাতে একটা মোটা বাদামী কাগজের ব্যাগে ভর্তি বিয়ার ক্যান। ওরা একজন, অন্যজনের দিকে তাকিয়ে মৃদু, সুখ মাখা, হাসছিল, সঙ্গীর হাতটাকে

আরো শক্ত করে মুঠোয় চেপে ধরছিল। ধুসর আলো মাখা ক্যানেরীর রাস্তা ধরে হাঁটতে-হাঁটতে ওরা একেবারে শহরের শেষ সীমানায় চলে এলো। রেল লাইনের দিকে ঘুরে গেল। মেয়েগুলো, উঁচু রেললাইনে দুপা রেখে হাঁটতে থাকল, মজা করে। এবং তাদের পুরুষসঙ্গীরা, ওদের সরু কোমরগুলো জড়িয়ে ধরে সেইভাবে হাঁটতে লাগল, যাতে ওরা পড়ে না যায়। এরপর ওরা পার্কের মত হপকিন্স মেরিন স্টেশনের সাজানো জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে ছোট্ট—বেঁকানো চেহারার একটা বিচ আছে। আসলে, বিচের ক্ষুদ্রাকৃতি সংস্করণ। ভোরের নরম আলোয়-ছোট্টছোট্ট হালকা ঢেউগুলো পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছে। পাহাড়ের উন্মুক্ত ভাঁজ বেয়ে ধেয়ে আসছে স্বাস্থ্যকর—তাজা বাতাস। ওরা চারজনে এসে যখন বালির ওপর বসল, গোটা দিগন্ত জুড়ে প্রথম আলোর আভা ঠিক তখনি ফুটে উঠল।

সৈনিকদের একজন চারটে বিয়ার ক্যান বের করল। প্রত্যেককে দিলো। মেয়ে দুটি বালির ওপর পা ছড়িয়ে বসল, সৈনিক দুজন ওদের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। সঙ্গীনিদের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা হাসল। ক্লান্ত, অথচ শান্তিমাখা সেই হাসিতে, জড়ান ছিল-রইল কি যেন এক অজানা রহস্যময়তা। ঠিক এমন সময়, দুরে, দেখা গেল জায়গাটার কেয়ার টেকারকে। সে ওদের দেখতে পায়। তার হাতে শিকলে বাঁধা কুকুরটা অতিথিদের পছন্দ না করার প্রমাণ হিসেবে একটানা তীব্র গলায় ডেকে চলেছিল। কেয়ার টেকারটি আরো কয়েক পা এগিয়ে আসে তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে হাঁক মারে 'হে-হেই, তোমরা কেন এখানে ঢুকেছ? জানোনা, এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি?' ওরা চারজনে, কেউ একজনও, কেয়ার টেকার এর কথা শুনতে যে পেয়েছে, তা মনে হয় না। শুধু, কথাগুলো শুনে, একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে হাসে। অদ্ভুত, রহস্যময়। পুকুরটা চৌকো আকৃতির। পঞ্চাশ ফুট চওড়া, সত্তর ফুট লম্বা। গভীরতায় আট ফুট। আসলে, অফিসারের বাড়ীর ডান দিকের ভুট্টা ক্ষেতে জল দেবার একটা সঞ্চয়। চার পাশে ঘন ঘাস গজিয়ে উঠেছে, যদিও সেগুলো খুব বেশি লম্বা নয়। একটা গরু নালা কেটে নদীর জল এখানে এনে ফেলা হয়েছে। অন্য পাশে একটা নালা সোজা ভুট্টা ক্ষেতে গিয়ে পড়েছে। তবে, সত্যিই ব্যাঙের অভাব নেই। পিলপিল করছে, নানা চেহারা, নানা আকৃতির ব্যাঙ। হাজারে-হাজারে। তাদের ডাক, না বলা ভাল একঘেঁয়ে গর্জনের সম্মিলীত সুরে কানে তালা লেগে যাওয়ার উপক্রম। রাত্রির স্তব্ধতায়, নিছক সেই ব্যাঙের ডাককেও, অতিকায়—অমানবিক কোন জান্তব গর্জন মনে হচ্ছিল। সম্মিলীত একতালে তারা যেন গান ধরেছে—রাত্রির আকাশকে, আকাশের তারা নক্ষত্র

মন্ডলীকে, হাওয়ায় দোদুল্যমান ঘাসকে, উজ্জ্বলতর চাঁদকে—সবাই, সবাইকে উদ্দেশ্য করে তারা যেন, সেই ব্যাঙের কণ্ঠের অভূতপূর্ব প্রেমসঙ্গীত শোনাচ্ছিল, শুনিয়ে চলেছিল। আর, ঘন অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে চুপিসাড়ে পুকুরের দিকে এগিয়ে চলল মানুষগুলো। ব্যাঙগুলো, জানতে বুঝতেও পারল না, অন্ধকারে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে ওদের নিয়তি। এবং, যে রাত্রি সশব্দ-গর্জন মুখরিত ছিল, আচমকা যেন তা স্তব্ধ হয়ে গেল। পরিবেশ জুড়ে নেমে এলো এক পিন পতন নৈঃশব্দ্য।

একটা শতাব্দীতে মানুষ এবং ব্যাঙেরা, প্রাকৃতিক ভাবে সহবাস করত। সেই তখনো ব্যাঙ শিকার করত মানুষ। সেই শিকার ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। বরং আরো অগ্রসর—অত্যাধুনিক হয়ে উঠেছে। মানুষগুলো, চুপিসাড়ে এগিয়ে, উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিল, অসহায় প্রাণীগুলো প্রাণীগুলো চালান হলো সোজা শক্তপোক্ত বস্তার মধ্যে। অতর্কিত হামলায় তাড়িত প্রাণীগুলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল। তাদের ঘিরে তখন মূহুর্মুহু আলোর ঝলক, মানুষগুলোর চিৎকার, জালের আছড়ে পড়া। সে এক আতঙ্কময় পরিস্থিতি। প্রাণ ভয়ে ভীত ব্যাঙগুলো—ছোট ব্যাঙ, বড় ব্যাঙ, মা ব্যাঙ, বাবা ব্যাঙ, স্ত্রী ব্যাঙ, পুরুষ ব্যাঙ, সবাই তীব্রতর-আতঙ্কতাড়িত হয়ে পালাতে চাইল। এই হননভূমি ছেড়ে, দূরে, অন্য কোথাও, যেখানে এই নিষ্ঠুর হানাদারী নেই, চলে যেতে চাইল। দলে দলে পুকুর ছেড়ে উঠে আসতে চাইল ওরা, উঠে এলো। অথচ, সেখানে ওদের ঘিরে, উন্মত্ত মানুষগুলোর পদক্ষেপ। তুমুল মাতন। বৃষ্টির মত, ওদের চার পাশে মানুষগুলোর পায়ের দাগ পড়ছিল। দলে দলে, ওরা সেই পায়ের তলায় পড়ছিল। ছোট ব্যাঙ, বড় ব্যাঙ, মা ব্যাঙ, বাব ব্যাঙ—কারো হাত-পা, কারো মাথা, কারো গোটা শরীর এবং প্রাণটাই, সেই তুমুল উন্মত্ত পায়ের তলায় পড়তে লাগল, পিষ্ট হতে লাগল।

মানুষগুলো, সব কয়জনই তখন একসঙ্গে মনে মনে ভাবছিল 'ডাক্তার মানুষটা, সত্যিই ভাগ্যবান।'

এই, এতসব কিছু তো ওরই জন্যে করা হচ্ছে।

অধ্যায় ঃ ১৬

বিয়ার ফ্ল্যাগ-এর মেয়েদের সবচেয়ে ব্যস্ততার সময় কাটে মার্চ মাসটা। কারণ তখন সার্ডিন ধরার মরশুম। শুধু এই নয় যে তখন প্রচুর মাছ ধরা পড়ে, সবার হাতে প্রচুর টাকার জোগান থাকে। তখন, কর্মীর চাহিদাও কয়েকগুন বেড়ে যায়। ফলে স্থানীয়দের দিয়ে কুলিয়ে ওঠা যায় না। বাইরে, নানা প্রদেশ থেকে সাময়িক শ্রমিকেরা-কর্মীরা হাজির হয় মাছের নৌকো এবং ক্যানেরীতে কাজ করার জন্যে, এইসব শ্রমিক-কর্মীদের সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর প্রয়োজন হয় স্ফুর্ত্তি-আমোদের। বিশেষ করে পকেটে যদি পয়সা ভরা থাকে—ঝমঝম বাজে, তাহলে মন তো, 'শখের প্রাণ গড়ে মাঠ' হয়ে উঠবেই, উঠতে দেরী করবে না। ফলে ডোরা ও তার মেয়েদের ব্যস্ততা চরমে ওঠে। অবশ্যই আয়ও। অথচ এবছর ডোরা কিন্তু সত্যিই বিপাকে পড়েছে। ব্যবসায় চরমতম মন্দা চলেছে। আসলে, ডোরা 'কাজের মেয়ের ঘাটতিতে পড়েছে। ইভা ফ্রানগান, দুটি কাটাতে পশ্চিম সেন্ট লুইসে গেছে। এখনো ফেরেনি। ফিলিস মায়ে, রোলার কোস্টার চালাতে গিয়ে পড়ে পা ভেঙ্গেছে। এলিস ডাবলবটম, এখনো সেভাবে তৈরিই হয়ে ওঠেনি। শিক্ষানবীশী পর্ব চলছে ওর। সুতরাং, অর্থনীতির ভাষায় বললে—চাহিদা উর্দ্ধমূখী, যোগান নিম্নগামী।'

ফলত, পকেট ভর্ত্তি টাকা নিয়েও, বহিরাগত, এবং স্থানীয় সার্ডিন কর্মী-শ্রমিকরা বিরস বদনে, প্রমোদ বঞ্চিত হয়ে সমুদ্র পাড়ে বসে ভূট্টাদানা চিবোচ্ছে, নেহাত সময় কাটানোর কারণেই। সময়কে পার করতে। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যে, কাটতে যেন চায় না, ধীরতর গতি সময়। অন্তত খেয়ে শুয়ে পড়ার মত সময় হলেও, এই ক্লান্তিকর একঘেয়েমী থেকে বাঁচা যায়। আর যারা সারা রাত জুড়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়, তাদের আমোদ-প্রমোদ-স্ফুর্তির আসল সময় তো দুপুর এবং বিকেল বেলাই। যাইহোক, তবু কুড়িয়ে বাঁচিয়ে যে কজন মেয়ে আছে, তাদের দিয়েই কাজ চালাচ্ছে ডোরা। যে কজনকে পারা যায়, সবাইকে না হলেও, স্ফুর্ত্তি-আনন্দ দেবার চেষ্টা করছে। মেয়ে কয়জনের ধকল একটু বেশি পড়ছে, এই যা আর কি। ঠিক এই রকম একটা পরিস্থিতিতে, আচমকাই শহরে মহামারী হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ইনফ্লুয়েঞ্জা। বেগটা প্রথম আসে, ধরা পড়ে মিসেস ট্যালবটের মেয়ের। তারপরই ঝড়ের গতিতে গোটা ক্যানেরী রো-এর মাথার ওপর দিয়ে তাকে উড়ে বেড়াতে দেখা যায়। ঘরে ঘরে তার নিষ্ঠুর থাবা পড়তে থাকে। ডাক্তারদের ব্যস্ততা বহুগুন বেড়ে যায়। সকাল থেকে রাত দৌড়ে বেড়াতে থাকেন। কয়েকদিনের ব্যস্ততা বহুগুন বেড়ে যায়। কয়েকদিনের সেবা-

ওষুধ একজন রোগীকে সুস্থ করে তুলতে না তুলতেই আরো ১০ জন অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর আসে। ঘরে ঘরে শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে আক্রান্ত হতে লাগল। যদিও ১৯১৭-র মত ঘাতক মহামারী হয়ে উঠল না শেষ পর্যন্ত রোগের প্রকোপটা।

ওয়েস্টার্ন বায়োলজিক্যালের ডাক্তারের কাউকে চিকিৎসা করার-ওষুধপত্র দেবার বৈধ অনুমতি নেই। তবু তিনি শহরের আক্রান্তদের ঘরে ঘরে হাজির হতে লাগলেন। সেবা যত্ন করতে লাগলেন। তাপমাত্রা নেওয়া, গা মুছিয়ে দেওয়া, পথ্য খাওয়ানো, এবং তেমন প্রয়োজন বুঝলে, গুরুত্ব বুঝে, স্থানীয় কোন চিকিৎসককে খবর দেওয়া-ডেকে পাঠান। স্নান-খাওয়া ভুলে, এক বাড়ী থেকে আরেক পরিবার দৌড়ে এসব করে যেতে লাগলেন। কৌটোর সার্ডিন মাছ আর বিয়ার। খাবার বলতে কয়দিন ধরে কোন রকমে, টানা এগুলো খেয়ে যাচ্ছিলেন। অন্য কিছু রান্না করার সময় হচ্ছিল না—পাচ্ছিলেন না। একদিন লি চঙ-এর দোকানে বিয়ার কিনতে এসে তার সঙ্গে ডোরার দেখা হলো। 'আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' ডোরার কথায় ডাক্তার বিষন্ন মুখে হাসলেন 'সত্যিই, তাই। প্রায় এক সপ্তাহের ওপর দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি।' ডোরা সমর্থনের ভঙ্গীতে, মাথা নাড়ে 'হ্যাঁ আমিও শুনেছি। আপনি মানুষের সেবায় অক্লান্ত রয়েছেন, পরিশ্রম করছেন।' একটু থেমে সে আবার বলে, 'ডাক্তার, এ ব্যাপারে আমি কোনভাবে সাহায্য করতে পারি কি?' ডাক্তার উৎফুল্ল মুখে বললেন, 'নিশ্চয়ই পারো ডোরা। এ মুহূর্তে অসুস্থরা যা চায়, তুমি সবচেয়ে ভাল দিতে পারো সেটা। ওদের পাশে গিয়ে বসো। ওদের সঙ্গ দাও। সামান্য সেবা-যত্ন দাও। এ মুহূর্তে এটাই ওদের সবচেয়ে প্রয়োজন।'

ওপর থেকে দেখলে ডোরাকে যতটা শক্ত—কঠিন হৃদয় মনে হয়, ভেতরে ভেতরে মনটা তার ততটাই কোমল-নরম। ডাক্তারের কথাটা সে গ্রহণ করল। যদিও, সে নিজেও খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছিল, তবুও। মেয়েদের নিয়ে সে কতগুলো দল তৈরি করল। এক একটা দলকে এক-এক সময়ে ব্যবসার কাজে না লাগিয়ে অসুস্থদের কাছে পাঠাত। শুধু তাই নয়, বিয়ার ফ্ল্যাগের গ্রীকদেশীয় রাঁধুনিটিকে দিয়ে সে হালকা ঝোল রান্না করেও পাঠাত মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরাও দৈনন্দিন ব্যবসার বাইরে এই কাজটায় একটা মানসিক সুখ খুঁজে পাচ্ছিল। মন প্রাণ দিয়ে অসুস্থদের সেবা, যত্ন করত তারা।

অধ্যায় ঃ ১৭

ডাক্তার নিজেও হাসিখুশী-বন্ধুত্বপূর্ণ মনের এবং তার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেও। তা সত্ত্বেও তিনি একজন নিঃসঙ্গ—স্বনির্বাসিত ব্যক্তি। এটা সবার থেকে ভাল বুঝে উঠতে—তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছিল ম্যাক। দলবদ্ধ থাকার সময়েও, তুমুল আড্ডার মধ্যমনি থেকেও, ডাক্তার যেন মনে হতো বিচ্ছিন্ন-নিঃসঙ্গ হয়ে আছেন, আলাদা। ম্যাক মাঝে মাঝেই নিজের মাছ খাবারের গুদাম বাড়ী থেকে ল্যাবরেটরীর দিকে লক্ষ্য করত, দেখত। মাঝে মাঝেই ও দেখতে পেত সেখানে একটি মেয়ে। সত্যিই কি তা দেখতে পেত? নাকি নিছক কল্পনাই? তা সত্ত্বেও, ম্যাক এক ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতার গন্ধ পেতো, দৃশ্য দেখত। একজন নারীর প্রিয়তম সান্নিধ্য-ঘনিষ্ঠতার মধ্যে থেকেও, ম্যাক বুঝত, ডাক্তার নিশ্চিতভাবে নিঃসঙ্গ তাবোধে আক্রান্ত হতেন। ডাক্তারের নিঃসঙ্গতার অসহ্যকর প্রতীক যেন ছিল ঐ রেডিওগ্রামটা। যখন তখন, দিনে রাতে, ওটা বেজে উঠত, সুরের নানা স্তরের মাত্রায়, মূর্ছনায়। সঙ্গে জ্বলত ল্যাবরেটরীর আলোগুলো—দিনই হোক, অথবা রাত। তারপর, হঠাৎ—আচমকা, আলো নিভে গেলে, বোঝা যেত, ঘুম, অবশেষে নেমে এসেছে ডাক্তারের চোখে।

এসব, ব্যক্তিগত সুখ-অসুখ, পারিবারিক তুচ্ছতা, বাদ দিয়ে, দুরে সরিয়ে, নিজের সংগ্রহ জারী রাখতে হতো ডাক্তারকে। কখন কোথায় ভাল ঢেউ আসছে খোঁজ খবর রাখতে হতো। জোয়ার, ঢেউ, মানেই পাড়ের কাছাকাছি চলে আসা সমূদ্রপ্রাণীগুলোর। অন্যসময় যাদের নাকি মাঝসমুদ্রে থাকার—'পাবার কথা, জোয়ার-জলোচ্ছাসে ভেসে তারা বাধ্য হয় তীরের কাছাকাছি চলে আসতে। সমুদ্রের পাড়গুলো, পাড়ের কাছাকাছি পাহাড়ী খাঁড়িগুলো, ডাক্তারের সংগ্রহ খনি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি জেনে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন কখন—কোথায়-কি পাবেন, পেতে পারেন। তার চাহিদা, কখন, কোথায় মিটবে। শুধু জোয়ার-জলোচ্ছাসই নয়, ডাক্তারকে খবর রাখতে হতো, কোন অঞ্চলে কখন স্রোতের নাব্যতা আসবে। যখন, ভাঁটার টান আসে, জলের ধারায় নাব্যতা বেড়ে যায়—ডাক্তার তার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে-গাছিয়ে গাড়ীতে তোলেন। তারপর রওনা দেন নির্দিষ্ট সেই গন্তব্য অভিমুখে। তার চাহিদার প্রাণীটিকে যেখানে প্রকৃতি মজুত করেছে করে রেখেছে, নিজের নিয়মেই।

যেমন এখন, তার কাছে ছোট অক্টোপাসের বরাত-চাহিদা, আছে। এবং তিনি জানেন এটা এ মুহূর্তে পেতে হলে, লা জোললা-তেই যেতে হবে। একটা বিশেষ জায়গা, বোল্ডারে ঘেরা—অন্তস্রোতের সমূদ্রসীমা। জায়গাটা লস

অ্যাঞ্জেলস এবং সান দিয়েগো-র মাঝামাঝি। প্রায় ৫০০ মাইল দূরত্ব। এবং সে দূরত্ব, অক্টোপাসগুলো পাবার মত উপযুক্ত সময় সীমার মধ্যে তাকে অতিক্রম করতে হবে। জোয়ারের জল নেমে গেলে, বালির মধ্যে-বোল্ডারগুলোয়, অক্টোপাসের দল লুকিয়ে থাকে। বোল্ডারগুলোর তলায় ওদের ভীষণ পছন্দসই খাঁজগুলো-গর্তগুলো পেয়ে যায় ওরা। কাদার আস্তরনের মধ্যে সহজেই হানাদারের নজর এড়িয়ে ছোট-ছোট, শুঁড় বিশিষ্ট প্রাণীগুলো লুকিয়ে থাকতে পারে। প্রবল জলোচ্ছাসও ওদের ক্ষতি করতে পারে না। ঐ একই বাসস্থানে, সামুদ্রিক কাঁকড়ার একটা প্রজাতিও থাকে। অক্টোপাসের চাহিদা পূরনের সঙ্গে -সঙ্গে, তিনি ঐ বিশেষ প্রজাতির কাঁকড়ার সংগ্রহও বাড়িয়ে নিতে পারবেন। বৃহস্পতিবার, ভোর ৫-১৭ মিনিটে ভাঁটা লাগবে। যদি ডাক্তার বুধবার সকালে রওনা দেন, যথাসময়ে তাহলে পৌঁছে যেতে পারবেন। সঙ্গী হিসেবে কাউকে নেবার কথা ভাবলেন তিনি। কিন্তু, সবাই ব্যস্ত অথবা দূরে, ঘটনাচক্রে। কাকে নেবেন? ম্যাকের দলবল, কারমেল উপত্যকায় ব্যাঙ ধরতে ব্যস্ত। তিনজন নারীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আছে, সঙ্গিনী হিসেবে যাদের ভাবা যায়। কিন্তু তারা তিনজনই চাকরী করে এবং সপ্তাহের মাঝে, তাদের পাবার আশা না করাই ভালো। সম্ভবত, ডাক্তারকে একাই যেতে হবে। কারণ, স্রোতের ধারা, তার সঙ্গী জুটবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে না।

সকাল-সকাল, বুধবার, নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নিলেন তিনি। ব্যক্তিগত জিনিষপত্র একটা ব্যাগে ভরলেন। আর প্রাণী সংগ্রহের জিনিষপত্রগুলো অন্য একটা ব্যাগে ভরলেন। গাড়ীর পেছনে ব্যাগগুলো ভরে দিয়ে, নিজের বাদামী চুল-দাড়ি-গোঁফ সযত্নে আঁচড়ে নিয়ে, গাড়ীতে উঠে বসলেন তিনি। রওনা দিলেন।

অন্যদের তুলনায়, যে কোন গন্তব্যে পৌঁছতে ডাক্তারের একটু বেশি সময় লাগে। কারণ, তিনি গাড়ী দ্রুত চালানো পছন্দ করেন না। এবং কিছু দূর চালিয়ে যাবার পরই, তার একটু বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রাস্তার পাশে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটা হ্যামবার্গার অথবা কফি খাবার ফাঁকে তিনি জিরিয়ে নেন খানিকটা। খুব ঘন ঘনই, ঘটে এই বিশ্রামের প্রয়োজনটা। লাইট হাউস এভিনিউ ধরে যাবার সময় তিনি একটা কুকুরের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। কারণ তার মনে হলো, কুকুরটা যেন তার দিকে তাকিয়ে হাসল। কিছুদূর চলার পরই, যাত্রা ভালভাবে শুরু হবারও আগে, তার ক্ষিধে বোধ হতে থাকল। ফলে, 'হারম্যান'-তে ঢুকে হ্যামবার্গার আর বিয়ার খেতে বসলেন। ধীরে সুস্থে স্যান্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বিয়ারে চুমুক দিতে লাগলেন তিনি। চেনাজানা কয়েকজনের সঙ্গে টুকটাক কিছু কথাবার্তাও হলো। তারপর খাওয়া শেষ হলে,

দাম মিটিয়ে বের হয়ে এলেন।

গাড়ী আবার চলতে শুরু করল। কিছুটা এগোবার পর, 'সালিনাস' পড়ল। না, এখানে খাবার জন্যে থামলেন না ডাক্তার। তবে, গনজালেস, পাসো রবলস-দুজায়গাতেই বার্গার খেতে থেমেছিলেন। সান্টা মারিয়াতে নেমে আবার বিয়ার খেলেন। কারণ, সান্টা মারিয়া থেকে সান্টা বারবারা অনেকটা দূর, পথে তার তেষ্টা পেতে পারে, একথা মনে হতেই পারে ডাক্তারের। এবং সেই, তার মতে, শেষ হতে না চাওয়া দীর্ঘ পথ, শেষ হয়ে অবশেষে সান্তা বারবারায় পৌঁছলেন তিনি। প্রায় দুপুর হতে চলেছে। ফলে, এখানে তিনি—হালকা ঝোল, লেটুস, স্প্রিং বিন স্যালাড, রোস্ট, আলুসেদ্ধ, আনারস দেওয়া মাংসের পিঠে, চীজ এবং কফি দিয়ে খাওয়া সারলেন। সার্ভিস স্টেশনে গাড়ীর চাকা, যন্ত্রাংশগুলো এবং তেল পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে, মুখ ধুয়ে-চুল আঁচড়ে, আবার রওনা হলেন। কিছুটা পথ এগোবার পরই, তিনি রাস্তায় দুজন ঐতিহ্যবাহী-প্রথাগত ধরনের হিচ-হাইকারকে অপেক্ষা করতে দেখতে পেলেন। তিনি যেদিক যাচ্ছেন, হাত তুলে নাড়াতে-নাড়াতে, বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। বাধ্য হয় গাড়ী দাঁড় করালেন। ডাক্তার হাইওয়েতে গাড়ী চালাবার ব্যাপারে অভিজ্ঞ। তিনি জানেন, হিচ হাইকারদের বাছতে-গাড়ীতে তুলতে হয় মন দিয়ে যাচাই-বিচার করে। নাহলে নানারকম অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে চরম সতর্ক থাকতে হয় অনভিপ্রেততা এড়াতে। ডাক্তার দ্রুত তার সঙ্গী হতে চাওয়া ওদের দিকে নিরীক্ষা চালিয়ে নিলেন। নিজের পছন্দও তৈরি করে ঠিক করে নিলেন। 'আপনি কি দক্ষিণে যাচ্ছেন?' রোগা-পাতলা মুখ, বড় বড় চোখ মানুষটার চেহারায় পণ্যবিক্রেতাজীবীর ছাপ। ডাক্তার পছন্দ ঠিক করে নিয়েছেন। দুজন নয়, একজনকে সঙ্গী করবেন তিনি। এবং এই লোকটাই হতে পারে, নিতে পারেন। 'হ্যাঁ, দক্ষিণের দিকে কিছুটা পথ', পেশাদারী অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি কথাটা বললেন। কোন হিচ হাইকারকেই দীর্ঘপথ সঙ্গ দেওয়া উচিত নয়। কয়েক মাইল, পথে নামিয়ে দেওয়া—এটাই নিয়ম, করা উচিত। 'আমাকে সঙ্গে নিতে কি অসুবিধা হবে?'

'উঠে আসুন।'

গাড়ী চলতে শুরু করল। কিছুটা পথ এগনোর পর—কয়েক মাইল, সঙ্গীটিকে কোথায় নামিয়ে দেওয়া যার ভাবতে লাগলেন-শুরু করলেন, উপযুক্ত জায়গা বাছতে লাগলেন ডাক্তার।

অধ্যায় ঃ ১৮

ডাক্তার তার ধীরগতির চালনায় যখন ভেনচুরাতে পৌছলেন, তখন শেষ বিকেল। নিজেই বুঝতে পারছিলেন যে বেশ দেরী করে ফেলেছেন। যে কারণে কারপেনটি বিয়ায় বেশিক্ষণ বিশ্রাম নিতে-বসতে পারেননি। একটা রাস্তার পাশের 'দ্রুত খাবার তৈরি'র রেস্তোঁরায় বসে শুধু চিজ স্যান্ডউইচ খেয়েই উঠে পড়ছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল লস অ্যাঞ্জেলসে ডিনার করবেন। কিন্তু সেখানে পৌছতে যে অনেক দেরী হয়ে যাবে, রাত গভীর হয়ে যাবে বেশ বুঝতে পারছিলেন। যাইহোক, ভেনচুরাতে বেশি সময় নষ্ট করলেন না তিনি। লস অ্যাঞ্জেলস পৌছতে সত্যিই বেশ রাত হয়ে গেল। সেখানে পৌছে, একটা চেনা জানা খাবারের দোকানে থামলেন। ভাজা মূরগী, আলুসেদ্ধ, গরম বিস্কুট দেওয়া মধু, চিজ, মাংসের পিঠে (আনারস দেওয়া) দিয়ে রাতের খাওয়া সারলেন। টয়লেটের কাজ সেরে নিলেন। থার্মোফ্লাক্স ভরতি কফি নিয়ে নিলেন। এবং প্রাতরাশের জন্যে আধডজন শূকর মাংসের স্যান্ডাউইচ নিতেও ভুললেন না। অবশ্যই, দু কৌটো বিয়ারও নিলেন। তারপর যাত্রার শেষ পর্বের দিকে রওনা দিলেন। রাতে গাড়ী চালানো মোটেই তার কাছে পছন্দের অভিজ্ঞতা নয়। এবার, গাড়ীর গতি বাড়ালেন তিনি। মানে, তার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয় এমন গতি আর কি। রাত দুটো নাগাদ তিনি লা জোললা-তে পৌছলেন। শহরের বুক হয়ে—মধ্য দিয়ে, তিনি পাহাড়চূড়োর নীচে, যেখানে শুয়ে আছে—বিস্তীর্ণ রয়েছে স্রোত, পৌছলেন। গাড়ীটাকে একপাশে থামিয়ে, বালিতে একটা মোটা কম্বল পেতে নিলেন। দুটো স্যান্ডউইচ আর খানিকটা বিয়ার খেয়ে, ঘুমিয়ে পড়লেন।

না, তার কোন অ্যালার্ম ঘড়ির দরকার নেই। দরকার পড়ে না। দীর্ঘদিন স্রোতের কাছাকাছি থাকতে থাকতে, স্রোত নিয়ে কাজ করতে-করতে, তার স্নায়ু স্রোতরীতি সম্পর্কে এতটাই সচেতন-অনুভূতিপ্রবণ হয়ে উঠেছে, যে ঘুমের মধ্যেও স্রোত চরিত্র পরিবর্তনের ইঙ্গিত তার মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম সঙ্কেত হয়ে পৌছে যায়। গভীর ঘুমেও তিনি জেগে উঠলেন। ব্যপ্ত পরিসীমাতে চোখ রেখে দেখতে পেলেন, জল ইতিমধ্যে নামতে শুরু করেছে। স্রোত-এর ধার কমেছে ঢেউ এর জিভ অনেক শান্তশালীন হয়েছে। তিনি অপেক্ষা করতে থাকলেন তীরবর্তী বোল্ডারগুলো ছাড়িয়ে জল নেমে যাবার। সেই অপেক্ষাটুকুর ফাঁকে তিনি খানকয়েক স্যান্ডউইচ তার গরম কফি খেয়ে নিলেন।

স্রোত উল্লেখযোগ্য ভাবে নেমে যায়। বোল্ডারগুলো পুরোপুরি উঁকি মারতে

থাকে নিজস্ব আকৃতিসহ। সমুদ্রপাড় জুড়ে, ভিজে বালি—কিছুটা কর্দমাক্ত। বালিতে ছোট্ট ছোট্ট গর্ত, স্রোতটানের ছাপ। আর, ভিজে সেই বালিপাড়ে ছড়িয়ে থাকে নানা সমুদ্রবস্তু। শ্যাওলা, স্পঞ্জ, মরা এবং জ্যান্ত মাছ-নানা প্রজাতির, ইত্যাদি। ডাক্তার এবার তার জিনিষপত্র, সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। হাঁটু পর্যন্ত রবার বুট গলিয়ে নিলেন। বর্ষাতি এবং বর্ষাটুপি পরে নিলেন। বাক্স প্যাঁটরা-বস্তা-জাল, গুছিয়ে নিয়ে পাহাড়ের খাঁজটির দিকে এগিয়ে চললেন। না-না, অবশিষ্ট স্যান্ডউইচ দুটো, কফির থার্মোফ্লাক্স এবং বিয়ারের কৌটোটা, নিতে ভুলে গেলেন, ভরার কোন কারণ নেই।

দ্রুত কাজে নেমে পড়লেন তিনি। তার অভিজ্ঞ চোখ ঠিক জায়গামত হাত বাড়াতে-ঢোকাতে লাগল। রাগী উত্তেজিত, নিস্ফল আক্রোশে ছটফট করতে-করতে শূঁড়গুলো দাপাতে থাকা, উত্তাপে, নতুন যে সদ্য ধরা প্রাণীটাকে বাক্সে রাখছিলেন, সেটা আগেরগুলোকে, নিজেরই প্রজাতির প্রাণীগুলোকে উন্মাদ রাগের বসে, আক্রমণ করছিল। অবশ্য, সে ছটফটানি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শান্ত হয়ে যাচ্ছিল। অন্যদের মত, শান্ত হয়ে উঠছিল। পরের জনের হাতে সে নিজে আক্রান্ত হবার জন্যে নির্লিপ্তভাবে অপেক্ষা করছিল।

দিনটা, শিকারের পক্ষে, নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যসুচকভাবে উপযোগী ছিল। বাইশটা ছোট অক্টোপাস ধরা পড়ল। এবং তার আশারও অনেক বেশি, বিরল লাল কাঁকড়া সংগ্রহ করতে পারলেন তিনি। কাঁকড়াগুলোকে জালের মাথাওয়ালা কাঠের বাক্সে চালান করলেন তিনি। অক্টোপাসগুলোকে গাড়ীতে এনে জল ভরা ড্রামটায় ঢেলে দিলেন। জলবিহীন বেশি সময় বাঁচেনা এরা। কাঁকড়াগুলোর ক্ষেত্রে সে সমস্যা নেই। ক্রমে, জল আরো নেমে যেতে লাগল, অনেকটা দূরে সরে গেল। একসময়, ভোরের প্রথম আলো পৃথিবীকে ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবেই আলোকিত করতে শুরু করল। চড়াইটা প্রায় দুশো গজ বিস্তীর্ণ হয়ে উঠল। এবং ক্রমে সেখানে জেগে উঠল, আগাছা-বনগাছের কঠিন আবরণে পরিণত হওয়া, ঢেকে থাকা, এক পাহাড়চুড়ো। সেটা ঢাল হয়ে ক্রমে জলে নেমে, মিশে, গেছে। ডাক্তার সেই চুড়োর কিনারে এসে দাঁড়ালেন। বুক ভরে শ্বাস নিতে নিতে তিনি চারপাশ উঁকি মেরে দেখতে লাগলেন। প্রকৃতি, এখানে নগ্ন সৌন্দর্য্যের উপমা। তিনি একদম শেষতম কিনারাটিতে এসে দাঁড়ান। সমুদ্রজলের নীলাভতা, নানারঙের গাছ-পাতা, চকচকে পাথুরে মসৃণতাময় উথাল-পাথাল, সর্বত্র নজর ঘুরে বেড়াতে লাগল তার। তিনি তখন প্রকৃতির গঠিত বাদামী পাথুরে ঝুল বারান্দাটির কিনারায় দাঁড়িয়ে, যেটা মসৃণ বাঁক নিয়ে এখান থেকে জলে ঝুলে পড়েছে, ডুবে গেছে। জলের মৃদু স্রোত এসে আছড়ে পড়ছে পাহাড় তলদেশে। আবার, ভরে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করছে।

দুটো আগাছাময় প্রস্তরশীর্ষের মাঝ বরাবর, হঠাৎই সাদা খন্ডময়তাটির দিকে তার নজর পড়ল। একটা ঝলক। ডাক্তার ঝুঁকে পড়লেন, ভাল করে লক্ষ করতে, জলের ভাসমান শ্যাওলা-আগাছার ঝাড় ঢেকে ফেলে ততক্ষণে। ডাক্তার পাহাড়ের দেওয়াল বেয়ে আঁকড়ে থাকেন। পিচ্ছিল, শ্যাওলা জর্জরিত, ভিজে পাথর বেয়ে, শক্ত হাতে পাথর আঁকড়ে ধরে ধরে সাবধানে সতর্কভাবে নামতে লাগলেন। একসময় বাদামী প্রস্তর চড়া দুটোর একটায় নেমে এলেন তিনি। জায়গাটার কাছে পৌঁছে, দুটো পাথর চুড়োর মধ্যবর্তী জলে উঁকি মারলেন তিনি। নিমেষে, তার সারা শরীরে কাঠিন্য জেগে উঠল। নগ্ন যুবতী মেয়ের মুখ তার দিকে তাকিয়ে আছে,। সুন্দরী, ফর্সা, কালোচুল, নগ্ন প্রাকৃতিকতার মাঝখানে—এক নগ্ন নারী।

চোখদুটো খোলা। মাথাটা শক্ত হয়ে জলের ভেতর ঘসে আছে। চুলগুলো, মৃদু স্রোতে ধুয়ে কপালের ওপর চলে এসেছে। শরীরটা, দুটো পাথরের খাঁজের মাঝখানে অদৃশ্য। দৃশ্যমান শুধু মুখ, মুখটুকুই। ঠোঁটদুটো, সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে, দাঁতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সুন্দর একটি মুখ। জলের ধারার স্বচ্ছলতার নীচে, যাকে আরো পবিত্রতর সুন্দর মনে হচ্ছে। ডাক্তারের মনে হল তিনি যেন অনন্তকাল ধরে মেয়েটির-মুখটির দিকে তাকিয়ে আছেন। অথচ, যা আসলে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের যোগফলে গঠিত কয়েকটি মিনিটের ভগ্নাংশ। এবং মুখটি, তার স্মৃতি-চিত্রকে পুড়িয়ে দিতে লাগল। খুব আস্তে, সতর্কভাবে শ্যাওলা—বনগাছের আস্তরটা মেয়েটার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন তিনি। ডাক্তার নিজের হৃৎপিন্ডের হঠাৎ বেড়ে ওঠা দ্রুততাল নিজের কানেই বুঝতে পারছিলেন। গলা শুকিয়ে-কাঠ হয়ে উঠেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে, পেছন ফিরে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন, ফিরে চললেন।

তটে, গাড়ীর কাছে ফিরে আসার পরও, মেয়েটির মুখ তাকে তাড়িত করছিল। বালিতে বসে তিনি পায়ের জুতোটাকে টেনে খুলতে লাগলেন। একটা সুর, হালকা হয়ে ভেসে আসতে লাগল তার কানে। কিন্তু মস্তিষ্ক হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজেও, সুর ও তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটিকে খুঁজে পেলেন না তিনি। এক অবিশ্বাস্য সুরমায়া। অথচ, অধরা। কিছুতেই না চিনে উঠতে পারা। তার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল, রোমরাজি শক্ত হয়ে উঠল। হঠাৎই তিনি কেঁপে উঠলেন, কাঁপতেই থাকলেন। তার দুচোখ ভিজে উঠল। মেয়েটা, তার চোখদুটো, ধুসররঙা-ঝকঝকে-উজ্জ্বল-স্পষ্ট। তার কালো চুলগুলো, জলের স্রোত টানে ভেসে ভেসে যা এসে পড়ছিল কপালের ওপরে। চিরকালীন দৃশ্য। ভিজে বালির ওপর তিনি বসে রইলেন স্তব্ধ-নির্বাক।

পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের আছড়ে পড়া শুনতে পেলেন তিনি। গর্জন ফিরে

আসছে। স্রোত ভরে উঠছে। জোয়ার আসছে, ফিরে। অথচ সেই জোয়ার জলোচ্ছ্বাস পেরিয়ে তার মস্তিষ্কে তখনো বেজে চলেছে, সেই রহস্যময় বাজনা এবং তার ধাঁধা জাগান সুর। চোখদুটো স্থির-খোলা, ধূসর তার তারা দুটো। দাঁতগুলো, সামান্য ফাঁক হওয়া ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে, যেন অস্পষ্ট-রহস্যময়মাখা এক হাসি। তার সম্বিত ফিরে এলো আচমকা ডাকে। অচেনা এক পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে 'মাছ ধরতে?' 'না, প্রাণী সংগ্রহ করতে।' ডাক্তার উত্তর দিলেন। 'ও। কি প্রাণী?' 'শিশু অক্টোপাস।' 'মানে, শয়তান মাছ? এখানে ওগুলো পাওয়া যায়? সারাজীবন এখানে আছি, কখনো দেখিনি, শুনিনি, জানতাম না।' 'ওগুলো খুঁজে পাবার নির্দিষ্ট, কায়দা-কৌশল আছে।' ডাক্তার দায়সারা ভঙ্গী-অনাগ্রহী গলায় বললেন। 'এই, আপনি অসুস্থবোধ করছেন নাকি মশাই? আপনাকে কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।' যন্ত্রণাময় সেই সুর-বাজনা আবার তীব্রতর হয়ে ওঠে। ঝমঝম করে বাজতে থাকে তার মস্তিষ্কের গহ্ণ কোষে-কোষে। ডাক্তার বাজনাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চান, মুখটাকে ঝেড়ে ফেলতে চান, শরীরের শীতার্ততাকে ঝেড়ে ফেলতে চান—এবং এসবের চেষ্টাতেই প্রবলভাবে মাথা নাড়ান। তারপর ক্লান্ত গলায় বলেন 'কাছাকাছি কোন পুলিশ থানা আছে?' লোকটা মাথা নাড়ে। 'হ্যাঁ শহরের ভেতর। পুবদিকে। কেন? কোন গন্ডগোল ঘটেছে নাকি?' 'একটা মেয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে জলের ভেতর।' 'কোথায়?' লোকটা আতঙ্ক-চমকিত গলায় বলে। ডাক্তার আঙুল তোলেন 'দুটো পাহাড়ের মাঝে খাঁড়িটায়। দুটো পাথরের আড়ালে। পাথুরে চড়ার ঝুল বারান্দাটার নীচেই। ডানপাশে।' লোকটা সেদিকে তাকায়। ডাক্তার বলেন 'তুমি কি পুলিশে খবরটা দিয়ে দেবে? আমি ঠিক সুস্থ বোধ করছি না।' লোকটা তাকায় 'দৃশ্যটা খুব আঘাতময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে? ঠিক আছে, আমি খবরটা থানায় জানিয়ে দেব।'

ডাক্তার গাড়ী স্টার্ট করেন। তখনো হালকা তুলোর মত পেঁজা পেঁজা বাজনাটা গুঞ্জন তুলে চলেছে, কানে-মস্তিষ্কে।

অধ্যায় ঃ ১৯

ব্যাপারটা, যদিও, হলম্যানের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ব্যবসা-বিক্রি বাড়ানোর চমক হিসেবেই ঘটত, অথচ, সেটা একটা ব্যক্তিগত রেকর্ড ভাঙ্গা-গড়া হিসেবেও গণ্য হতে শুরু করেছিল, স্বাভাবিক কারণেই-ভাবেই। আইস স্কেটিং রিঙ্কের গোল মঞ্চটায়, সে বিরামহীন পাক খেয়েই চলত। বিরামহীন স্কেটিং-এর প্রদর্শনী। এমনকি রাতেও থামত না সে। লোকে দেখতে পেত, একটা স্টিলের লাঠিতে ভর রেখে রাতে সে বিশ্রাম নিত। এমন কি বসতও না পর্যন্ত। গাঢ় অন্ধকার আকাশকে প্রেক্ষাপট হিসেবে রেখে, সে মাঝে মাঝে রাতেও, সম্ভবত একঘেঁয়েমী কাটাতে (লাঠিতে ভর রেখে দাঁড়িয়ে থাকার) সে কয়েক পাক স্কেট করে নিত। আশেপাশের সব জায়গা, এমনকি জেমশবুর্গের মত দূরতম শহর থেকেও মানুষ আসত প্রতি বছরের এই—বিরামহীন স্কেটিংয়ের অভিনব প্রদর্শনী দেখতে। অবশ্য, তার কাছে, পরের বছরের উপস্থিতিটা, আগের বছরের অবিরত স্কেটিং সময়ের রেকর্ড ভাঙ্গা, এরকমই ছিল। সালিনাসবাসীরা তাদের শহরের এই চ্যাম্পিয়নকে নিয়ে গর্বিত ছিল। যেহেতু, শহরে আর কেউ, অতি সুদক্ষ, চ্যালেঞ্জ জানাবার স্কেটার ছিলনা। তাই প্রতিটি পরের বছরের আবির্ভাব, আগের বছরের অবিরত স্কেট করার সময় সীমাকে অতিক্রম করার জন্যেই, তাকে মঞ্চে উঠতে হতো—নিজের সঙ্গে লড়াই করতেই। নিজেরই কীর্তিকে ভেঙ্গে, নতুনতর করে গড়ে তোলা।

প্রতি বছরেই তার এই কীর্তি ভাঙ্গা গড়া, রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড গড়া, দেখবার জন্যে, হলম্যানের সামনে প্রচুর ভীড় হতো। সেই সুযোগে হলম্যান ডিপার্টমেন্টাল-ও নানারকম সেল চালু করে দিত ক্রেতা আকর্ষণের পদ্ধতি—ব্যবসায়িক চমক হিসেবে। এ বছর, প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিনেই ঘটল ব্যাপারটা। আচমকা, থেমে গেল স্কেটার। আতঙ্কের গলায় চেঁচিয়ে জানালো 'কেউ, আমার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছে'। গুলি? সমবেত দর্শকদের মধ্যে বিস্ময় এবং অস্বস্তিমাখা একটা গুঞ্জন উঠল। তারপর ডিসপ্লে বিভাগের জানালা থেকে গুলির কৌণিক দৃষ্টিপথ (অথবা গতিপথ) খুঁজে বের করা সম্ভব হলো। আততায়ী (!) কে চিহ্নিতও করা গেল। আর কেউ নন, স্বয়ং বৃদ্ধ ডাক্তার মোরে ভিললে তার প্রাসাদ পথ বাড়ীর কাঁচের জানালা, যেটি পূর্ব কোণে অবস্থিত, তার পর্দা সরিয়ে—এয়ারগানটি থেকে গুলি ছুঁড়েছেন। কেন? সে প্রশ্নই বলা বাহুল্য, ছড়িয়ে পড়ল সবার মনে। এবং সবাই একত্রে সমবেত হয়ে যখন ব্যাপারটার প্রকাশ্যে নিন্দা করল এবং ব্যাপারটা দন্ডার্হ্য বলে

জানালো-নির্দেশ করল, এমনকি বাহ্য লক্ষণ দ্বারা ভয় প্রদর্শনও করল, ডাক্তার নিজের অফিস ঘরে অন্তর্হিত হলেন। অবশ্য তার আগে তিনি কথা দিয়ে গেলেন, এবং এই হঠকারীতা থেকে বিরত হচ্ছেন।

স্কেটার যে সারা শহরের মানুষের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্নতর ভাবে চাঞ্চল্য উত্তেজকতার সৃষ্টি করে, তার আর এক নমুনা—উদাহরণ হলো শিল্পী হেঁনরী। যে, রেড উইলিয়ম গ্যাস স্টেশন, অর্থাৎ, তার কর্মক্ষেত্রেই, হলম্যানের স্কেটিং রিঙ্কের অনুকরণে এক গোলাকার মঞ্চ তৈরি করে। সে নিজস্ব দার্শনিকতার মাধ্যমে গোটা পরিস্থিতি তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণ করে। এবং, অতঃপর, মনস্থ হয়, সে চেষ্টা করবে। অতএব নিজের বাড়ীতেও অনুরূপভাবে একটি প্রস্তুতিক্ষেত্র তৈরি করল সে। কর্মক্ষেত্র এবং বাড়ীতে, নিজস্ব পদ্ধতিতে অনুশীলন শুরু করল হেনরী। স্কেটারকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্যে। এই ভাবেই, মোটকথা, শহরবাসীদের মধ্যে নিজের আবির্ভাব দিয়ে। বাৎসরান্তিক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনাগ্রন্থিরস-ক্ষরণের বাড়াবাড়ি, জাগিয়ে তুলত সে। শহরের প্রতিটি অধিবাসীই, কম-বেশি তার দ্বারা আকর্ষিত প্রভাবিত হতো। প্রতিবছরই, আগের বছরের সময়সীমাকে অতিক্রম করার পরই নতুন বিশ্বরেকর্ড (!) করার পর, শহরবাসী এবং দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে স্কেটার জানালা দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়ত। এবং জুতোটাও না খুলে, বিছানায় এলিয়ে পড়ত। বলাই বাহুল্য, ঐ বিছানায় কোন কোম্পানীর তোষক-গদী পাতা আছে, তার কার্ড স-গৌরবে ঝুলত। এবং সে বছরে, উক্ত ভাগ্যবান কোম্পানীর গদী-তোষক বিক্রি অবশ্যম্ভাবী ভাবেই বেড়ে যেত।

গোটা শহরটা এই ক্রীড়া উৎসব নিয়ে কয়েকটা দিন মেতে থাকত। শুনতে হয়ত খানিকটা বোকা বোকা লাগবে, নীতিবাগীশরা হয়ত অনৈতিকতার অভিযোগ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ভঙ্গ করার অপরাধে দায়ী করবেন। তবু, একটা অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন সবার মনেই উঠত-ঘুরত। কিন্তু কেউই সেই অনিবার্য প্রশ্নটির উল্লেখ করত না, উচ্চারণ করত না। অথচ প্রশ্নটা, এক তীব্রতর কৌতূহল হয়ে এবার মনেই খচখচ করে চলত। শ্রীমতি ট্রলাটে-র মত অভিজাত-ধনী মহিলা যখন প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন, তার মনেও প্রশ্নটা জেগে ভেসে উঠেছিল। শ্রী হল-এর মনেও প্রশ্নটা খোঁচা মেরেছিল। ইউলোখবী বোনেরা, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করেছিল—প্রশ্নটা ভেবে। কয়েকজন ছাত্রের দল তো নিজেদের মধ্যে বাজি ধরেই বসল, নানা রকম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে। যদিও, ওদের কার চিন্তা উদ্ভাবিত সম্ভাবনাটা সঠিক তার সমাধান অবশ্য হয়নি। রিচার্ড ফ্রস্ট, দৃঢ়চেতা, তুখোড়, যুবকটিকে চিন্তাটা অন্য সবার থেকে বেশি প্রভাবিত করেছিল। বলতে গেলে সে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত চিন্তাটায়। এক রাতে,

বৌয়ের সাথে তীব্র ঝগড়া হবার (যার কারণও অবশ্য, ঐ উদ্ভট চিন্তাটায় মাথা ভার, মেজাজ খারাপ হয়ে থাকা) তার, তার স্ত্রী বুঝতে পারল রিচার্ড বিছানা থেকে নেমে যাচ্ছে। রান্নাঘরে গিয়ে রিচার্ড কয়েকপাত্র পান করে। মাথাটায়, চিন্তা কৌতূহলটা আরো যেন ভনভন করে ওঠে। মোহগ্রস্থ আচ্ছন্নতা, স্বামীকে বাড়ী থেকে বের হয়ে যেতে টের পেয়ে, রিচার্ডের বৌ গজগজ করে ওঠে। ও ভাবে তার সাথে ঝগড়া করে রিচার্ড, ডোরার বিয়ার ফ্ল্যাগে যাচ্ছে, কোন নষ্ট মেয়ের ঘরে রাত কাটাতে।

রিচার্ড কিন্তু সোজা এসে হাজির হলো—হলম্যানে। আরো কাছে এগিয়ে যাবার আগে, পকেটে করে আনা বোতলটা বের করে এক ঢোক দিয়ে নেয়। রাস্তার নিভু নিভু আলোর আবছায়াতে, অন্ধকার আকাশের নীলমাখা পটভূমিতে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল সে, তার ইস্পাত লাঠিতে ভার রেখে। রিচার্ড আরো কাছে এগিয়ে যেতেই, জীবন্ত হল যেন এক পাষাণ মূর্তি। 'কি চাই?' কিছুটা বিষন্নতা, কিছুটা বিস্ময়, আবার কিছু বিরক্তিও মিশে থাকে। রিচার্ড আর এক ঢোক গিলে নেয়। তারপর, অনিবার্য সেই প্রশ্নটি সারা শহর যাতে আলোড়িত-তোলপাড়, ছুঁড়ে দেয় 'হে, তুমি দৈনন্দিন প্রাতঃকৃত্য সারো কি ভাবে? কোথায়?' উত্তরহীন কয়েক মুহূর্তের পর রিচার্ড আবার বলে 'হে, আমার কথা শুনতে পেলেনা?' আরো কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর—উঁচু মঞ্চটা থেকে নয়, যেন অকাশ থেকে ভেসে আসা কোন অমোঘ ভবিষ্যতবানী 'আমার এখানেই পাত্র রাখা থাকে একটা।' রিচার্ড পেছন ফেরে, দ্রুত পায়ে-নির্জন রাতেরপথ ধরে বাড়ীর দিকে ফিরে চলে। মাথাটা নেড়ে, বার দুয়েক বিড়বিড় করে, অস্পষ্ট কিছু অবোধ্য কোন শব্দ-বাক্য।

ওর কাছে একটা পাত্র রাখা থাকে।

অধ্যায় ঃ ২০

সকালবেলাই মডেল-টি ট্রাক গাড়ীটা উদ্ধত বিজয়ীর ভঙ্গীতে ক্যানেরী রো-তে ফিরে এলো। কাদা মাখা-বালি জর্জরিত-আঁশটে গন্ধ ভুরভুর। ঠিক লি চঙ-এর দোকানের সামনেই দাঁড়াল সেটা। ছেলেরা, লাফ দিয়ে নামল গাড়ী থেকে। পাঁচ গ্যালন তেলের অবশিষ্টটুকু পাইপ দিয়ে টেনে বের করে একটা পাত্রে জড়ো করল। ব্যাঙের ড্রামগুলোকে কাঁধে তুলে নিলো। ম্যাক, একবার লিয়ের দোকানে ঢুকে তাকে ট্রাকটা ফেরত দিয়ে যাবার কথাটা অভিযানের বিরাট সাফল্যের কথাও সে লি-কে জানালো। লি হাসল। তার কাছে, এসব জানা খুব জরুরী নয়। সে নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিষটার অপেক্ষায়, মাথা কাত করে ম্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকে। ম্যাক, হাসে, 'ডাক্তার আমাদের যে দর দেবে তাতে মোটা পয়সাই হাতে আসবে।' লি, ক্ষুদে-চ্যাপ্টা চোখে তাকিয়ে থাকে। ম্যাক অস্বস্তির ভঙ্গীতে তাকায়। দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে বলে 'ইয়ে, মানে, লি ভাই, আমাদের ভাঁড়াড়ে টান ধরেছে....' 'হুইস্কি নয়, ধার নয়।' লি ক্ষুদে চোখের ঝলকানি তুলে বলে। ওর ভঙ্গীতে বিরক্তি স্পষ্ট তীব্রতর হয়। 'পাওনা গন্ডা মেটাবার নাম নেই, তার আগেই নতুন ধার। ছোঃ, এভাবে ব্যবসা করা যায়? ম্যাকের চোখে রাগের প্রখরতা ঝলসে উঠতে দেখেও, সে গ্রাহ্য করে না। ম্যাক কাধ ঝাঁকায় 'হুস্কি? কে তোমার কাছে হুইস্কি চাইছে? এক পিপে ভরতি ভাল জাতের হুইস্কি মজুত আছে আমাদের। আসলে, আমরা একটু অসুবিধায় পড়েছি। ডাক্তার, শহরে নেই। তাই এখনি আমরা পাওনা পাচ্ছিনা। ছেলেরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলল। ডাক্তার আমাদের যে দর দেবেন, আমরা পাঁচদর কমে তোমায় ২০টা ব্যাঙ দিচ্ছি....এগুলো ডাক্তারের কাছে, বেচে ব্যাঙ প্রতি পাঁচ সেন্ট লাভ করতে পারবে। এই ব্যবস্থায় কারোই কোন ক্ষতি হবে না-হচ্ছে না।' লি অনড় ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে। না, কোন টাকা নয়—ম্যাক এবার রাগের প্রচন্ড বহিঃপ্রকাশে মাটিতে পা দাপায় 'ওহ লি, টাকাও নয়। আমরা তোমার কাছে সামান্য কিছু মুদীদ্রব্য চাইছি মাত্র। ডাক্তার শহরে নেই, ভাড়ারে টান পড়েছে, তাই তোমায় অনুরোধ করছি।' না, না, আমায় মাপ করো। ধার-বাকি কারবারে তোমাদের সঙ্গে আমি নেই। ম্যাক তবু যেন ধৈর্য্যের প্রতিমূর্তি 'লি, আমাদের জন্যে তোমার কাছে কিছু চাইছিল না লি। আসলে, ডাক্তার শহরে ফেরা মাত্র আমরা ওকে একটা পার্টি দিতে চাই। সে জন্যেই মালপত্র চাইছি। ডাক্তারের মত ভাল মানুষের জন্যে, এটুকু সাহায্য কি আমাদের করা উচিত নয় তোমার? তোমার স্ত্রী যখন দাঁতের ব্যাথায় পাগল কাতর হয়ে উঠেছিলেন, তখন ডাক্তার কিভাবে তাকে স্বস্তি দিয়েছিল, এত তাড়াতাড়ি ভুলে

গেলে?' আহ্-হ্, ম্যাক আসল জায়গাতে ঘা মেরেছে। সত্যিই, লি ডাক্তারের কাছে ঋণী। শুধু স্ত্রীয়ের দাঁত ব্যাথার কারণেই নয়। আরো নানা ভাবে, নানা কারণে, সে ঋণের বোঝা বেশ ভারী। সুতরাং ম্যাককে, ডাক্তারের খাতিরে মালপত্র দেওয়া তার নৈতিক কর্তব্য। তাছাড়া, এই মত্তদার ব্যবসায়িক দিকটাও ভেবে দেখতে হয় বইকি। দ্বিমুখী লাভ। ব্যাঙ প্রতি পাঁচ সেন্টের লাভটাতো থাকছেই, সঙ্গে মুদীমালের বিক্রিলাভ। সুতরাং রাজী না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারেনা। শুধু একটাই ঘটনা। ধার নিচ্ছে ম্যাক, সুতরাং, আদৌও ব্যাঙ ওর কাছে আছে কিনা যাচাই করে দেখা জরুরী।

আমি ব্যাঙগুলোকে আগে আগে দেখতে চাই লি বলে। ম্যাক তাকে ট্রাকের কাছে নিয়ে যায়। লি নিশ্চিন্ত হয়। সে সতর্ক থাকে। মরা ব্যাঙ নেবেনা। ম্যাক ও তার দলবল গুনে গনে দুডলার মূল্যের ব্যাঙ তাকে একটা পাত্রে তুলে দেয়। বিনিময়ে, ওদের দুডলার দামের প্রয়োজনীয় মুদী দ্রব্য সরবরাহ করে লি। এটা যথেষ্ট যুক্তি সঙ্গত, ব্যবসায়িক শর্তসাপেক্ষ, বিনিময় হলো। ধার বাকির অনিশ্চয়তা রইল না। লি, ওরা চলে যাবার পর খুশি মনে মাথা নাড়ে। নাহ, সে যথেষ্ট লাভের—দ্বিমুখী লাভজনক সওদাই করেছে। এবং দেখা গেল, সেই লাভজনক সওদা শেষ হয়েও শেষ হয়নি। একটু পরই, এডি এগুলো। দুটো ব্যাঙের সম মূল্যের বুল ডারহাম বিনিময় হল। কিছুক্ষণ পর, একটা কোকাকোলার জন্যে লি যখন জোনসের কাছে দুটো ব্যাঙ দাবী করল, সে ক্ষেপে উঠল। তার মতে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হযে যাচ্ছে। একটা কোকের জন্যে, একটা ব্যাঙই সঙ্গত যুক্তিগ্রাহ্য দাম হতো, হওয়া উচিত ছিলো। এবং দিন যতো তৈরি হতে লাগল। এক পক্ষের দাবী, অনাবশ্যক ভাবে—একতরফা ভাবে বিনিময় হার চড়িয়ে সঙ্গত উচিত। আমি তো কাউকে মাথার দিব্যি দিচ্ছি না। না পোষালে কিনো না। উদাহরণ হিসেবে, ম্যাকের দল মনে করল দাবী জানালো, ভাল মানের 'স্টেক'-এর এক পাউন্ডের দর হওয়া উচিত দশ-ব্যাঙ, কিন্তু, লি সেটার দর হাঁকল সাড়ে বারো। একে তো, সাড়ে বারো ব্যাঙ, হিসেবটাই জটিলতর। তার ওপর ম্যাক ও তার দলবলের কাছে আড়াই ব্যাঙ বেশি দেয় চাওয়াটা, বেশ চড়া দামই মনে হলো। বিলের কৌটোর বিনিময় দরও, আকাশ ছোঁয়া চাইতে শুরু করে লি, আট ব্যাঙ-প্রতিটিন। ওদের মনে হতে থাকে লি খরিদ্দারদের গলায় ফাঁস দিয়ে মারছে-শ্বাসরোধ করে।

যদিও, দরজনিত এবংবিধ গুরুতর সমস্যা, মন কষাকষি, তিক্ততার পরও, লি-এর ব্যাঙের পাত্রটি ভরে—উপচে উঠতে লাগল। যদিও, শেষ পর্যন্ত এই তিক্ততা বেশিদুর গড়াতে পারল না, তার কারণ, ম্যাক অথবা তার দলবল, কেউই সেরকম ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির অথবা হিসেবী ধরনের নয়। কেনা কাটার

আনন্দটাকে তারা তুচ্ছ দরদাম অথবা ব্যাক্তিত্বের লড়াই হিসেবে মাপে না। যদিও তারা বুঝতে পারছিল, লি, তাদের ওপর অনাবশ্যক চড়া দরের কোপ বসাচ্ছে, অনাকাঙ্খিত অবৈধ সুযোগ নিচ্ছে। তবু, তারা খুশি ছিল—দু ডলারের বেকন, ডিম আর হুইস্কি দিয়ে পাকস্থলী পূর্ণ করার আনন্দে, উদ্বেল হয়ে ছিল। খাওয়া দাওয়া সবার পর ফ্লপ হাউস, অর্থাৎ নিজেদের বাড়ীর চেয়ারে আরামের ঢেকুর তুলতে তুলতে হেলান দিয়ে বসে তারা, সকৌতুকে, 'প্রিয়তমা'র কৌটোজাত দুধ পান শেখার চেষ্টা, আপ্রাণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করছিল। প্রিয়তমা' তাদের পোষ্য কুকুরটি। এই পাঁচ পুরুষের, পাঁচ জনেরই পোষ্য সারমেয়কে শিক্ষিত করার ব্যাপারে ভিন্নতর মত-প্রনালী জানা ছিল। ফলে তারা পাঁচজন পাঁচরকম বিচিত্র পদ্ধতিতে—একটার সঙ্গে অন্যটার কোন যোগই নেই যে পদ্ধতিগুলোর, দ্বারা কুকুরটাকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করত। বেচারা 'প্রিয়তমা।' তাছাড়া, প্রিয়তমা'র দখলে নেবার জন্যে সবসময় তারা সারমেয়টিকে প্ররোচিত করত, অন্যদের সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করার চেষ্টা করত। নানারকম ঘুষ প্রদানের অলিখিত বিধিও প্রচলিত হয়ে পড়ল, গোপনে 'প্রিয়তমা'র মন জয় করার জন্যে। কুকুরীটিও, মালিকদের চরিত্র-কান্ডজ্ঞান সম্পর্কে সেয়ানা-ওয়াকিবহাল হয়ে পড়েছিল, উঠেছিল। তাই, তাকে সেই মালিকটির বিছানাতেই ঘুমোতে দেখা যেত, যে তাকে শেষতম ঘুষটি দিয়েছিল।

এবং এই রেষারেষি, একজনের কাছ থেকে দলে বলে সরিয়ে এনে নিজের দখল নেওয়া, অত্যাধিক খাবার দেওয়া, পরিশ্রম না করানো, এবং পাঁচ জনের সতের বিচিত্র পদ্ধতির শৃঙ্খলাবদ্ধ করা শিক্ষাদান, সব মিলিয়ে কুকুরীটা 'অতি আদরে বাঁদর' এক অলস—অকর্মন্য জীব হয়ে উঠতে লাগল। যদিও, এটা অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই ছিলনা যে প্রাণীটাকে ওরা সবাই প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। এবং সেই ভালবাসার সুযোগ প্রাণীটা ভালই নিতো। পাঁচজন ছন্নছাড়া মানুষের ভবঘুরে জীবনে সে রাজত্ব করত। আক্ষরিক অর্থে, বাস্তবিক ভাবেই। যা খুশি করে বেড়াত।

ব্যাঙ শিকার করে ফেরার সেই সন্ধ্যায়, নিজেদের বাড়ীতে বসে খোশ মেজাজে পানীয়র গ্রাসে চুমুক দিচ্ছিল তারা। প্রতিবারই, যে গ্লাস খালি হবার পর নতুন করে ভরতে যাচ্ছিল, অন্যেরা সমবেত কণ্ঠে তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল, বেশি যেন না নেয়, ঐ মহার্ঘ্য পানীয়টি আসলে ডাক্তারকে আপ্যায়ন করার জন্যেই আনা হয়েছে, সেটা যেন খেয়াল রাখে। 'ডাক্তার ফিরবে কবে?' এডি প্রশ্ন করে। ম্যাক বলে, 'সম্ভবত, আজ রাত আটটা-নটার মধ্যেই।' 'আমাদের তাহলে মনস্থির করে ফেলতে হয়, পার্টিটা আমরা কবে দেব? আমার তো মনে হয় আজ রাতটাই উপযুক্ত হবে।' অন্যেরা সবাইও দেখা গেল সে

ব্যাপারে একমত। সবাই সম্মতি দিল। হ্যাজেল অবশ্য বলল 'অতটা পথ গাড়ী চালিয়ে এসে ডাক্তার পরিশ্রান্ত থাকবেন না তো?' জোন্স সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'ক্লান্তি দূর করার জন্যে, একটা জবরদস্ত পার্টির থেকে ভাল ওষুধ আর কিছু হতে পারে না।' ম্যাক সমর্থনের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে। আমার মনে হয় সব ঠিকঠাক করে ফেলা, একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলা উচিত এখনি। কোথায় দেওয়া হবে পার্টিটা? এখানে?' হ্যাজেল মাথা নাড়ে, 'ডাক্তার তার সুর-বাজনা-গানগুলো পছন্দ করেন। পার্টি চলার সময়ে নিজের মনোগ্রামটা না বাজলে, তিনি যেন পুরোপুরি পার্টির আনন্দটা উপভোগ করতে পারেন না।' 'ঠিক। একদম ঠিক কথা। সে হিসেবে পার্টিটা ডাক্তারের বাড়ীতে হওয়াটাই যথাযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত, বাঞ্ছনীয় হবে।' 'হ্যাঁ, মনে হয় সেটা হলেই তিনি বেশি খুশি হবেন।' ম্যাক এতক্ষণ সব শুনছিল। এবার সে কথা বলে 'সেসব তো ঠিক আছে। কিন্তু আমি চাইছি একটা চমক হিসেবে পার্টিটাকে তার কাছে হাজির করতে। একটা হুইস্কির পাত্র নিয়ে তার কাছে যাওয়া, ব্যাপারটা তা নয় মোটেই।' 'সাজানো-গোছানোর ব্যাপারটাই বা কি হবে?' হ্যাজেল প্রশ্ন করে। 'আমার মনে হয়, চার জুলাই অথবা 'ডাইনি দিবস' টাই উপযুক্ত হতো' হিউজ মত দেয়।

'আহ-হ' ম্যাকের গলা দিয়ে একটা উল্লাসের আর্দ্রস্বর ছিটকে বের হয়, ওর দুচোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, 'হিউজি, আমি ভাবতে পারছি না হিউজি, তুমি-তুমি এটা পারো, করেছ। অথচ, এটা সত্যিই অসাধারণ পরিকল্পনা। তুমি একেবারে 'ষাড়ের চোখের লক্ষ্য' বিদ্ধ করেছ। ভাবো, ভাবো তো, ডাক্তার গাড়ী চালিয়ে ফিরলেন। পরিশ্রান্ত ক্লান্ত। দরজা খুলে ভেতরে এসে আলো জ্বালতেই চমকে উঠলেন। সারা ঘরটা রঙীন কাগজ ফিতে, বেলুন, ঝুলন্ত মুখোশ দিয়ে সাজানো। টেবিলে চেক, মদের পাত্র। আরেকটা টেবিলে নানারকম খাবার। ডাক্তার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। এটা একটা আচমকা বিস্ময়ের চমক দেওয়া পার্টি, সেটা ততক্ষণে তিনি বুঝে গেছেন। কিন্তু, পার্টিটা কে দিচ্ছে বুঝতে অনুমান করতে না পেরে, কারণ আমরা তখনো আড়ালে আত্মগোপন করে থাকব, কিছুটা বিস্ময়ে অবাক হলেও, তার মুখে তখন ভেসে উঠেছে চরম আনন্দের প্রকাশ। ওহ, হে যীশু। বন্ধুরা, তোমরা কি ডাক্তারের সেই মুখটা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছো? আমি কিন্তু স্পষ্ট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।' হেনরী বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু আমরা ভেতরে ঢুকব কি করে বাড়ীর? ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে?' ম্যাক বলে, 'আবশ্যই এ জন্যে আমাদের বেপরোয়া হতে, একটু ঝুঁকি নিতে হবে। আমাদের কাউকে পেছন দিকের কোন জানালার কাঁচ ভেঙ্গে বাড়ীর ভেতর ঢুকে সদর দরজাটা খুলে দিতে হবে।'

লি. চণ্ড-এর দোকানটা সত্যিই আজব এক যাদু বাক্স। কি যে পাওয়া যায় না সে আশ্চর্য দোকানে। ডাইনি দিবসে'র ভুতুড়ে মুখোশ অথবা বিচিত্র কারুকাজ খচিত ভুতুড়ে কুমড়ো, অথবা ভ্যালেনটাইনের প্রেমের স্মৃতিময় উপহার, চার জুলাইয়ের দিনে নানা আকারের জাতীয় পতাকা এবং হাওয়াই বাজি, গ্রীষ্মের জন্যে নারী ও পুরুষের নানা ধরনও বর্ণের সাঁতার পোষাক। মরশুমী সবকিছুই পাওয়া যাবে তার কাছে। মরশুমটি শেষ হলেই অবশ্য সেগুলো উধাও হয়ে যায়। কোথায় যায় কেউ জানেনা। সবাই অবাক হয়ে ভাবে, এতসব মালপত্র গুদামজাত করে সে রাখে কিভাবে—কোথায়? তার দোকানটা মোটেই বেশি বড় নয়। বরং বেশ অপরিসরই।

ম্যাক এবং তার সঙ্গী সাথীদের লি.এর দোকানে অবিরত যাতায়াত করতে দেখা যেতে লাগল। লি এর ব্যাঙের বাক্সটা ক্রমেই ভীড়াক্রান্ত হয়ে উঠতে লাগল। আর প্যালেস ফ্লপ হাউসের মেঝেতেগাদা হয়ে জড়ো হতে লাগল, পার্টির নানা রকম দ্রব্য উপকরণ। রঙীন কাগজ ফিতে, বেলুন থেকে শুরু করে, 'রান্না খাবারের কৌটো। ম্যাক হঠাৎ প্রশ্ন করে 'কেক, বড় একটা কেক কোথায় পাওয়া যাবে?' সত্যি, লি. চণ্ড-এ বস্তুটা রাখেনা। শহরে কোন ভাল বেকারীও নেই, যারা পার্টি উপযোগী কেক বানায়। হিউজি, তার আগের সাফল্যজনক পরামর্শদানের উৎসাহে, আবার মুখ খোলে 'এডি, তুমি কেন একটা কেক বানাও না?' এডি কয়েক মাস সান কার্লোসের এক রেস্তোঁরার ভাজা খাবারের পাচক ছিল। যদিও, কেক বানাতে সে রাজী হয়ে গেল, কিন্তু একথাও স্বীকার করল আগে সে কোনদিন কখনো কেক বানায়নি। মুখ ধোবার বেসিনটাকে কেক বানাবার পাত্র হিসেবে ব্যবহার করে। তাতে কেক বানাবার মাল মশলা ঢেলে মহা উৎসাহে সে কাজে লেগে পড়ল। প্রথমবার মাখা শেষ হবার পরই দেখা গেল, মিশ্রনটাকে ফুঁড়ে নানা রকম পোকা বের হচ্ছে। আরো বিস্তারিত পরীক্ষার পর দেখা গেল, সেই কেক মিশ্রণের তালে গিজ গিজ করছে, নানা আকৃতির বর্ণময় পোকা। অবিলম্বে এডি নিজের ভুলটা বুঝতে পারল। এই মিশ্রনটাকে বাতিল করে নতুন করে কাজে লাগার আগে, বেসিনের জল যাবার ঝাঁঝরি মুখটাকে ন্যাকড়া দিয়ে খুব শক্ত করে বন্ধ করে দিতে ভুলল না। যাতে, কেক মিশ্রণের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এবারও ঐ পথে উঠে এসে মিশ্রণটাকে বরবাদ করতে না পারে শয়তানের দল।

ডাক্তারের বাড়ীতে ঢোকার জন্যে বেশি কষ্ট করতে হলো না। দ্রুত হাতে, অবিশ্বাস্য গতিতে ঘরটাকে পার্টির উপযোগী করে সাজানো হচ্ছিল। এর মধ্যে, আরো একবার লি চণ্ডের দোকান থেকে ৪৯ সেন্ট ওয়াইন এর বোতল আনানো হলো ম্যাকের পরামর্শে। 'ডাক্তার ওয়াইন ভক্ত। আমার মনে হয় হুইস্কির

থেকেও, এটায় বেশি খুসি হবেন। পছন্দ করবেন।' সব উপকরণগুলো ঘরের মেঝেতে জড়ো করার পর, ম্যাক বলে 'ঘরের একদম মাঝখানে খুশি হবেন?' 'ওয়াইন' হ্যাজেল বলে। 'না' ম্যাক উত্তর দেয়। 'সাজানোটা?' এডি বলে। ম্যাক নঞর্থক ভাবে মাথা নাড়ে। 'কেকটা?' মরিয়া হেজেল বলে 'না, না, ব্যাঙ, ব্যাঙগুলো। যেটা তার কাছে সব থেকে খুশির ব্যাপার, স্বস্তির খবর হবে।' একটু থেমে সে আবার বলে 'ঘরের ঠিক মাঝখানেই ব্যাঙের পাত্রটা থাকবে। তার ওপরে থাকবে সুন্দর কারু কাজ নকশা করা হরফে একটা লেখা বাড়ী ফেরার জন্যে অভিনন্দন, সুস্বাগতম।'

ব্যাঙ-এর সংগ্রহটা আকর্ষক—জোরদার করার জন্যে, লি এর সংগ্রহের ব্যাঙগুলোকে আনার উদ্যোগ হলো। সে প্রথমে নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার ছেড়ে দিতে, সেগুলো ওদের হাতে তুলে দিতে মোটেই রাজী ছিলনা। কিন্তু ম্যাকরা একটুকরো কাগজে লিখিত ভাবে ব্যাঙগুলো তারই সম্পত্তি মেনে নেবার পর সে রাজী হলো।

সাজানো-গোছানো শেষ হলো। আলো ঝলমল—সুসজ্জিত ঘরটা যেন সহাস্যে ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ফনোগ্রামটা চালিয়ে দেওয়া হলো। পার্টি, উৎসব মানসিকতা তখন ম্যাক ও তার দলবলের মধ্যে চাগিয়ে উঠেছে। ডাক্তার আসুক, যে কোন মুহূর্তেই তো সে এসে পড়বে, আমরা কোন অনুষ্ঠান শুরু করে দিইনা? ডাক্তার এসে নাহয় যোগ দেবে মাঝপথে। আচমকা গোপন-বিস্ময় চমক, এসবের ধৈর্য্য চুক্তি ঘটেছে তখন তাতে। অতএব রাত নয়টা নাগাদ পার্টি ঘোরতর জমে উঠল। রাস্তার পথচারীরাও দু-একজন এসে পার্টিতে যোগ দিচ্ছিল। ডাক্তারকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে, (অবশ্যই দুর নিয়ন্ত্রিত ভাবে) তার স্বাস্থ্যপান করে বিনা খরচে একটু পান করে যাবার সুযোগ নিচ্ছিল। অবিলম্বে দেখা গেল, হুইস্কির পাত্র শেষ। লি চঙও মাঝে মাঝে এসে ঘুরে গেলো। তার পাকস্থলী ব্যাপক বিদ্রোহ করেছে। তাই তাকে বাড়ীতে বলে যেতে হলোই, পার্টিতে অংশ নিয়ে। রাত এগোরোটা নাগাদ খাবার দাবারও সবই শেষ হয়ে গেল। মদহীন, খাবারহীন পার্টিতে জমজমাট ভাবটা অন্তর্হিত হতে দেরী হলনা। হয়ত উৎসাহের স্তিমিততার ঘাটতি মেটাতেই, ওদের একজন কেউ, রেকর্ডগুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে কাউন্ট বেসিয়ের একটা রেকর্ড পেল। সেটা ফনোগ্রামে চাপিয়ে দেওয়া হলো। এত জোরে যন্ত্রটা বাজছিল যে বোধহয় 'লা-ইদা' থেকে সে শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একদল রসপায়ী, যারা নাকি বিয়ার ফ্ল্যাগের দিকে যাচ্ছিল, তারা, ওয়েস্টার্ণ বায়োলজিক্যালকে, বিয়ার ফ্ল্যাগের দিকে যাচ্ছিল, তারা, ওয়েস্টার্ন ব্‌য়োলজিক্যালকে, বিয়ার ফ্ল্যাগের কোন সদ্য গজিয়ে ওঠা প্রতিযোগী ভেবে, এবাড়ীতে ঢুকে পড়তে চাইল। গৃহকর্তাদের সরোষ তাড়া

খেয়ে লাপাতে হলেও, তারা তীব্র বাদ প্রতিবাদের জের হিসেবে, পাথর ছুঁড়ে বেশ কয়েকটা জানালার কাঁচ ভেঙ্গে ছিল, সামনের দরজার পাল্লাটাও ক্ষতিগ্রস্থ হলো।

দাপাদাপির চোটে বেশ কয়েকটা কাঁচের পাত্র ভাঙ্গার অস্বস্তিকর শব্দও পাওয়া যায়। যে শব্দ ওদের কাছে মোটেই কর্ণসুখজনক মনে হয় না। হেনরী, রেকর্ড পাল্টাতে গিয়ে হুড়মুড় করে এক পাঁজা রেকর্ড ফেলে, ভাঙ্গে। হেজেল, রান্নাঘরে কি যেন রান্না করতে গিয়ে এক ডেকচি ভরা ফুটন্ত তেল মাটিতে উল্টে ফেলে। রান্না ঘরের কাঠের মেঝে বিশ্রীভাবে পুড়ে যায়। অন্যেরা আঁতকে ওঠে মেঝেটা দেখে। দেড়টা নাগাদ, ওরা সবাই কমবেশি মাতাল হয়ে ওঠে। নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ কারণে হাতাহাতি করতে গিয়ে ব্যাঙের পাত্রটা উল্টে দেয়—ভেঙ্গেও ফেলে। ক্রমে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছিলই—বেড়েই চলেছিল। ফনোগ্রামের কৃষ্ট্যালটা ভাঙ্গে। দরজার আর্চটা চুরমার হয়। মেঝেটা, প্যাকিং বাক্স মুক্ত ব্যাঙেদের বিচরণের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে। সঙ্গে কাঁচের টুকরো, অভুক্ত খাবার, কাগজের টুকরো, সাজানোর রঙীন শিকলের ছিন্নাংশ, এসবে ভারে উঠতে থাকে। কে একজন, বইয়ের তাকটা নিয়ে ছড়িয়ে যায় দামী মূল্যবান বই, গবেষণা খাতায়। বন্ধনমুক্ত ব্যাঙগুলো, বিপদের গন্ধ পেয়ে এবং জানালা দিয়ে আসা খোলা পৃথিবীর গন্ধে, দরজা দিয়ে একে একে পাড়ি দিচ্ছিল।

গোটা পার্টিটা অবশেষে পরিণত হল, দীর্ঘ রোগ ভোগের পর মৃত এক মানুষের শবদেহে। আশ্চর্য এক রসিকতা হয়ে ঝুলতে থাকল, নির্মম ব্যাঙ্গের মত 'সুস্বাগতম' বোর্ডটা।

অধ্যায় ঃ ২১

ল্যাবরেটরীর পেছনের ঘরে, নিজেদের খাঁচায়, সাদা ইঁদুরগুলো ভয়ার্ত— উদভ্রান্তেরর মত ছুটে বেড়াচ্ছিল। মাঝে মাঝে, নিজের বাচ্চাদের বুকের তলায় ঢুকিয়ে—আড়াল করে, কি এক অজানা আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে গলা তুলে তুলে চারপাশ দেখছিল, আর অদ্ভুত আর্ততা মেশানো এক স্বরে ডেকে উঠছিল। অস্বাভাবিকতা, পরিবেশে বিঘ্নিত ভারসাম্য স্থিতিশীলতার গন্ধ তাদের নাকেও কি পৌঁছেছিল? সদ্য ভোরের সময়টায়, যখন, লি চঙ সবে তার দরজা খুলছে, শ্রীযুক্ত ম্যালোয়ী রমলার বাড়ী থেকে বের হয়ে এসে সদ্য ফোঁটা প্রথম আলোর রেখার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন, বৃদ্ধ চীনাটি যথারীতি দৃশ্যমান হলো, বিয়ার ফ্ল্যাগের মদ পরিবেশকটি রাত জাগা ক্লান্ত চোখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল, তখন, ঠিক তখনি, গাড়ীটার শব্দ পাওয়া গেল।

ডাক্তারের গাড়ীটা এসে থামল ল্যাবরেটরীর সামনে। ক্লান্ত-ধীর ভঙ্গীতে তিনি গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললেন। প্রথম কয়েক ধাপ সিঁড়ি চড়েই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অবাক চোখে খোলা দরজা, কাঁচ ভাঙ্গা জানালার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে রইলেন। কি ঘটেছে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। বাড়ীর ভেতর পা দিয়েই তার মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল। ঘুরে ঘুরে সারা বাড়ীর হাল দেখতে দেখতে, তার চোখে রাগের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বের হতে লাগল। নিচু হয়ে বসে, একটা ভেঙ্গে যাওয়া ফনোগ্রাম রেকর্ড তুলে নিয়ে সেটার শিরোনামটা পড়লেন। মুহূর্তে তার সারা শরীর কঠিন হয়ে উঠল। ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়লেন তিনি। আচমকা, কি মনে হতে, লাফিয়ে উঠে একটা রেকর্ড চাপিয়ে ফনোগ্রামটা চালিয়ে দিলেন। একটা গোঙানোর মত শব্দ ছাড়া, রেকর্ডের সুরের কিছুই বের হলনা। আবারও, ধপ করে সোফাটায় বসে পড়লেন তিনি।

একটা স্খলিত-এলোমেলে পদশব্দ শোনা গেল। ম্যাক এসে দরজায় দাঁড়াল। মুখ। চোখ দুটোই নেশাতুর, ঘোর লাগা রক্তবর্ণ। 'ডাক্তার' ম্যাক জড়ানো গলায় বলে। ডাক্তার, ম্যাকের দিকে তাকান। তার চেহারায়—অভিব্যক্তিতে, নিমেষে একটা পরিবর্তন ঘটে। কি যেন বুঝে যাবার প্রতিক্রিয়া। সোজা-স্পষ্ট চোখে তিনি ম্যাকের দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'ডাক্তার, ইয়ে মানে....আমরা....ইয়ে, মানে....' 'এসব, তোমাদের কাজ? তোমরা এসব করেছ?' ঠান্ডা-কাটা কাটা গলায় ডাক্তার প্রশ্ন করেন। ম্যাক, তার রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকায়, নেশা ভারাক্রান্ত ইষৎ জড়িত গলায় বলে 'হ্যাঁ, আমি...অন্যরা...দলের ছেলেরা...' ডাক্তারের মুষ্টি বদ্ধ হাত সাপের ফনার মত ম্যাকের মুখে আছড়ে পড়ে। ম্যাক টলে ওঠে। ঠোঁটের কোনটা নিমেষে রক্ত ঝরাতে শুরু করে। ডাক্তার, আমার কথাটা বোঝবার চেষ্টা করুন...আমি...আমার...দলের ছেলেরা...' টলোমলো পায়ে সে এগিয়ে আসতে থাকে। 'দড়াম' শব্দে দ্বিতীয় ঘুষিটা আছড়ে পড়ে। বোঁ করে একপাক ঘুরে, টলমল করতে-করতে মাটিতে আছড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ম্যাক। মাথা তুলতেই দেখা যায়, তার ফাটা ঠোঁটের বাইরে বেরিয়ে এসেছে একটা ভাঙা দাঁতের টুকরো। ম্যাক, নেশার ঘোর ও মারের ঝটকা মেশা টলমলে—কাঁপুনি গ্রস্থ মাথা ও শরীর নিয়ে, কোনরকমে উঠে দাঁড়ায়। বারকয়েক চেষ্টা করতে গিয়ে টলে পড়ে যাবার পর, অবশেষে সফল হয়। ডাক্তার, তার হাতে ব্যাথা বোধ করেন। ম্যাক সোজা চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মাতালতর চোখ জলে ভরে ওঠে। কি যেন, এক দুর্বোধ্যতর সেই কান্না। বোধহয় অকারণ এবং মানেবিহীনও। চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়া অশ্রু রেখা এবং ফাটা ঠোঁটের গড়ানো রক্ত, একই সঙ্গে হাতের উল্টো পিঠ

দিয়ে মুছে নিতে নিতে, ঘোর লাগা-মাতালীয় আবেগের উন্মাদনাময় কান্নায় ম্যাক চিৎকার করে ওঠে 'মারো, এসো, মারো—মারো আমাকে। আমি এরই যোগ্য।' ডাক্তার, ম্যাকের সেই তীব্র উন্মাদনার দিকে তাকান। তার হাতে ব্যাথা বোধ করেন। ম্যাককে আঘাতের চেষ্টার ফল। ধীরে ধীরে নুয়ে পড়ে তার দুকাঁধ—হেরে যাওয়া মানুষের ভঙ্গীতে। ঝুলে যাওয়া কাঁধসহ তিনি সোফায় বসে পড়েন। ঘর জুড়ে তখন উচ্চকিত সুরে বেজে চলেছে ফনোগ্রামের রেকর্ডে মন্টে ভাবদির Hor' ch El ciel e la Terra'। আর তখনি তার মনে পড়ল ফনোগ্রামটা ভেঙ্গে গেছে— নষ্ট হয়ে গেছে।

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালো। 'যাও, মুখ ধুয়ে এসো।' তিনি বাড়ীর বাইরে বের হয়ে এলেন। সোজা লি এর দোকানে ঢুকলেন। আইসবক্স থেকে দুটো বরফ শীতল বিয়ারের কৌটো নিয়ে, দাম মিটিয়ে ফিরে এলেন। রান্নাঘরে ঢুকে দুটো গ্লাসে বিয়ার ঢেলে তিনি যখন আবার বাইরের ঘরে ফিরে এলেন, ম্যাক রক্ত মাখা মুখ ধুয়ে সাফ করে, মুখে একটা ভিজে তোয়ালে চেপে ধরে ফিরে এসেছে। ডাক্তার একটা বিয়ারের গ্লাস তার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। এক নিঃশ্বাসে, বিয়ারটাকে গলায় ঢেলে দিয়ে ম্যাক একটা স্বস্তির শব্দ করল। ডাক্তার নিজের গ্লাস শেষ করলেন। আবার দুটো গ্লাস বিয়ার পূর্ণ করলেন। ফাটা ঠোঁট দিয়ে চুঁইয়ে আসা রক্ত ভিজে তোয়ালে চেপে বন্ধ করার চেষ্টা করছিল ম্যাক। গ্লাসটা ওর হাতে তুলে দিয়ে, নিজেরটা নিয়ে সোফায় এসে বসলেন তিনি। ধীরে সুস্থে একটা চুমুক মারলেন। 'কি ঘটেছিল?' ম্যাক বিয়ারের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দেয় 'আমরা আপনাকে একটা পার্টি দেব ঠিক করেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম আপনি গতকাল রাতেই ফিরে আসবেন।' ডাক্তার মাথা নাড়েন বুঝলাম। 'ব্যাপারটা হাতের বাইরে—আয়ত্বের বাইরে চলে গেল, কি করে যেন, নিজেই বুঝলাম না। আসলে আমার সঙ্গে সবসময়ই এরকমই ঘটে।' ম্যাক কথা শেষ না করেই থামে, একটা শ্বাস ফেলে, প্রবলতর দীর্ঘশ্বাস 'আমি দুঃখিত বলব না, ক্ষমা চাইব না। সারা জীবন ধরে এই দুঃখিত কথাটা বহুবার বলে বলে, কথাটার অভিঘাতটাই আসল প্রতিক্রিয়াময় অর্থবহতাই—আমার মন থেকে মুছে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে।' সে বিয়ারের গ্লাসে দীর্ঘ একটা চুমুক মারে। পুরোটা গিলে নিয়ে সে আরামের শব্দ করে, শ্বাস ছাড়ে। 'এটা নতুন কিছু নয়। আমি যা কিছু করতে চাই, তাই বিষময় হয়ে ওঠে। আমার বৌ, সেও আমায়...আমি যা কিছু করতাম সবই টকে-গেঁজে যেত। ভালবাসতে গিয়েও ভুল করে বসতাম—গন্ডগোল ঘটিয়ে ফেলতাম। কোন উপহার কিনে দিলেও, কিভাবে—কি করে যেন, সব উল্টে পাল্টে গিয়ে, ওকে আঘাত করে—দুঃখ দিয়ে ফেলতাম। ওর পক্ষে, অসহ্য হয়ে উঠল সেসব। আমি, আমি সর্বদা নিজেকে হাস্যকর

বানিয়ে তুলি। অপদার্থ, একটা জোকার। অথচ আমি তো কিছুই করিনা। দরকারই পড়েনা। লোককে হাসতে একাট জোকারকে বেশি কিছু করতে হয় কি?'

ডাক্তার, সমর্থনের ভঙ্গীতে মাথা নাড়েন। যেন ম্যাকের পুরো সমস্যাটা তিনি সহজেই বুঝতে পারছেন। হয়ত পারেনও। তার মাথায় তখনো, একটু আগে ভরে ওঠা—জেগে ওঠা, সেই অলৌকিক সঙ্গীত-মূর্ছনার অনুরণন, গমগম করছে—সমগ্র মস্তিষ্ক জুড়ে, এক প্রবল বানভাসির উত্তাল, বন্যা, স্রোতধারার মত। 'আমি বুঝতে পারছি' অবশেষে তিনি বলেন। 'বিশ্বাস করুন ডাক্তার, আপনি আমায় মারায় আমি খুশি হয়েছি। সত্যি, সত্যি খুশি হয়েছি। আমার হয়ত এই শিক্ষাটুকুর প্রয়োজন ছিল। আমি হয়ত এটা মনে রাখব। হয়তো নিজেকে সংশোধনের পথে নিয়ে যাব—নিয়ে যেতে পারব।' ডাক্তার আবার সমর্থনের ভঙ্গীতে, ম্যাকের জটিল মনোগত সমস্যাটাকে যথার্থ ভাবে অনুধাবন করতে পারার ভঙ্গীতে, ইঙ্গিতবাহী সূচকে মাথা নাড়তে লাগলেন। ম্যাক, দীর্ঘ আরেকটা চুমুকে বিয়ারের গ্লাস খালি করে ফেলে। ঠোঁটের ওপর থেকে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে বিয়ারের ফেনা মুছে নিতে নিতে সে বলে 'যাইহোক, ডাক্তার, আমি, দলের ছেলেরা, সবাই মিলে সব কিছু পরিষ্কার সাফাই করে দিচ্ছি। আর আপনার যা ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে, সব কিছুর আমরা দাম দিয়ে দেব।' ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। ম্যাকের পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, 'ভুলে যাও ম্যাক, যা ঘটে গেছে তাকে ভুলে যাও। তোমরা তো আমায় খুশি করতে—আনন্দ দিতে চেয়েছিলে? একটা পার্টি, এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে? ভাগ্যক্রমে, ব্যাপারটা দুর্ঘটনা হয়ে গেছে। সে তো সবার জীবনেই ঘটতে পারে। একটা দুর্ঘটনাকে নিয়ে মাথা ঘামিও না, মন খারাপ করোনা। যাও, বাড়ী যাও।' ম্যাক উঠে দাঁড়ায়। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকায়। ডাক্তার যে কত মহৎ মানুষ, মহানুভব, তা আরো একবার ও বুঝতে পারে। ডাক্তার হাসেন, ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে বলেন 'যাও। এসব ভুলে যাও।'

অধ্যায় ঃ ২২

শিল্পী হেনরি। আসলে ও কিন্তু ফরাসী নয়, জন্মগতভাবে। এমনকি, হেনরী ওর নামও নয়। শিল্পীও নয়, পেশাগত ভবে। এসব ছদ্মতায় নিজেকে মুড়তে ও বাধ্য হয়েছে। প্যারিস, শন নদীর উপত্যকা সমৃদ্ধ সব গল্পে, হেনরী এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল—বহু শোনা সেইসব বর্ণনা ওর মনে এতটাই শিকড় ছড়িয়ে প্রভাবিত হয়েছিল, সে জীবনে কখনো সেখানে যায়নি, নিজেকে সেখানকার বাসিন্দা বলে প্রচার করত। নিজেকে শন নদী পাড়ের অধিবাসী কোন ফরাসী হিসেবে উপস্থাপিত করতে—পরিচয় দিতে পারলে, সে গর্বিত হতো, চরম আনন্দ পেতো। ফরাসী দেশ—ফরাসী জাত, এবং তাদের ধর্মীয়—সামাজিক—ভৌগোলিক—অর্থনৈতিক এবং অবশ্যই শিল্পকলা বিষয়ে সাম্প্রতিকতম ভাবে ওয়াকিবহাল থাকতে সে নিয়মিত নানান সাময়িক পত্রের সাহায্য নিতো ফ্রান্স ও ফরাসী জাতি বিষয়ে যে কোন লেখা, খুটিয়ে পড়ত। এভাবেই নিজের ফরাসী দেশ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম তথ্য-জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করত সে। যা নাকি এক নেশার মত ছিল তো বটেই। সাথে নিজের অস্তিত্ব এবং আত্মপরিচয় বিপন্ন না হওয়ার রক্ষা কবচও ছিল বইকি।

এবং যেহেতু অন্যদের কাছে, নিজের ফরাসীত্ব প্রমানে সদা সচেষ্ট থাকত সে, অথবা হয়ত অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নেই, সতর্ক থাকতে হতো সে ব্যাপারটায়, আধুনিক সাম্প্রতিকতর ফরাসী শিল্পকলা বিষয়ক পরিবর্ত্তন, ভাঙ্গচুর, বৈপ্লবিকতা, এসবকে নিজের শিল্পচর্চায় তুলে আনত। ফরাসী দেশে ঘটে চলা ঘটনার ঢেউয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সে নিজের শিল্পচর্চার ঢঙ-ধরণ-মাধ্যমকে বদলাতো, ভাঙ্গত অথবা গড়তও। যেমন কয়েক বছর আগে সে তার ছবিতে, দৃশ্যসমন্ধীয়তা-কে বর্জন করল। সে সময়কার ছবিতে ঘটনার কোন জায়গা থাকত না। আবার, এক বছরে, তার ছবি হলো হতে থাকল, সম্পূর্ণ লাল রঙ বর্জিত। এইসব ভাঙচুর—মাধ্যমজনিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যস্ত হেনরী, আসলে কেমন চিত্রকর, তার ছবি কি আদৌও উন্নততর শিল্পকলা? নাকি নিছক জঞ্জাল, এটাই কেউ বুঝে উঠতে পারেনি এ যাবত। গোলা লালের ওপর। ইচ্ছেমত সবুজ ছোপ ও বেগুনীর হালকা ছররা, এটার মানে যদি সেটাকে ছবি বলা যায়, তার নাম যদি হয়—মননের উৎসস্থল' তাহলে আমার-আপনার মত নিছক গেরস্থ, অশিল্প রসিক-অসমঝদার, কি করে সে ছবির সঠিক মূল্যায়ন করে? হেনরী, শিল্পী হিসেবে কতটা দক্ষ, তাই বা বোঝা যায়—বুঝে ওঠে কি করে? তার শিল্পচর্চার মাধ্যমও ঘনঘন বদলাতো। কখনো তেলরঙ জলরঙ

মোমরঙ, অর্থাৎ নিছক রঙ মাধ্যম ছেড়ে, ছবির উপাদান হিসেবে সে বেছে নিতো মুরগীর পালক, বাদামের খোসা, এসব বিচিত্র বস্তু। সুতরাং তার শিল্পক্ষমত, দক্ষতা নিয়ে সাধারণের মনে, একটা সংশয় প্রশ্ন ছিলই থাকতই।

তবে তার নৌকো বানানোর ক্ষমতা-দক্ষতা নিয়ে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেনি। এ ব্যাপারে সে সংশয়াতীত ভাবেই দক্ষ ছিল। সবাই একবাক্যে তা মেনেও নিতো। তবে একটা ব্যাপারই সবাইকে তাড়িত করত। কোনবারই, নৌকো বানানো শুরু করে সেটাকে শেষ করত না সে। ঠিক শেষ মুহূর্তে, প্রায় তৈরি হয়ে ওঠা নৌকোটাকে ভেঙ্গে ফেলত—আবার নতুন করে সারিয়ে নির্মাণরত প্রথমে ভাড়াবাড়ীটা, এখন প্যালেস ফ্লগ হাউসের, উঠোনে যে জন্যে গোটা বছর-সব মরশুমেই একটা তৈরিরত নৌকো দেখা যেত। সে নির্মাণ কখনো ফুরত, শেষ হতনা, বদলে যেত বি-নির্মানে। সবার কাছেই, হেনরীর এই নৌকো, কখনো শেষ না হওয়া, একটা রহস্য—জট পাকানো বাঁধা হয়ে উঠেছিল। সবাই যে রহস্যর শেষ প্রান্তে পৌছনোর জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছিল—যাদের মনন খানিকটা উঁচু স্তরের, তারা ভাবতে শুরু করল,—এই নৌকো বানানোটা, আসলে হেনরীর কাছে একটা প্রতীক, বহমান জীবনের। হয়ত ও ভাবে, নৌকো বানানো শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থ, জীবনের গতি পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া, জীবনের থেমে যাওয়া। তাই শেষ মুহূর্তে, প্রায় তৈরি নৌকোটাকে ভেঙ্গে দিয়ে পুনঃনির্মানে রত হয়ে, জীবনের গতিপথ বহতা ধারাকে, ভিন্নতর খাতে ঘুরিয়ে বইয়ে দেবার প্রতীকী তা বোঝাতে চায়, এবং যা হয়ত সবচেয়ে বেশি নিজেকেই বোঝায়।

গত দশবছরে, এই শহরে বাসকালীন, হেনরী দু-দুবার বিয়ে করেছিল। দুর্ভাগ্যবশঃত দুটোর কোনটাই, বেশিদিন টেকেনি। এছাড়া, খানকয়েক 'সম্পর্ক'ও—বিবাহ পর্যন্ত না পর্যন্ত, গড়ে উঠেছিল। স্বভাব পাগল হেনরী, নারীর প্রতি বিশ্বস্ততার প্রতীক হয়ে উঠতে পারেনি কোন বার—কোন ক্ষেত্রেই। তার ভালবাসাগুলো, এদের পর এক, তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কথা দিয়ে কেউ কথা রাখেনি। এবং, প্রতিবারই, স্ত্রী অথবা প্রেমিকরা তাকে ছেড়ে চলে যাবার পর, কয়েক দিন সে প্রথাগত—আবশ্যিক শোকপালন করত। কাঁদত, বিষণ্ণ হয়ে থাকত, অবিরাম মদ খেয়ে চলত—মাতাল হয়ে ওঠার জন্যেই, এবং হতোও। যদিও, এ কথাও সত্যি প্রতিটি প্রেমিকা এবং দুই স্ত্রী, তাকে ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বস্তির উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলত। মুক্তির স্বাদ পাওয়া পাখীর মত ছটফট করে উঠত, প্রাথমিক শোকার্ততা কেটে গেলেই। নারী, আনুষঙ্গিক শারীরবৃত্তীয়তার অন্তহীনতা থেকে মুক্তি পেয়ে সে হাঁফ ছাড়ত, ছেড়ে বাঁচত। আহ, এখন সে ইচ্ছেমত হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচতে পারবে। যা

ইচ্ছে খেতে পারবে। যত ইচ্ছে মদ খেতে পারবে, অবিশ্রাম-বাধাহীন পান করে বেহেড হয়ে উঠলেও, কেউ বলার-আপত্তি করার নেই। গলা ছেড়ে গান করা হেঁড়ে গলায়, বিশ্রিতর উচ্চারণে রিমবা উচ্চস্বরে পঠ করা, এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ অথচ জীবনের পক্ষে গূঢ়তর ইচ্ছের পাগলামীকে বাধা দেবার কেউ থাকছে না। ভেবে, একপক্ষে সে আনন্দই পেতো।

অ্যালিস তাকে ছেড়ে চলে যাবার পর কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হলো। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ঘটল। একরাতে, এক কোয়ার্টার হুইস্কি নিয়ে সবে সে বিছানায় এসে গড়িয়েছে। এমন সময় তার চোখে পড়ল, উল্টোদিকে এক কালো পোষাক পরা—শয়তান ধরনের অল্পবয়সী পুরুষ বসে আছে। আসলে, তখন, অ্যালিস তাকে ছেড়ে যাবার পরের প্রথাগত শোক পালনপর্ব চলছিল। এবং অদ্ভুত ব্যাপারগুলো তখনি ঘটতে শুরু করে। সে রাতেও, একলা—নির্জন ঘরে বসে হঠাৎই তার অনুভবে ধরা পড়তে থাকে সে ঘরে একা নেই—একা নয়। তারপরই তার নজর পড়ে শয়তান চেহারার পুরুষটিকে। ঝকঝকে চোখে এক নির্মম হাসি মাখিয়ে তাকিয়ে ভদ্রতা-বিনয়-শান্তবোধ তেলতেল হয়ে লেপ্টে ছিল-চুঁইয়ে পড়ছিল। লোকটার পাশেই একটা গোলগাল ফর্সা বালক, যাকে প্রায় শিশুই বলা যায়। দুজনেই, একবার হেনরীর দিকে তাকাচ্ছিল, তারপরই অন্যজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠছিল, বেশ সরব-উচ্চস্বরে। যেন একটু পরেই, কি এক মজার ঘটনা ঘটতে চলেছে। তারপর, কালো কোটের উপর পকেট থেকে শয়তান মার্কা লোকটা, একটা চকচকে ক্ষুর বের করল। যার ধার চকচকে ফলায় ক্রুরতামেশা হিংস্রভাব। লোকটা, ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হাসল। ছেলেটা, যাকে আসলে গলায় চকচকে ক্ষুরটা গভীর করে বসিয়ে, টেনে দিল। শিশুটা, কি এক মজার খেলা যেন, কৃতজ্ঞ ভঙ্গীতে হাসতেই থাকল। হেনরী, অন্ধ আতঙ্কে বীভৎস-চেরা গলায় চিৎকার করে উঠল, করেই চলল। তার, দীর্ঘ—দীর্ঘ সময় লাগল এটা বুঝে উঠতে, পুরোটাই নিছক কল্পনা, ওখানে কেউই নেই। কিন্তু, সত্যিই কি তাই? নিছকই কল্পনা?

হেনরী, একলাফে তার কেবিনের বাইরে বের হয়ে এলো। এক আতঙ্ক মেশা বিস্ময়, অলৌকিকতার স্পর্শ-শিহরণে তার শরীর কাঁপছিল। ক্যানেরী রোও-এর পথে পথে উদভ্রান্তের মত ছুটে বেড়াতে বেড়াতে সে ডাক্তারের বাড়ীতে আলো জ্বলতে দেখল এবং ঢুকে পড়ল। ডাক্তার, সব শুনে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। আসলে, ঘন চোখে তিনি পরীক্ষা করছিলেন, ওর মুখে সাপটে থাকা তীব্র আতঙ্কের, কতটা সত্যি-নিখাদ আতঙ্ক আর কতটা নাটক, নিতান্তই অভিনয়। ওটা, সত্যিকারের-তীব্রতর আতঙ্কই ছিল। 'ভূত, আমি যা দেখলাম কোন প্রেতের ছায়া, তাই নয় কি?' হেনরী ডাক্তারের

মতামত চায় তারপরই প্রায় দাবীর সুরে সে বলে 'এটা, কোন ঘটমানতার প্রতিফলন অথবা প্রতিচ্ছবি হয়ত, তাই না? অথবা, হয়ত আমার মনের সুপ্ত কোন ফ্রয়েডীয় আতঙ্কের, নিষ্ঠুর-শিহরিত করা-হিম আতঙ্কজনক বহিঃপ্রকাশ। সে যাইহোক, এটা ঘটেছে। আমার দুচোখের সামনে নিশ্চিত ভবেই, এসব ঘটতে দেখেছি আমি। যেভাবে, এই মুহূর্তে আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, এতটাই স্পষ্ট-বাস্তবময় ভাবে।' ডাক্তার সত্যিই কিছু বুঝতে পারছিলেন না। হেনরীকে সে কথা বলতে, সে বিহ্বল গলায় বলল 'তাহলে আমি এখন কি করব?' ডাক্তার মাথা নাড়লেন 'জানিনা। তবে আমায় দিয়ে তোমার সমস্যার কোন সমাধান হবে না। কারণ যদি সত্যি এটা ভুত প্রেতের ব্যাপার হয়, আমি ওঝা বা ডাকিনীবিদ নই। আর ওটা যদি মিথ্যে, এক কল্পনা হয়, তবে সেক্ষেত্রে তোমার প্রয়োজন এক মনস্তত্ত্ববিদের, যা আমি নই।'

হেনরী, কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন সময় বাইরে থেকে মহিলা কণ্ঠের ডাক শোনা যায় 'ডাক্তার?' তিনি উঁকি মারেন, তারপর বলেন 'ভেতরে এসো।' একটি প্রায় যুবতী মেয়ে ঘরে ঢোকে। স্থানীয় যুবতী। ডাক্তার হেনরী আর মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন ও একটা অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছে। সব শুনে মেয়েটার চোখ চকচক করে ওঠে। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে 'আহ, কি রোমাঞ্চকর ব্যাপার। যদি সত্যিই এটা ঘটে থাকে তবে মানতেই হবে চরম উত্তেজক ঘটনা। আমি কখনো ভূত দেখিনি, অথচ দেখার ভীষণই ইচ্ছে। চলো না, তোমার ঘরে আজকে আমি থাকি তোমার সঙ্গে। যদি সত্যিই ভূতের দেখা পাই, রোমাঞ্চকর-উত্তেজনাকর একটা অভিজ্ঞতা হবে সেটা।'

ডাক্তার ওদের চলে যেতে দেখেছিলেন। ওর মনে একটা তেতো ভাব ভেসে উঠেছিল। ঐ মেয়েটা তার 'ডেড' ছিল, তার সঙ্গে সময় কাটাবার—থাকবার জন্যেই মেয়েটা এসেছিল। নাহ, সেই মেয়েটা কখনো ভূত দেখতে পায়নি। তবু এরপর থেকে প্রতিরাতে সে হেনরীর ঘরে যেত। কয়েকদিন পর হেনরীর সঙ্গেই থাকতে শুরু করে সে।

যতদিন না, হেনরী তার কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠছে। তারপর একদিন। অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য ব্যাপারটা ঘটল।

অধ্যায় ঃ ২৩

একটা নিকষ বিষণ্ণতা-দুঃখবোধ যেন ছেয়ে রয়েছে প্যালেস ফ্লপ হাউসের গোটাটা জুড়ে। একটু আগে ফাটা ঠোঁট, ভাঙ্গা দাঁত নিয়ে ম্যাক ফিরে এসেছে। সোজা নিজের বিছানায় গিয়ে মাথা পর্যন্ত কম্বল টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। সারাদিনে একবারের জন্যেও উঠল না। ওর মন হৃদয়, ফাটা ঠোঁটের থেকেও বেশি আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। যন্ত্রণাবোধ—রক্তপাতও সেখান থেকেই হচ্ছে বেশি। সারা জীবন ধরেই, সে এরকম গন্ডগোলের কাজ করে চলেছে। বস্তুতপক্ষে, সে যে কাজটা করতে গেছে সারাজীবন ধরে সেটাই জট পাকিয়েছে, ঝামেলায় পড়েছে। হিউজি আর জোনস যদিও কাছাকাছি—অল্পদূরত্বে বসেছিল, কিন্তু ওদের চোখ ছিল অনন্ত শূন্যতার দিকে। অন্যজনের চোখে চোখ রাখার মানসিক ইচ্ছে ভারসাম্যটাই ছিলনা। এরপর দুজনেই, এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্যজনকভাবে দুজনে একই সঙ্গে হেডিনডো ক্যানেরীতে চাকরীর জন্যে আবেদন করতে গেল। আশ্চর্যস্য আশ্চর্য, বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়—দুজনেই চাকরীটা পেল।

হেজেল এতটাই অ-সুখ, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হয়েছিল, যে সে মনটেরীর এক পানশালায় গিয়ে ঢুকল। ইচ্ছাকৃত পায়ে পা দিয়ে এক সৈনিকের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে মারামারি বাধাল। এবং এমন লোকের কাছে ধোলাই খেল যাকে সে বিশেষ চেষ্টা না করেই তুলো ধোনার মতই মেরে চৌপাট করে দিতে পারে অনায়াসেই—এই বোধ, তাকে বেশ আরাম, স্বস্তি ছিল। হতাশা বিষণ্ণতা রোগটা অনেকটা কাটিয়ে উঠল। ওদের মধ্যে, একমাত্র, 'প্রিয়তমা'ই সব থেকে নিশ্চিন্ত-সুখী ছিল। সারাটা দিন ম্যাকের বিছানার নিচে কাটাল সে। ম্যাকের কালো জুতোটাকে চিবিয়ে খেতে ব্যস্ত ছিল, দু-দুবার তার অন্ধ নৈরাশ্য বশ্যতার মধ্যে থেকেও, বিছানার নিচে হাত ঢুকিয়ে প্রিয়তমাকে টেনে বের করে এবং তার সঙ্গে শোবার জন্যে, বিছানার পাশে নেয়। কিন্তু, দু-বারই, কিছুক্ষণ পরই চতুর কুকুরীটি, গুঁড়ি মেরে বিছানা থেকে নেমে আসে এবং তার ছেড়ে যাওয়া পুর্বকর্ম সমাধা করতে লেগে যায়।

এডি 'লা ইভা'য় রওনা হয়। সেখানে হাজির হয়ে সে তার মদ পরিবেশক বন্ধুর সাথে গল্পগুজব করতে করতে কয়েক পাওর হুইস্কি খায়। তারপর 'সঙ্গীত বাক্সে' পয়সা ফেলে, বেশ কয়েকবার পরপর মেলাঞ্চলি বেবি শোনে। সঙ্গীতের বিষাদময়তার ছোঁয়া দিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার' চেষ্টা করে? যদিও পাঁচবার গানটা শোনবার পরও তার মানসিক ভাবসাম্যর স্থিতিহীনতার

তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনা।

ম্যাক এবং তার ছেলেরা, একটা মেঘাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্যে ছিল। এবং এটা যে ওদের প্রাপ্য, তা ওরা সবাই বুঝেছিল—বুঝতে পারছিল। সামাজিক ভাবেও নিজেদের ব্রাত্য প্রান্তিক, ভুলে যাচ্ছিল। শুধু, বিশাল এক দানবের হাঁ মুখের মত প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছিল ভুলগুলো দোষটুকুই। পার্টিটা যে আসলে ডাক্তারের জন্যেই দেওয়া হয়েছিল সবকিছু, সম্পূর্ণ আয়োজন ডাক্তারের জন্যেই ছিল, যা ঘটেছে তা এক নিছক...নাহ, অন্যেরা দূর, পুরো ব্যাপারটা ওদের কানেই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। ঘটনাটা রটে যেতে, সারা ক্যানেরী রো-তে ছড়িয়ে পড়তে (অবশ্যই নানা গুজবের রঙ মাখা ডালপালা সহ) দেরী হলনা। গপ্পো (হ্যাঁ, ঘটনা যখন অপ্রতুল, গুজবই মহার্ঘ্য-সংখ্যাগরিষ্ঠ, বাস্তব সেখানে প্রায় শূন্য—সেটাকে ঘটনা নয় 'গপ্পো' বলাই বাঞ্ছনীয়, নয় কি?) ছড়িয়ে পড়ল—বিয়ার ফ্ল্যাগ থেকে ক্যানেরীগুলোয়, লা ইডার' মাতালদের স্খলিত কণ্ঠের আলাপচারীতায়। মনটেরীর পথচারীদের কাটা সংলাপের টুকরো বক্তব্যে। শোনা যেতে লাগল, গপ্পো তার নিজস্ব অকল্পনীয়তার পথ ধরেই এগোতে লাগল—ম্যাক ও তার দলবল, সমস্ত টাকা পয়সা—এমনকি মদের বোতলগুলোও, লুঠ করেছে ডাক্তারের গাড়ী থেকে। বিদ্বেষজনিত কারণে, দরজা ভেঙ্গে বাড়ীতে ঢুকে, পরিকল্পিতভাবে সমস্ত বাড়ী লুঠ করেছে, লাবরেটরীকে ভেঙ্গে তছনছ করেছে।

ম্যাক ও তার দলবল ছাড়া, একমাত্র লি-চঙ পুরো ঘটনাটায় ভীষণরকম দুঃখিত—হতাশ—বিষণ্ণ ছিল। স্বাভাবিক। কারণ ব্যাঙগুলো সব পালিয়ে গেছে। লি-এর আর্থিক ক্ষতি হলো দুতরফাভাবে। এই ঘটনা নিয়ে তাই সে মুখ খুলছিল না। কোন মন্তব্য করতেই রাজী ছিলনা। সামাজিক ভাবেও, ওরা একঘরে হয়ে গেল—বয়কট করা হলো ওদের। যেমন, ম্যাক ও তার দলের কয়েকজন স্যাম ম্যালোয়ীর সামনে পড়ে গেলো, মুখোমুখি। অথচ, সে, অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। বস্তুত, সবার থেকেই ওরা এরকম ঠান্ডা-শীতলতর ব্যবহার পেতে থাকল। ক্রমে ওরা নিজেরাও, নিজেদের, এক ঘেরাটোপের নির্জণতায় বদ্ধ করে ফেলল। এই মেঘ অন্ধকার ছিঁড়ে, স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার রাস্তা ওরা কেউ খুঁজে পাচ্ছিল না দেখতে পাচ্ছিল না। এবং ক্রমেই, ওদের কাছে ঘোরতর পরিষ্কার হয়ে উঠছিল দুটো বিকল্প। অবশ্যম্ভাবী দুটো প্রতিক্রিয়া। কোনটা গ্রহণ করবে তারা? বলা ভাল, শেষতম—অন্তিমতর, সহ্যর অতীত মুহূর্তটিতে কোন প্রতিক্রিয়ায় বিস্ফোরিত হবে তারা?

ম্যাক এবং তার দলবল, তাদের তাড়িত উদভ্রান্ত দিশাহারা প্রায় উন্মত্ত, অদ্ভুত ভাব সাম্যটা আপ্রাণ বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছিল। শেষ মুহূর্তে,

কোন দিকের পাল্লাটা যে ভারী হয়ে উঠবে—বুঝলে পড়বে, সে সম্পর্কে ওদের নিজেদেরই কোন আন্দাজ ছিলনা—পাচ্ছিল না। লোকেদের, পরিবেশের ও সেই সংলগ্ন মানুষদের উপেক্ষা—অসহনীয়তা লক্ষ্য করে-বুঝেও, চেনাজানাদের মুখোমুখি হলেই তারা ভদ্র-মিষ্টি ব্যবহার করছিল। এবং অপরিচিতদের, যথাযথ মর্যাদা ও মার্জিততা, ব্যবহারে প্রকাশ করছিল। প্রাথমিক ঝড়ো-দূর্যোগ-গুমোট ভাবটা কেটে যাবার পর, পরিবেশের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক জটিলতরতার সঙ্গে , ক্রমে নিজেদের মানিয়ে নিতে শুরু করে ওরা। কাজকম্ম ছিলনা, বাইরে আড্ডার সুযোগ ছিলনা—তাই নিজেদের বাসস্থানটি—পালেস ফ্লপ হাউসটিকেই তন্নতন্ন করে সোফ সুতরো-পরিষ্কার করতে শুরু করে। কাঠের দেওয়াল—মেঝে—আসবাবপত্র—কম্বল, তোষক, ওদের অতি উৎসাহী সাফাই পর্ব থেকে রেহাই পায়না কোন কিছুই। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ওরা এক শূন্যতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে ছিল। একমাত্র হিউজি আর জোন সেরই দৈনিক নির্দিষ্ট একটা রোজগার ছিল। সেই টাকা থেকেই দৈনিক খরচাপাতি চলছল। আনুষঙ্গিক মুদী দোকানের মালপত্র, এখন ওদের নিয়ে আসতে হতো পাহাড়ের পেছনের—দূরবর্তী থিরফট বাজার থেকে। কারণ, লি-চঙের বরফ হিম চোখের গহনতমতায় যে বরফ আগুন জ্বলত-ধ্বক করে জ্বলে উঠত ওদের দেখলেই, তার সামনে দাঁড়াবার সাহস-মনের জোর, ওদের কারোই ছিলনা।

এর মধ্যে একদিন, আচম্বিত, ডাক্তার এক অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা করলেন। প্রখর সুর্যালোকময় দিনটিতে, ডাক্তার তার ল্যাবরেটরীতে বসে রিচার্ড ফ্রস্টের সঙ্গে বিয়ার পান করছিলেন এবং সদ্য সারিয়ে আনা ফনোগ্রামটিতে, 'স্কালারাত্তি'র নতুনতম অ্যালবামটির সুরলহরী, সঙ্গীত মূর্ছনা উপভোগ করছিলেন। সেই সময় কাঁচের জানালা দিয়ে তার নজর গেল দূরে, প্যালেস ফ্লপ হাউসের বাইরের চত্বরে—একটা চওড়া গাছের গুঁড়ির ওপর বসে ম্যাক ও তার দলবল দূর পাহাড় শীর্ষের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছিল। 'ওরাই-হচ্ছে, আসল, যথাযথ দার্শনিক, বুঝলেন?' একটু থেমে, শ্রী ফ্রস্ট তার বক্তব্য বুঝতে কতটা আগ্রহী সেটা যাচাই করার চেষ্টা করে, অথচ ব্যাপারটাকে আমল না দিয়েই ডাক্তার আবার বলতে শুরু করলেন 'ম্যাক এবং তার সঙ্গীরা, সম্ভবত সব ব্যাপারেই যথাযথ ওয়াকিবহাল, অভিজ্ঞ—যা ঘটেছে পৃথিবীর পরিমন্ডলে, এবং যা ঘটবে, ঘটতে চলেছে। আমার মনে হয়, এই পৃথিবীতে, আমাদের—অন্যদের সবার চেয়ে যোগ্যতর ভাবে, ওরাই বেঁচে থাকবার তীব্র লড়াইতে জিতবে-বেঁচেবর্তে থাকবে। এমন একটা সময়, এটা, যখন মানুষ উচ্চাকাঙ্খা—অসহনীয় স্নায়বিক উত্তেজনা—অর্থগৃধ্নু তার অভিলাষে, নিজেকে আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত-টুকরো টুকরো করে ফেলছে, সেই চরম তীব্র অস্থির আত্মবে কতার

পারিপার্শ্বিকে-সমবেত, ওরা বিস্ময়জনক প্রফুল্ল-সুখী-মানসিক ভাবে শিথিল। আমরা, পাকস্থলীময়, বদ আত্মা-মানসিকতাময়। অথচ, ম্যাক ও তার সঙ্গীরা অতীব স্বাস্থ্যবান—যথাযথ পরিচ্ছন্ন, মনে ও শরীরে। ওরা, যা খুশি-ইচ্ছে তাই করতে পারে। ওরা, যা কিছু পরিপাক করতে পারে, এই পৃথিবীর, ওদের হজমশক্তিকে ব্যহত—আঘাত না করে, আহত-দুর্বল না করেই।'

পুরো বক্তৃতাটা ডাক্তারের গলাকে এতটাই নিংড়ে নেওয়া শুকনো করে তুলেছিল, যে তিনি এক নিঃশ্বাসে বিয়ারের গ্লাসটাকে খালি করে দিলেন চুমুকে। তারপর, তিনি রবার্ট ফ্রস্টের মনে হয়, ওরা অন্য সবার মতই, আলাদা কিছু না। ওদের টাকা পয়সা নেই।' ডাক্তার গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়লেন। 'ওরাও, একদিন—কখনো অনেক পয়সার মালিক হতে পারে।' একটা শ্বাস ফেলে, বিষণ্ণতার ছোঁয়ায় যোগ করলেন 'নিজেদের নৈতিকতা, মনুষ্যত্বকে বলি—সেই হিরন্ময়সুলভ নীরবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে ডাক্তার অবশেষে বললেন, 'ওরা সহজেই তা পারে। ম্যাকের মধ্যে অসাধারণত্বর ছোঁয়া—ক্ষমতা আছে। ওকে-ওদের শুধু ভাবনা চিন্তাগুলোকে কাজে পরিণত করার পথটাকে চিনতে-ধরতে শিখতে হবে।'

অধ্যায় ঃ ২৪

মেরি ট্যালবট, শ্রীমতি টম ট্যালবট, অসাধারণ সুন্দরী এক মহিলা। তার তামাটে লাল চুল—সোনারঙ ত্বক—সবুজভেবে মাখানো চোখের তারা—ছিপছিপে দোহারা গড়ন, সব মিলিয়েই তিনি এক উজ্জ্বল সৌন্দর্যের প্রতীক ছিলেন। যদিও তার সৌন্দর্যের মধ্যে অনেকে, কিছুটা বন্যতা অথবা হিংস্রতা নাকি খুঁজে পেত। লোকমুখে প্রচলিত, অথবা যা নাকি হয়ত নিছক গুজবই, শোনা যায়—মেরির বৃদ্ধা প্রপিতামহী নাকি একজন ডাইনী ছিলেন। তো, সেই মেরি ট্যালবট, যার কাছে—পৃথিবীর অন্য সব কিছু একদিকে, আর একদিকে পার্টি। পার্টির মত আমোদের-উপভোগ্যতাময় বস্তু তার কাছে আর কিছুই নেই। পার্টিতে যেতে মেরি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। যদিও, যেহেতু টম রোজগেরে হিসেবে খুব বেশি সমর্থ নয়, তাই মেরি নিজে খুব একটা পার্টি দিতে পারত না। কিন্তু চেনা পরিচিত বন্ধু আত্মীয়দের, পার্টি দেবার জন্যে সে উসকাতো, এবং সেই পার্টিতে তাকে আমন্ত্রণা জানাতে বাধ্য করতো, কখনো কখনো অযাচিত ভাবেই। কখনো অবাঞ্ছিত হয়েও।

বছরে মেরির ছ'টি জন্মদিন। সুতরাং সবগুলোতে, পার্টিতো হতোই। এছাড়াও, সাধারণ প্রথাগত পার্টিগুলো তো হতোই, যেমন—কস্টিউম পার্টি,

সারপ্রাইজ পার্টি, হলিডে পার্টি, ক্রীসমাস পার্টি। সেইসব পার্টিগুলো, আনন্দ-উত্তেজনায় মেরিকে রঙীন করে তুলত, সেই উত্তেজনার স্রোতে ভেসে চলার সময় অবশ্য সে তার স্বামীর হাত ধরতে—তাকে সঙ্গে নিতে ভুলত না। অনেক সময়, প্রায়শই, টম যখন কাজেকর্মে থাকে, বেড়ালদের জন্যে। এবং এসবের সঙ্গে, একটা বাস্তব সত্যকে মেরি কিছুতেই অবহেলা করতে পারত না—সচেতন থাকতে বাধ্যই হতো। তারা যথেষ্ট অর্থবান নয়। বরং নিম্নতার দিকেই ভালো পোষাকও মেরির বিশেষ ছিলনা। তবু, মেরি আশায় বুক বাঁধত। তাকিয়ে থাকত। একদিন নিশ্চয়ই তাদের সুসময় আসবে। সেই সুদিনের দিকে তাকিয়ে—অপেক্ষায় থেকে, সাংসারিক-দৈনন্দিনতার অন্ধকারগুলোকে সরিয়ে ঠেলে রাখত দূরে-মন খারাপ ভাল করে দেওয়া শব্দ এবং ভার-এর অভাবটা, যথেষ্ট দুঃখবহ ইঙ্গিতবাহী হতই। বাকি জমে যাওয়া, বিলগুলো বিশাল ধারের অঙ্কসহ যখন একে একে—পরপর এসে হাজির হতে থাকত।

সঙ্গে, এটাও অনস্বীকার্য, পার্টির প্রতি মেরি ট্যালবট এক দুর্নিবার—অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বোধ করত।

একদিন, পরপর, 'কললিয়ারস' এবং 'নিউইয়র্কার' পত্রিকা থেকে টমের কার্টুনগুলো পাণ্ডুলিপিসহ ফেরত এসেছে। টমের সেজন্যে-সেদিন মেজাজ খুবই বিগড়েছিল। শোবার ঘরে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল। মেরি ঘরে ঢুকল। তার হাতে, ছোট্ট একটা ফুলের গুচ্ছ। 'আজকের দিনটা, কোন দিন, তোমার খেয়াল-মনে আছে?' স্বামীর পাশে শুয়ে আগ্রহী গলায় প্রশ্ন করে। তারপর ফুলের স্তবকটাকে এগিয়ে দেয় 'গন্ধ নাও, বুক ভরে সুগন্ধ নাও।' টম ঘুরে তাকায়। 'কেন তুমি ভাল থাকার ভান, এইসব ছেলেমানুষী করো। কেন তুমি প্রকৃত অবস্থা মেনে নাওনা? আমরা ডুবে যাচ্ছি, ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছি। নিজের সঙ্গে কেন ছলনা করছি আমরা?' 'না, আমরা-আমি তা করছি না।' ওর দৃঢ় স্বরে টম চমকায়। মেরি, স্বামীর চোখে চোখ রাখে 'আমরা যাদু মানুষ। কিচ্ছু হবেনা আমাদের। কত খারাপ সময় কেটে গেছে, হঠাৎ অলৌকিক ভাবে। মনে আছে? সেবার বইয়ের মধ্যে ১০০ ডলার খুঁজে পাওয়া আচমকা? অথবা সেই যে সেবার? হঠাৎ করেই তোমার খুড়তুতো ভাইয়ের মানি অর্ডার এসে হাজির? তুমি ভুলেই গিয়েছিলে, কবেকার সেই ধার নেওয়া ৩০০ ডলার, ফেরত পাঠিয়েছিল। না টম, আমাদের কিচ্ছু হবেনা, কিছু হতে পারে না।' টম মাথা নাড়ে, 'হয়ত তুমি ঠিকই বলছ, হয়ত তাই।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলে 'আমি এই অসহ্য সময়টাকে আর নিতে পারছি না। সবকিছুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে-করতে ক্লান্তি বোধ করছি আমি।' মেরি বলে, 'আজ একটা পার্টি দিলে কেমন হয়?' টম চমকে ওঠে—হতবাক ভঙ্গীতে স্ত্রীয়ের

দিকে তাকিয়ে বলে। 'কি বলছ তুমি? এই শূকর মাংসের ছবিটাকে তো আর তুমি অতিথিদের প্লেটে তুলে দিতে পারো না তুমি?' মেরির সপ্রশ্ন-কিছুটা দুর্জ্ঞেয় কোন রহস্যের উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত, চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত ভঙ্গীতে টম বলে, 'এসব ছেলেমানুষীতে আমি তিতি বিরক্ত হয়ে উঠেছি। তোমার এসব কান্ড আর মজা থাকছে না, আমায় গভীর দুঃখ দেয়।'

মেরি তবু জোর করে 'খুব ছোট্ট করে, বেশি অতিথি আসবে না—ডাকব না নাহয়' টম বিরক্ত—ক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে বলে 'কোন মতেই, কোন ভাবেই সম্ভব নয়। ওসব ভাবনা ছাড়ো। আর আমায় একটু একলা কেন থাকতে দিচ্ছনা? যাও, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যেও।' মেরি নিবিষ্ট ভাবে টমকে লক্ষ্য করে। সে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এব্যাপারে তার মত বদল ঘটবে না, বুঝতে পেরে, সে উঠে পড়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়। টম দু হাতের ভাঁজে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে অন্য পাশ ফিরে।

পার্টিটা সে দেবেই। ঘরটাকে রঙীন কাগজ—ক্রীসমাস বেলুন—চকচকে তারা দিয়ে যত্ন করে সাজালো সে। যদিও, সাজ সজ্জার সবগুলোই পুরনো। তবুও বেশ সাজালো ঘরটা। এবার কেটলিতে দুধ গরম করে এনে টেবিলে রাখল সে। ছোট্ট ফুলের স্তবকটার গায়ে হেলান দিয়ে রাখল 'টম, আমার নায়ক' লেখাটাকে। টেবিলের চার চেয়ারের সামনে, টেবিলের ওপর দুধ ঢেলে যখন সে প্রতিবেশীদের বিড়ালগুলোকে নিমন্ত্রণ করতে বের হতে যাবে, দরজায় টম এসে দাঁড়াল। অবাক চোখে সব কিছু দেখতে লাগল। মেরি, এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙ্গে টম উঠে আসায় অপ্রস্তুত-বিব্রত ভঙ্গীতে হাসে। 'এই আর কি, একটু বিড়ালদের জন্যে পার্টি? বেশ অভিনব' চেয়ারে এসে বসে সে বলে, 'একটা কাপ আমি পাইনা? অবশ্য, এর সঙ্গে চা-পাতা আর চিনি মিশলে, ব্যাপারটা আরো জমত' মেরি হাসে 'আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি' টম স্থির চোখে স্ত্রীয়ের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। এই মুহূর্তে, মেরির জন্যে ওর মনে এক প্রবল মমত্ব বোধ জেগে ওঠে, ভালবাসাও।

মেরি ট্যালবট সেই বছরেই, একটা সন্তান জন্ম দেবার পার্টি দিয়েছিল।

অধ্যায় ঃ ২৫

পরিবর্তনটা এলো। এবং হঠাৎ করেই ক্যানেরী রো, সঠিকভাবে বলতে গেলে গোটা মনটেরীই—অনুভব করতে পারছিল সেই পরিবর্তনটাকে। আকস্মিক এক সুসময়ের হাওয়া। তবে না, কোন দৈবতা অথবা গ্রহের আশীর্বাদে এটা হয়েছে, একথা শহরের কেউই মনে করছিল না বা মেনে নিচ্ছিল না। না, ওসবে কেউই বিশ্বাস করেনা, অন্ধ কুসংস্কারে। অন্য সব শহর এবং শহরবাসীদের মত ক্যানেরী রোও, অন্ধ কুসংস্কার বিশ্বাসী নয়। কিন্তু তারা কেউই, মইয়ের তলা দিয়ে হাঁটেনা। বাড়ীর ভেতর ছাতাও খোলেনা। তবু, তারা যে কোন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তা বলা যাবেনা। উদাহরণ হিসেবে ডাক্তারের কথাই বলা যাক। সে, যেহেতু বিজ্ঞানের ছাত্র, কোনরকম কুসংস্কারকে আমল দেওয়া, গ্রাহ্য করা, নৈতিক ভাবেই তার কাছে অপরাধ। সত্যি বলতে কি, ডাক্তার ওসব মানতও না। অথচ, যেদিন সকালে, দরজার সামনে সাদা ফুলের গুচ্ছাকার মালাটাকে পড়ে থাকতে দেখল, মুষড়ে পড়ল। কারণ, সে জানল—বুঝতে পারল, অত্যন্ত খারাপ সময় আসতে চলেছে। যদিও, তাকে মোটেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলা যাবে না। শহরের অন্যেরাও, বেশিরভাগই কুসংস্কারকে আল দিতনা। যদিও সেটা সহজাত ছিল। সেটা নিয়েই তারা বাঁচত। তাদের জীবনের একটা অঙ্গ ছিল সেটা।

ম্যাকের মনেও কোন সন্দেহ ছিলনা যে প্যালেস ফ্লপ হাউসের ওপর অভিশাপের কালো ছায়া পড়েছে। সেই পার্টির ঘটনাটাকে নিজের মনে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পর ও নিশ্চিত হয়েছে, দুর্ভাগ্য অভিশাপ দুঃসময় গুঁড়ি মেরে ঘরের প্রতিটি কোণ থেকে সেই রাতে এগিয়ে এসেছিল, ঘিরে ধরেছিল তাদের। এবং, যখন এই দুঃসময়ের অভিশাপ তোমার প্রাত্যহিক—দৈনন্দিনতার অঙ্গ হয়ে ওঠে, তখন সেটাকে এড়ানোর—কাটিয়ে দেবার সব থেকে ভাল উপায় হচ্ছে—বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়া। শুয়ে থাকো, যতক্ষণ পর্যন্ত না খারাপ হাওয়া কেটে দুঃসময়ের মেঘ উড়ে যাচ্ছে। তুমি তো দুঃসময়ের সঙ্গে দরদাম করতে পারো না? যতটা সময় সে তোমার জীবনের থেকে কিনবে, ততটা কেড়ে নেবেই, নেবে। অথচ, ম্যাক কিন্তু অন্ধবিশ্বাসী অথবা কুসংস্কারগ্রস্থ নয়।

ক্রমে, সারা ক্যানেরী রো জুড়ে একটা খুশির হাওয়া ছড়িয়ে পড়ছিল। সুবাতাস, যার প্রতিটি মৃদু প্রবাহে সুসময়ের ইঙ্গিত। দীর্ঘদিন ধরে যা ঘটতে পারছিল না, অবশেষে অলৌকিকতার ছোঁয়ায় সেসব ঘটতে লাগল। সুবাতাস-সুবাতাস। ডাক্তার তার এক মহিলা রোগীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে সমর্থ

হলেন। অথচ, অন্য ব্যর্থতার ঘটনাগুলোর তুলনায় তিনি এবার অর্ধেক চেষ্টাও করেননি তৎপরতা দেখান নি। ম্যাক ও তার দলবলের পুষ্যিটি, প্রাণপন চেষ্টাতেও কিছুতেই শিক্ষিত সুশৃঙ্খল হচ্ছিল না। অবশেষে ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এটা শিক্ষিত হবার 'উপযোগী মাল' নয়, ধরে নিয়েছিল। অথচ, হঠাৎ করেই দেখা গলে, স্বশিক্ষিত হয়ে বেশ সভ্য ভদ্র শালীন সুশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে সে। এবং পুরোপুরিই স্বশিক্ষিত উপায়ে। উদাহরণ, শিক্ষিত হবার নমুনা হিসেবে বলা যায়—মেঝেতে, যেখানে সেখানে ভিজিয়ে নোংরা করে দেবার বদলে, নিয়মিত সময়মত সে বাইরে চলে যেত প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতে।

শুধু ক্যানেরী নয়, এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে লাগল দূর থেকে দূরে, আরো বহুদুরে। হারম্যান এর হ্যামবার্গার দোকান, সেখান পার হয়ে—সাল কার্লোস হোটেল। জিমি বুরেসিয়া পর্যন্ত অনুভব করল ব্যাপারটাকে—ল্যাঙ্গভেল্ট প্রদেশে। অথবা, ক্রীপটাউন ডুলের জন্নি বার্লো। ব্যাপারটা ছড়াতে—ছড়াতে সালিনাস জেল পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অভিনব অলৌকিকতা ঘটেই চলল। গে, বিলিয়র্ডেতে শেরিফের কাছে শুধু হারা নয়, পর্যুদস্ত হওয়াটাকেই, জীবনের অঙ্গ, স্বাভাবিকতা বলে মেনে নিয়েছিল। একরাতে, শেরিফাকে প্রায় দাঁড় করিয়ে হারানোর পর, সে ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে এতটাই সন্দিহান হয়ে পড়েছিল যে সাত গ্লাস বিয়ার পান করার পরও ঘোর কাটল না। এবং শেরিফ হবার পর সেই যে চেয়ারে বসলেন, পাক্কা সওয়া এক ঘন্টা তার মুখে কোন শব্দ ফোটেনি। এবং ঘটনাটা তাকে এতটাই বিমূঢ় হততাড়িত করেছিল, তারপর থেকে প্রতি সন্ধেতেই তিনি হেরেই চলেছেন।

প্যালেস ফ্লপ হাউস-এর ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। হঠাৎ করেই তারা, ম্যাক ও সঙ্গীরা আনন্দবার্তা শুনতে পেল। দুঃসময়ের মেঘ সরে গেছে অনুভব করে উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠল। চালিকাশক্তি, উদ্যমে ভরপুর। জোনস-এর, হঠাৎ লাফ মেরে চেয়ার থেকে নেমে পড়া এবং একপাক—'ট্যাপ ডান্স' করে নেবার মধ্যেই ছিল প্রথম ইঙ্গিত, খুশির খবর এসেছে। হেজেল, বিনা কারনেই, প্রবল উচ্ছাসে হো হো করে হেসে উঠল এবং হেসেই চলল। এবং সেই সুসময়ের গান এতই উদ্দাম—রক্ত ছলাৎ করা স্রোতবাহী ছিল যে সবার প্রত্যেকের মধ্যেই স্বতস্ফুর্তভাবে তা ছড়িয়ে পড়ল।

সেই স্বতস্ফূর্ততা বোধ থেকে, এবং হয়ত প্রায়শ্চিত্ত তাড়নাতেই, এই কদিন ধরে ওদের মনে গুমরে গুমরে যে বাসনা-তীব্র আকাঙ্খা, সেটা বিস্ফোরনের মত সামনে এসে ফেটে গেল। কথাটা প্রথমে এডিই পারল। আবার একটা পার্টি? প্রথমে কিছুক্ষণ কেটে গেল সংশয়জড়িত নীরবতায়। তারপর, অবশেষে নীরবতার দীর্ঘসূত্রতা ভাঙ্গল হেজেলই, 'এটা কি কোন সারপ্রাইজ পার্টি হবে?'

'আমি তা জানিনা' এডি মাথা নাড়ে। হেজেল আবার বলে, 'ডাক্তারের জন্মতারিখটা জানা থাকলে, অন্তত আমরা ওকে জন্মদিনের পার্টি দিতে পারতাম। ম্যাক এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার সে সোল্লাসে চেঁচিয়ে লাফ দিল 'হে ভগবান, হেজেল দারুন বলেছে। জন্মদিনের পার্টির থেকে ভাল কোন উপহার ডাক্তারের জন্যে হতে পারেনা। আমাদের শুধু যে করেই হোক খুঁজে বের করতে জানতে হবে তারিখটা। পাশ থেকে এডি বলে, 'আর নিশ্চিত হতে হবে, এবারে ব্যাপারটা একটা দারুণ কিছুই হবে, হতেই হবে।' হেনরী প্রশ্ন তোলে, 'কিন্তু ডাক্তারের জন্মদিন আমরা জানব কি করে?' হিউজি বলে 'কেন? ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।' ম্যাক মাথা নাড়ে হিউজির নির্বুদ্ধিতায়। 'হে ভগবান।' হেজেল বলে, 'ওকে কিছু জানতে-বুঝতে না দিয়ে কায়দা করে চালাকি মারফৎ বুদ্ধি করে ব্যাপারটা জেনে নিতে হবে।' ম্যাক বলে, 'ঠিক বলেছ, অমি সেই চেষ্টাই করতে যাচ্ছি।' হেজেল বলে 'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, যাচ্ছি।'

অধ্যায় ঃ ২৬

বাচ্ছা ছেলেদুটো খেলছিল। এমন সময় ধুমসো বিড়ালটা বেড়ার উপর উঠে এলো, বসল। বাচ্ছা দুটো, স্বাভাবিক ভাবেই, বেড়ালটাকে তাড়া করল। রাস্তা থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে ছুঁড়তে তার পেছনে তাড়া করল। লম্বা লম্বা ক্ষিপ্র দৌড়ে, বেড়ালটা উধাও হয়ে গেল অবিলম্বে। বাচ্ছা দুটো, হতাশ মনে ফিরে আসতে লাগল। লি চঙের দোকানের সামনে দিয়ে আসবার সময় তারা কাঁচের জানালাটা দিয়ে কি মনে করে যেন উঁকি মেরে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করতে লাগল। চীনে মানুষটি এবং দোকানটি সম্পর্কে শিশুদের অপার কৌতুহল। এক রহস্যের খাসমহল যেন, তাদের কাছে দোকানটি ও দোকানী স্বয়ং। 'বাচ্চা? কেমন বাচ্চা?' 'সে কি? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।' জোয়ে তার কথাকে বিশ্বাস্য করে তুলতে জোর গলায় বলে, 'কিন্তু এটা একেবারে সত্যি ঘটনা। স্পারাগো নিজের চোখে দেখেছে।' কথা শেষ করে বন্ধুর মুখটা লক্ষ করে, কতটা বিশ্বাস করছে সে তার কথা বোঝার চেষ্টা করে। তারপর আবার বলে, আঙুলের মুদ্রায় ফাঁক করে মাপ দেখায়, 'ঠিক এইটুকু সব, এরচেয়ে বড় নয়। ছোট্ট ছোট্ট -ক্ষুদে ক্ষুদে হাত-পা-চোখ।' উইললার্ড বিস্ময়াহত গলায় প্রশ্ন করে, 'আর চুল?' 'ইয়ে, মানে, চুলের ব্যাপারে স্পারাগো কিছু বলেনি বলতে পারেনি।' 'আমার মনে হয়, তোর ওকে ওটা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।

কারণ, ও একটা মিথ্যেবাদী।' ব্যঙ্গের সুরে বলে উইললার্ড বলে। 'তোমার না জেনে, এরকম বলা উচিত হচ্ছে না।' প্রতিবাদের গলায় বলে জোয়ে। তর্কের ভঙ্গীতে উইললার্ড বলে 'কেন বলব না? আমি কাউকে ভয় পাইনা।' জোয়ে এবার ব্যঙ্গের গলায় বলে 'ওহ, এতো যখন সাহস আর আমাদের কথা যখন তোমার বিশ্বাসই হচ্ছে না, তুমি তাহলে বরং দোকানে ঢুকে চীনেটাকে প্রশ্ন করে সত্যিটা যাচাই করে নাওনা কেন? যাও, দেখি তোমার সাহসের বাহাদুরীর দৌড়টা।'

এটা একটা কর্মহীন উত্তেজনা তরঙ্গবিহীন অলস দিন। তাই বোধহয় উত্তেজনার আঁচ পোয়াতে খোঁজ পেতে, দুই বন্ধুর এই তর্কের লড়াইতে জড়িয়ে পড়া। একজন কিছুতেই মানতে রাজী নয় অন্য জনের কথা। আর অন্যজন, তাকে চ্যালেঞ্জ করে সত্যি যাচাই করে দেখতে। দুজনেই, একজন উইললার্ড 'মিথ্যেবাদী' সম্বোধন করলে, অন্যজন জোয়েও ছেড়ে কথা বলেনা, বন্ধুকে 'কাপুরুষ' সম্বোধন করে।

দুজনেই, এরপর, কাচের জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারতে থাকে। লি চঙ ভেতরে ছিল না। 'তোমার বৃদ্ধ চীনা কোথায়?' উইললার্ড প্রশ্ন করে। জোয়ে চিন্তিত গম্ভীর মুখে বলে 'আমার মনে হয়, ও মরে গেছে।' সঙ্গীটি কৌতূহলী গলায় বলে, 'কি ভাবে মরল?' জোয়েকে আরো গভীরতর চিন্তান্বিত দেখায়, একটু ইতস্তত করে সে বলে, 'উম, মানে, হয়তো ইঁদুর মারা বিষ খেয়েছে সে নিজেকে মারতে।' এব্যাপারে উইললার্ডও একমত হয়। 'আমারও তাই মনে হয়। লোকটা আসলে বোধহয় একটা ইঁদুরই ছিল। ইঁদুরদের মত দুর্গন্ধ ছিল শরীরে। হাঁটতও কেমন ইঁদুরদের মত হড়বড় করে।' কথা থামিয়ে কি যেন চিন্তা করে, তারপর বলে আচ্ছা, 'ও তাহলে একটা ইঁদুর কলে কেন মাথা গলিয়ে দিলনা? সেটাই তো সবথেকে সহজ হতো।'

অধ্যায় ঃ ২৭

ম্যাক এবং তার দলবল, প্যালেস ফ্লপ হাউসের বাইরে বসেছিল, দলবদ্ধ ভাবে। ওদের সবার মধ্যেই এক অস্থির—উন্মাদনা। যার প্রমাণ হিসেবে, জোন্স মাটি থেকে টুকরো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে এলোমেলো ভাবে, এপাশে-ওপাশে ছুঁড়ছিল। এ হয়ত সেই একই তাড়না, যা নাকি তাড়িত করে বেড়াচ্ছে মানুষকে—ক্যানেরী রো, এবং ক্যানেরী রো পার হয়ে মনটেরী, অথবা মনটেরী ঝাড়িয়েও, দূরবর্তী কারমেল পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। 'এবার, এবার আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। যেন পার্টিটা ঘটে। কোন অঘটন ছাড়া, একটা সুশৃঙ্খল পার্টি হওয়া চাই।' ম্যাক গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলে। 'এবার পার্টিটা হবে কোথায়?' জোনস, অস্থির পাথর ছোঁড়া থামিয়ে প্রশ্ন করে। ম্যাক পেছন দিকে হেলান দিয়ে বসে, পা দুটোকে আড়াআড়ি তুলে দেয়, 'আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি।' ওর কপালের চিন্তার কুঞ্চনরেখা আরো গভীর হয়। 'আমাদের এখানেও পার্টিটা করা যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওকে চমকে দেওয়া হঠাৎ অবাক করে দেওয়া, সেই ব্যাপারটা হবেনা। তাছাড়া, ডাক্তার নিজের বাড়ীই পছন্দ করে। সেখানে গান বাজনার ব্যাপার, সুবিধা আছে। ম্যাকের কথা শেষ হলে হিউজি বলে, 'আমারও মনে হয় সেটাই ভাল হবে।'

পার্টির খবর কেউ জানতে পারেনা। কাউকেই জানানো হয়না। কিন্তু, অথচ, ক্রমে সবার কাছেই খবরটা পৌঁছে যায়। যদিও, কাউকেই নিমন্ত্রণ করা হয় না। ম্যাক, কৌশলে ছুতো করে জেনে নিতে পেরেছিল ডাক্তারের থেকে। যে তাদের কাঙ্খিত তারিখটি ২৭শে অক্টোবর। সুতরাং প্রায় নীরবে নিঃশব্দেই চলতে লাগল-তৈরি হতে থাকল ২৭শে অক্টোবার, ডাক্তারের জন্ম দিনের পার্টির প্রস্তুতি। সবার মনের ভেতর-এর ক্যালেন্ডারে, মোটা লাল কালির বৃত্ত চিহ্নিত হয়ে থাকল দিনটি। এবং, যেহেতু জন্মদিনের অনুষ্ঠান, তাই কিছু উপহার দেবার প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই এসে যায়ই। ডাক্তারের জন্যে, কি উপযোগী উপহার হতে পারে? ডাক্তারের জীর্ণ কম্বলটির কোন পরিবর্তন? পয়সা কড়ি যা কিছু সব ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি কিনতেই ব্যবহার করত সে। নিজের জন্যে, খরচ করতে মন চাইত না ডাক্তারের কোন কিছুতেই। তাই তার শেয়াল লোমের কম্বলটা ক্রমেই বহু ব্যবহারে জীর্ণ শতছিন্ন সেলাই লাঞ্ছিত, রিফু জর্জর তাপ্পিজর্জরিত হয়ে উঠেছিল। কোরার বিয়ার ফ্ল্যাগের মেয়েরা—ওষুধ, স্বাস্থ্যপরীক্ষা অথবা নানা অপেশদার কারণে যারা প্রায়শই ডাক্তারের কাছে যেত যেতে হতো, তারা কম্বলের ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল ছিল। তাই তাদের ভাবনায়

যে একটা নতুন কম্বলের চিন্তা আসবে, তা স্বাভাবিকই।

লি চঙ, একটা পঁচিশ ফুট লম্বা চিনে পটকার 'অবিরাম ফেটে চলা তার' এবং একশো ক্ষুদে আকারের রঙীন লিলি বাল্ব এগুলোকেই যোগ্য ভাবলেন।

স্যাম ম্যালোয়ী বরাবরই অ্যান্টিকের ভক্ত। তিনি জানেন, অ্যান্টিক দ্রব্য হচ্ছে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা অর্থের মত। সুদে বাড়ে আসল ঠিক থাকে। সময়ের ধুলো যত পুরু হতে থাকে তার ওপর, অ্যান্টিক বস্তুর মূল্য ততো মহার্ঘ্য হয়ে ওঠে। তার নিজের এরকম বহু সঞ্চয়ের মধ্যে থেকে, ঝাড়াই বাছাই করে, তিনি ১৯১৬ সালের একটা 'কালমার্স' পিষ্টন রড, যেটা তার অন্যতম সেবা সংগ্রহ বলে ভাবতেন, সেটাকে বেছে নিলেন। বালি কাগজে ঘষে মেজে মূল ঐতিহাসিকতা, ঐতিহ্যময়তা নষ্ট বা খর্ব না করে, যতটা সম্ভব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে, একটা কাঠের বাক্স বানিয়ে, কালো ভেলভেট কাপড়ে মুড়ে—সযত্নে তুলে রাখলেন ২৭শে অক্টোবরের জন্যে।

ম্যাক এবং তার দলবলও ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে। শেষ পর্যন্ত তারা ভেবে বের করে ডাক্তারের বরাবরই একটা বেড়াল পুষবার শখ। কিন্তু তিনি কিছুতেই সুবিধে মত, একটা ভাল জাতের বেড়াল জোগাড় করে উঠতে পারছিলেন না। সুতরাং, ওদের সারা দিনের যাবতীয় উৎসাহ তৎপরতা নিবদ্ধ হলো, একটা সুন্দর দেখতে-হৃষ্টপুষ্ট এবং কম বয়সী ভাল জাতের বেড়াল জোগাড় করার মধ্যে। এবং ওদের উৎসাহ জোয়ারে ধরা পড়তে দেরী হলনা একটা মিষ্টি চেহারার অথচ রাগী 'টম ক্যাটে'র। বেড়াল জোগাড় হবার পর ওদের মনোযোগ আবার ঘুরে গেল পার্টি আয়োজনের অন্তিম পর্বের প্রস্তুতির দিকে। 'এবার কোনরকম সাজানো-টাজানোর ব্যাপার হবেনা।' ম্যাক সতর্ক ভঙ্গীতে ঘোষণা করে, এবং প্রায় শেষ কথা বলার মত যোগ করে 'শুধু, একটা দারুন, আসল পার্টি ব্যাস।'

হেনরী, তার শিল্পকলা সমূহের মধ্যে থেকে বেছে নিল একটিকে। ওর মতে অবশ্যই ওর সেরা শিল্পগুলোর একটি। রঙীন তেলরঙে চোবানো আলপিন দিয়ে তৈরি একটি বিমূর্ত শিল্প, ছবি। যদিও, গত তিনটি বছরে ছবিটি, যাবতীয় চেষ্টা সত্বেও শেষ হয়নি। কারণ, কিছুটা এগোবার পরই ছবির নিহিত বিমূর্ততাকে পছন্দ হয়নি হেনরীর। বড় বেশি অজটিল হয়ে উঠেছে, শেষ পর্যন্ত বিমূর্ততার গাঢ় এবং গূঢ়তর রহস্যটি। এই ধারনার বশবর্তী হয়ে, ছাঁচ, (যেহেতু পিন খুলে নিয়ে, পুনঃনির্মান এ ক্ষেত্রে খুবই সহজ) ভেঙ্গে ফেলেছে। হেনরী ঠিক করল, ছবিটাকে এবার সে অবশ্যই পুরো করবে। ডাক্তারের জন্মদিনের উপহার হিসেবে। কেন জানি তার মনে হলো-স্থির বিশ্বাস দৃঢ় হলো মনে, যে, বিমূর্ততার প্রতি ডাক্তারের একটা গোপন আকর্ষণ ভালবাসা আছে। যদিও এ

বিশ্বাসের স্বপক্ষে তার হাতে কোন যোগ্য প্রমাণ ছিলনা কিছুই। সম্ভাব্য ছবিটির যুতসই একটা নামকরণও করে ফেলল সে—'প্রি-ক্যামব্রেরিয়ন স্মৃতিমালা।'

সবাই নিজের নিজের মত করে প্রস্তুতি নিতে লাগল। সঙ্গে চললো আলোচনা। পরামর্শ। উপহার বাছাই নিয়ে শলা, কি কি মদ রাখা হবে পার্টিতে সে ব্যাপারে মন্তব্য, কখন শুরু কখন শেষ হবে পার্টি সেসব স্থির করা। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, শুধু ম্যাক ও তার সঙ্গীদের মধ্যেই কিন্তু সীমাবদ্ধ রইল না ব্যাপারটা। সবাই নিজের ভাবনা চিন্তা মতামত দিতে লাগল, সেইমত এগোতে ও প্রস্তুতি নিতেও লাগল। যেন পার্টিটা, তার ওদের বাড়ীতেই দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তার কিন্তু এসব ব্যাপার তাকে ঘিরে যে একটা গোপন ষড়যন্ত্র (!?) রচিত হচ্ছে, হতে চলেছে সেসব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রইলেন। প্রথমবার, তার টনক নড়ল, লি চঙের দোকানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে, তার দিকে তাকিয়েই খরিদ্দারটির সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে দিল লি চঙ। এরকম, আরো পরপর কয়েকটি ঘটনা ঘটার অভিঘাত—তাৎপর্যময়তা, তাকে বোঝাতে বুঝতে বাধ্য করল, কিছু একটা ঘটবে ঘটতে চলেছে, যার কেন্দ্র বিন্দুতে আছেন তিনি। হঠাৎই তিনি অনুভব করলেন লোকে সবাই তার সঙ্গে কেমন যেন শীতল ব্যবহার করছে। গত দু সপ্তাহে, অন্তত দশজন তাকে প্রশ্ন করেছে, ২৭শে অক্টোবর তিনি কি করবেন করছেন? তারপর তখন, তার মনে পড়ল তিনি, ম্যাক জন্মদিন কবে জানতে চাওয়ায় ঐ দিনটিই উল্লেখ করেছিলেন, কিছু না ভেবেই।

বিয়ারের মজুতে ঘাটতি পড়েছিল। তাই সেদিন তিনি কিছু বিয়ার সংগ্রহের জন্যে গিয়েছিলেন। বারের দরজা ঠেলে ঢুকতে-ঢুকতে তিনি শুনলেন এক জনৈক মাতাল প্রায়, মদ পরিবেশককে প্রশ্ন করছে 'দোস্ত, তুমি পার্টিতে যাচ্ছ তো?' পরিবেশক এড়িয়ে যাবার ভঙ্গীতে বলে, 'পার্টি? কিসের পার্টি?' মাতালটি একটা প্রগাঢ় হেঁচকিসহ বলে, 'আরে ২৭শে অক্টোবরের পার্টি দোস্ত। জন্মদিনের পার্টি। সারা ক্যানেরী জানে আর তুমি জানোনা? আমারও তো নিমন্ত্রণ হে।' ডাক্তার মাতালটির দিকে তাকালেন। না, তাকে চেনেন না। তবে ঘটনার পুরো ব্যাপারটার আদলটাকে এবার তিনি স্পষ্ট চিনতে পারছিলেন। এবং পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার পর তিনি মনের ভেতর এক উষ্ণ আবেগ টের পাচ্ছিলেন—তীব্রতর ভাবে অনুভব করছিলেন। তার জন্মদিনে, তাকে খুশি করার সুখী করার জন্যে, ওরা একটা পার্টি দিতে চলেছে, ব্যাপারটা মন ভাল করে দেবার মতই আবেগময়, অথচ, সাথে সাথে তিনি কিছুটা শঙ্কিতও বোধ করছিলেন—পূর্ব অভিজ্ঞতা ভেবে, মনে করে। এখন তিনি পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পারছিলেন। ম্যাকের হঠাৎ করে আসা, হস্তরেখা, ভাগ্যগণনা, জন্ম তারিখ

এসব কচকচি পাড়তে পাড়তে, কায়দা করে তার জন্মতারিখ জিজ্ঞেস করা, এবং সেটি জানা হতেই দ্রুত চলে যাওয়া, সবকিছু, বোঝা যাচ্ছিল—বুঝতে পারছিলেন। সেরাতে ডাক্তার অনেকটা নির্ঘুম সময় ছিলেন এই চিন্তাটার পেছনে। বহু যুক্তি পাল্টা যুক্তি, চিন্তার পর পার্টির স্বপক্ষেই মত দিল তার মন।

সুতরাং, তিনি নিজের মত করে—নিজস্বভাবে পার্টির প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। নিজের সেরা সবচেয়ে পছন্দের বাছাই করা রেকর্ডগুলো তিনি সরিয়ে দোতলায় শোবার ঘরে নিয়ে চলে গেলেন। এবং ফনোগ্রামসহ, যেগুলো মূল্যবান দামী জিনিষপত্র, এবং ভঙ্গুরযোগ্য বস্তুগুলোকেও সরিয়ে ফেললেন। একেবারে বদ্ধ তালাচাবির নিরাপদ দূরত্বে। পার্টিটা কেমন হতে চলেছে—হবে-হতে পারে, সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট-স্বচ্ছ ধারণা তার ছিল। অতিথিরা ক্ষুধার্ত হবে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন খাবার থাকবে না, তারা কোন খাবার-দাবার আনবে না। হয়ত মদ তারা আনবে, কিন্তু সে মজুত এতই কম যে অনুষ্ঠান শুরুর কয়েকমুহূর্ত পরেই তা শেষ হয়ে যাবে, যেতে বাধ্য। সুতরাং, তিনি নিজেই উদ্যোগী হলেন। নিজের রান্নাঘরের মাংস—টম্যাটো—লেটুসপাতা—আলু—বাঁধাকপি—ময়দা—রুটির সঞ্চয়—মজুতটাকে, বিশাল, মজবুত রকমের করলেন—করে রাখলেন। পাঁচ গ্যালন বেশ ভাল-দামী মদ এবং তিনি গ্যালন একটু শস্তা-কমদামী মদের ব্যবস্থাও করলেন। আয়োজন শেষ হলে, তিনি যখন নিজের খরচের হিসাব এবং ব্যাঙ্কের জমা বইয়ের অঙ্ক নিয়ে বসলেন, এবং হিসেবপত্র শেষ হবার পর মনে মনে ভাবলেন, বছরে এরকম ধরনের পার্টি যদি তিন চারটে দিতে হয়, তাহলে তাকে বাড়ী ল্যাবরেটরী সব বিক্রি করতে হবে।

এবং ডাক্তারের ভাবনা কোন অংশে ভুল ছিলনা। পার্টি বিষয়ে পরিকল্পনা—উত্তজনা তুঙ্গে পৌছল। এবং সত্যি-সত্যিই খাবার অথবা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে কেউ ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন আছে মনে করছিল না। শুধু বেড়ে যাচ্ছিল স্বঘোষিত নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা, ক্রমে হু-হু করে। বিয়ার ফ্ল্যাগ, খাবারের দোকানগুলো, রাস্তাঘাট, লি চঙের দোকান, ক্যানেরীগুলো, সর্বত্র একই আলোচনা। জোর জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো, এরকম একটা জমকালো পার্টিতে কি পোষাক পড়া যায়? সবাই-ই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়ল। নিজের নিজের পোষাকের ব্যাপারে সবাই নানারকম ভাবনা-ছক-পরিকল্পনা বানাতে লাগল। সবচেয়ে মুশকিলে পড়ল ডোরা আর ওর মেয়েরা সবাই পার্টিতে যেতে আগ্রহী বললে ভুল বলা হবে, উদগ্রীব বললে কম বলা হবে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হ্যাঁ হয়তো এটাই যথার্থ শব্দ। অথচ, সবাই একসাথে পার্টিতে চলে

গেলে—ব্যবসা চলে কি করে? বিশেষ করে যারা দৈনন্দিন প্রাত্যহিক খরিদ্দার, তাদের কি করে কে সামলাবে? সুতরাং, ডোরা তার মেয়েদের প্রস্তাব দিল, দুদল ভাগ করে নেওয়া হবে। একদল যখন কাজ করবে, অন্য দল পার্টিতে যাবে। আর পার্টি সেরে সেই দলটা ফিরে এলে বাড়ীর দলটা যাবে।

পার্টিটাকে ঘিরে উত্তেজনার পারদ ক্রমেই চড়তে লাগল। নানারকম চিন্তা, আগ্রহ, পরিকল্পনা, ক্যানেরীর মাথার ওপর দিয়ে, ঘিরে, পাক খেতে লাগল— প্রবল, প্রচন্ড একা ঘূর্ণীঝড়ের তীব্র মাতনের মত।

অধ্যায় ঃ ২৮

এটা তো নিশ্চিতই ছিল, পার্টির খবরটা ফ্র্যাঙ্কির কানেও পৌছবে, আগেই হোক অথবা পরে। এবং যথারীতি সে খবরটা শুনল। জানতে পারল। ফ্রাঙ্কি যেন এক হালকা পলকা মেঘের তাল, যে কোন কিছুর মধ্যে সে ঢুকে পড়তে পারে, কখনো সেটা হয়ত অনুপ্রবেশও হয় যদি, তাও। ভীড়ের মধ্যে সে অনায়াসে মিশে থাকতে পারে। কেউ তাকে আমল দেয়না—লক্ষও করেনা। এতটাই সাধারণ, গুরুত্বহীন চেহারা তার। আপনি হয়তো ও কান দিচ্ছে না শুনছে না কিছু, হাবাগোবা-বোকারাম ভেবে নিয়ে ওর সামনেই কোন অনৈতিক কাজও করে বসতে পারেন, কোন বন্ধু বা কারো সামনে-সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা—কথাবার্তা বললেন। ফ্র্যাঙ্কি কিন্তু, তার ঐ উদাসীন—অবহেলো— অন্যমনস্কতায় ডুবে থাকা ভঙ্গীর মধ্যে থেকেই সে সমস্ত কিছু খেয়াল লক্ষ্য করে দেখে শোনে।

পার্টিটার কথা শোনা জানার পর থেকেই, প্রথম সে চিন্তাটা ফ্র্যাঙ্কির মাথায় আসে, তা হলো একটা উপহার। সে চিন্তা থেকেই, জ্যাকবস-এর স্বর্ণ অলঙ্কারের দোকানের জানালা দিয়ে নানান জিনিষের ওপর নজর বোলাচ্ছিল সে। কালো 'ওনিক্স' ঘড়িটা তার খুব পছন্দ হলো। সোনার প্লেট এর প্রেক্ষাপটে নিকষ— অন্ধকার কালো। কিন্তু ঘড়িটার আসল সৌন্দর্য হচ্ছে, ওর শীর্ষটা। ব্রোঞ্জের, সেন্ট জর্জের ড্রাগন হত্যার অসাধারণ ভাস্কর্য। ড্রাগনটা যেন জীবন্ত, দু পা হাওয়ায় আঁচড়াচ্ছে। বুক ফুলিয়ে দম নিচ্ছে—প্রশ্বাসে আগুনের হলকা। আর সেন্ট জর্জ, অশ্বারোহী সশস্ত্র, তরোয়াল উঁচিয়ে সাহসী-লড়াকু ভঙ্গীতে ড্রাগনের মুখোমুখি। দারুণ, নজরকাড়া জিনিষটা। সেই গোটা সপ্তাহটা ধরে ফ্র্যাঙ্কি বেশ কয়েকবার আলভাবেড়ো ধরে যাতায়াত করল। নজর কাড়া জিনিষটাকে কাঁচের বিপনন জানালায় সাজানো অবস্থায় দেখবার তাগিদেই। প্রাণকাড়া

সৌন্দর্যটা ক্রমেই তাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতে শুরু করে। পার্টির কথাটা শোনার পর থেকেই, ঐ ব্রোঞ্জ শীর্ষওয়ালা ঘড়িটা তার অবচেতনে তীব্রতর সুপ্ত কামনা হয়ে ওঠে। ও গভীর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখতে থাকে—ঘড়িটা বুকে নিয়ে ও বসে আছে, ব্রোঞ্জের মসৃণ শীর্ষতায় হাত বোলাচ্ছে।

সেই, অপ্রতিরোধ্য তীব্রতর তাড়না থেকেই ফ্র্যাঙ্কি একদিন দোকানে ঢুকে পড়ল।

'ঐ ঘড়িটার দাম কত?' ফ্র্যাঙ্কি গম্ভীর—ক্রেতাসুলভ ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করে। দোকানী বিক্রেতাটি এক ঝলক ওর দিকে তাকায়। তারপর, ফ্রাঙ্কির চাহিদা পছন্দের জিনিষ কোনটি, যাচাই করে নিয়ে বিনয়ী ভঙ্গীতে উত্তর দেয়, 'ঐ ঘড়িটা? ওটা ৭৫ ডলার দাম পড়বে।' ফ্র্যাঙ্কি, দ্বিরুক্তি না করে, দ্রুত বেগে দোকান ছেড়ে বের হয়ে আসে। হাঁটতে-হাঁটতে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ায়। অনন্ত জলরাশি—অবিরাম ঢেউ ভাঙ্গা, স্থির-অপলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মাথা ভরে থাকে—আছে, সেই অলৌকিক অপার্থিব সৌন্দর্য। সমুদ্রে অবিরাম উথাল-পাথালতা ভরা ঢেউয়ে লক্ষ কোটি টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে দেখে সেই ব্রোঞ্জ ঘড়ি সুন্দরীকে। শেষ পর্য্যন্ত, বহুক্ষণ একই ভঙ্গীতে সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর কয়েক ঘন্টা দ্রুত গড়িয়ে যাবার পর, সে একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে। যেন, অনাবিল সমুদ্রই তাকে সাহস জোগায়—সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। আবার আলভারডো স্ট্রীটে ফিরে আসে ফ্র্যাঙ্কি। অপেক্ষায় থাকে। সিনেমা ঘরগুলোয় আসা মানুষেরা গোল্ডেন পপি'র খাবার-এর স্বাদ নিতে আসা মানুষেরা—ক্রমে এদের ভীড় যখন হালকা হয়ে, পাতলা হয়ে এলো, শেষ গাড়ীটার আরোহীটিও গাড়ী নিয়ে ফিরে গেল—শহর, ঘুমোতে যাবার উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে যখন, ফ্র্যাঙ্কি সে সময়েই তার কাজ সারল।

পুলিশটি, ফ্র্যাঙ্কিকে ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে, 'কি ব্যাপার মশাই?' ফ্র্যাঙ্কি মাথা নাড়ে 'না, কিছু না।' তারপর হাঁটতে শুরু করে। একটা গলির সরু পথে ঢুকে পড়ে কতগুলো বড়সড় কাঠের বাক্সের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। পুলিশটা একটা পাক মেরে চলে যেতেই, সে আড়াল থেকে বের হয়ে আসে। রাত তখন ২-৩০।

পরে পুলিশটি তার রিপোর্টে জানায়, কয়েদীটি পিছনের দরজার ওপরদিকের কাঁচের শার্সি ভেঙ্গে জ্যাকবস এর দোকানে ঢুকেছিল। গোটা অঞ্চলটায় একটা চক্কর মেরে যখন সে (পুলিশটি) আবার জ্যাকবসের দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, আসামীকে দৌড়ে পালাতে দেখে সে তাড়া করে। আশ্চর্যের কথা, হাতে ৫০ পাউন্ডের ওজনের মাল, অর্থাৎ ব্রোঞ্জের ঘড়িটা নিয়েও, আসামী যে কি করে অত জোরে দৌড়চ্ছিল সে এক অবিশ্বাস্য কান্ড। আসামীকে হয়ত সে

(পুলিশ) ধরতেই পারত না, যদিনা প্রাণপনে দৌড়ে পালাতে গিয়ে একটা অন্ধ গলির বন্ধ মাথায় সে (কয়েদী) আটকে না পড়ত। এই ভুলটা না করলে, আসামী হয়ত পালিয়ে যেতে সমর্থ হতো।

পরদিন সকালে পুলিশ চিফ, ডাক্তারকে ফোন করে ডেকে আনলেন। ডাক্তার এলে, চিফ তাকে বসতে বললেন। ফ্র্যাঙ্কিকে নিয়ে আসা হলো। অপরিষ্কার, না ঘুমোনো রক্তলাল চোখ, কিন্তু ওর সারা মুখ জুড়ে এক কাঠিন্য চোয়াল দৃঢ়, শক্ত। 'কি ব্যাপার?' ডাক্তার প্রশ্ন করলেন। চিফ তাকে পুরো ঘটনাটা বললেন। তারপর। স্থির—অপলক চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে চিফ বললেন, 'আমি, ফ্র্যাঙ্কির মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, কথা বলেছি। মহিলা বলেছেন, ফ্র্যাঙ্কি সে নাকি সারাক্ষণ আপনার বাড়ীতেই পড়ে থাকে— ছেলের ওপর কোন কর্তৃত্বই তার নেই। সে নাকি একমাত্র আপনার কথাই শোনে?' ডাক্তার ফ্ল্যাঙ্কির দিকে তাকালেন। ওর হৃদয়ে একটা পাথরচাপা দুঃখ ভাব বোধ। 'ছিঃ ফ্র্যাঙ্কি, তোমার এই চরম অন্যায় পাপ কাজ করা মোটেই উচিত হয়নি।' দুঃখ জর্জর ভারাক্রান্ত গলায় বললেন তিনি। তারপর পুলিশ চিফের দিকে ফিরে তিনি বললেন 'বাচ্চাটাকে কি জামিনে ছেড়ে দেওয়া যায় না?' পুলিশ চিফ মাথা নাড়লেন 'আমার মনে হয় না বিচারক তা করতে রাজী হবেন। আসামীর মানসিক স্বাস্থ্যর রিপোর্ট এসেছে—যেটা যথেষ্ট আপত্তিকর।' ডাক্তার মাথা নাড়েন, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'হ্যাঁ জানি।' পুলিশ চিফ নিজেও মাথা নাড়েন। 'আমিও বুঝি। এসব বয়ঃসন্ধিক্ষণের পৌছন লক্ষণ। প্রথম যৌবনের তীব্র তাড়না।' ডাক্তার মাথা নেড়ে সায় দেন। তার বুকের পাথর চাপা ভার বোধ ক্রমে অসহ্যতর হয়ে উঠেছে—উঠছে। পুলিশ চিফ বলেন, ডাক্তার শুনতে পান, পুলিশ চিফের কথাগুলো, যেন কোন দূরতম গ্রহ থেকে তার কানে ভেসে আসতে থাকে—ভেসে আসে, ক্রমাগত 'ডাক্তাররা ওকে ভেতরে রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদেরও তাই মত। পুলিশের খাতাতেও, ওর অতীত ইতিহাস ভাল নয়। হয়তো, আরো আগেই আমাদের এই ব্যবস্থাটা নেওয়া উচিত ছিল। থাক, আশাকরি খুব বেশি দেরী হয়ে যায়নি। এতে ওর ভালই হবে ভবিষ্যতে।' ডাক্তার মাথা নাড়েন, যদিও তার মন সায় দেয়না—ইচ্ছে জাগেনা, তবু চিফের কথায় সায় দিতেই হয় তাকে, বাধ্যতামূলকভাবে। কিন্তু তার মনে হয়—এই কাজের পেছনে, ফ্র্যাঙ্কির নিজস্ব কোন চিন্তাধারা, কার্যকারণ নিশ্চয়ই আছে, থাকা উচিত। তিনি সে কার্যকারণ— উদ্দেশ্য সন্ধানে, তীব্র চোখে ফ্র্যাঙ্কির দিকে তাকালেন, পরম স্নেহার্দ্র গলায় বললেন, 'তুমি, তুমি, কেন একাজ করলে ফ্র্যাঙ্কি?' ফ্র্যাঙ্কি তাকায়, ছায়ারেখা কোন গভীর তলহীন পুকুরের মত ভিজে মায়াবী চোখ তুলে তাকাল ফ্র্যাঙ্কি।

'আপনার জন্যে উপহার ডাক্তার...আমি পার্টিতে যাব ঠিক করেছিলাম যে।'
এক বিদ্যুতাহত ব্যক্তির মত ছিটকে পুলিশ থানা থেকে, বের আসতে আসতে ডাক্তার শুনতে পেলেন, অপার্থিব মায়াতুর কল্পনার সীমা পার হওয়া এক গলায় ফ্র্যাঙ্কি বলছে, 'ডাক্তার, আমি আপনাকে ভালবাসি, ডাক্তার।' ডাক্তার, টলতে টলতে গাড়ীতে উঠে বসলেন।

অধ্যায় ঃ ২৯

২৭শে অক্টোবর ভোর চারটে-তে ডাক্তার তার কাজ শেষ করলেন। শেষ জেলি ফিশ-টিকেও তিনি ফরমালিনের বোতলের মধ্যে ঢোকালেন। হাতের গ্লাভস খুললেন। চিমটেটিকে ভাল করে মুছে-পাউডারচর্চিত করে যথাস্থানে রাখলেন। তারপর হাত মুখ ধুয়ে বাইরে এলেন। কিছু বাছাই করা রেকর্ড এবং মাইক্রোস্কোপটিকে নিজের শোবার ঘরে নিরাপদে রেখে এলেন। তারপরই তার খেয়াল হলো—অতি উৎসাহী কোন অতিথি যদি বিষাক্ত ঝুমঝুমি সাপটিকে নিয়ে খেলার চেষ্টা করে, এই ভেবে সেটিকে ল্যাবরেটরী থেকে সরিয়ে পেছনের ঘরে তালা বন্ধ করে নিরাপদে রাখলেন। ডাক্তার সর্বান্তকরণে সচেষ্ট হলেন—পার্টিটি যাতে অহিংস হয়, আবার নির্জীব প্রাণহীনও না হয়ে ওঠে। সেসব সেরে, এক কাপ কফি বানিয়ে খেয়ে, তিনি স্নানে ঢুকলেন। স্নান সেরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরে তিনি জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দূরে, প্যালেস ফ্লপ হাউসের দিকে চোখ রাখলেন। সেখানে কোন সাড় ছিলনা প্রাণের। কাউকে দেখাও যাচ্ছিল না। যদিও, ডাক্তারের অনুভূতি বোধ বলছিল—তার দিকে লক্ষ রাখা হচ্ছে। তিনি জানেন না, কে অথবা কতজন তার পার্টিতে আসছে আসবে। এই অস্বস্তিটা সারাদিন ধরে তাকে কিছুটা বিব্রত—কিছুটা উদ্বিগ্ন রাখল। যদিও, সারাদিন নিজের রোজ-এর প্রাত্যহিক দৈনন্দিন রুটিন মতই কাটালেন।
এবং তার সেই প্রাত্যহিকতায় বিঘ্ন ঘটিয়ে নতুনতর কিছু ঘটল না।
প্যালেস ফ্লপ হাউসের দরজা সারা বিকেল বন্ধই রইল। স্টোভটা সারা বিকেল গর্জন করতে করতে ফুটতে লাগল। জল গরম হয়েই চলল। সবাই স্নান করল। এমনকি 'প্রিয়তমা' স্নান করে-গলায় লাল 'বো-টাই' জড়িয়ে তৈরি হলো। 'ঠিক কটা নাগাদ আমরা যাবো', হেজেল প্রশ্ন করে। 'তোমার মনে হয় আটটা নাগাদ যাওয়াটাই ঠিক হবে।' ম্যাক বলে। 'তার আগে, এক পাত্তর করে গরম হয়ে নিলে খরাপ হয়না।' হিউজি বলে। জোনস হঠাৎ বলে, 'ডাক্তার কিছু সন্দেহ করেছে কি?' ম্যাক মাথা নাড়ে নঞর্থবোধক ভঙ্গীতে 'কি করে সে তা করতে পারে?' ঘরের কোনে রাখা বেতের খাঁচাটায় টম ক্যাটটি হঠাৎ

ডেকে ওঠে।

বিকেল ৫-৩০। সূর্য্যের আলো ঢলতে শুরু করেছে। বিয়ার ফ্ল্যাগের মেয়েরাও প্রস্তুতি শুরু করল। যারা প্রথমে যাবে তারা, সেই দলটা, উৎফুল্ল মুখে সাজগোজ করতে শুরু করে। মালকিন ডোরার সাজগোজ সবার আগে শেষ হলো। তাকে দেখাচ্ছিলও চমকপ্রদ। সদ্য কমলারঙ করা চুলের উজ্জ্বলতার সঙ্গে সঙ্গত রেখে, গলায় একটা হীরের নেকলেস পরেছিল সে, যেটা প্রায় বুকের ওপর ঝুলে-নেমে এসেছিল। দু কানে সেই হীরেরই দুল। হাতের আঙটিটাও হীরের বর্ণহীন উজ্জ্বলতার সঙ্গে মিলিয় সাদা দুধসাদা—নগ্ন কাঁধ গাউন পরেছিল। গাউনটায়, কালো বাঁশ-বাঁশ ধরনের নকশা প্রতীর্ক। যারা প্রথমে যাবেনা, তারা বিমর্ষ-হতাশ মুখে, যথারীতি রোজের মত দ্রুত উন্মোচন করা যায় এমন, লম্বা সান্ধ্য গাউন পড়েছিল। যারা প্রথমে যাচ্ছে, তারা হইচই করে সাজগোজ করছিল। নানারকম রঙের ছিটের নকশার, ছোট্ট ছোট্ট হাঁটু ঝুলের স্কার্ট অথবা ফ্রক পরেছিল প্রায় সব কজনই। তাদের, সবাইকেই বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছিল। বিয়ার ফ্ল্যাগের মদ পরিবেশকটিই একমাত্র অসুখী ব্যক্তি ছিল। মনে মনে গজরাচ্ছিল থাকতেই হবে। তারচেয়ে বড় কথা খদ্দেররা। যে কেউ তৃষ্ণার বশে যখন তখন ঢুকে মদ চাইতে পারে। পরিবেশক না থাকলে, বিক্রির কাজটা তো বন্ধ হয়ে থাকবে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে থাকবে। যেটা ডোরা কিছুতেই হতে দেবেনা চায়না!

ডোরা নিজের ঘরে এলো। সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর নিজের দেরাজ থেকে একটা ছোট্ট গ্লাস আর মদের বোতলটা বের করে। বোতল থেকে মসৃণ স্বতস্ফূর্তভাবে গ্লাসে মদ ঝরতে গড়িয়ে নামতে থাকে। দরজার বাইরে কান পেতে থাকা মেয়েটা, সেই শব্দের যথার্থ ইঙ্গিতবহতা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয়। ডোরা গ্লাসে চুমুক দেয়। মেয়েরা উর্দ্ধশ্বাসে নিজেদের ঘরের দিকে দৌড় লাগায়। যে যার নিজস্ব গোপন জায়গা থেকে নিজস্ব গোপন বোতলটা বের করে। ডোরা পান করেছে অন্যের গন্ধ তখন তার নাকে ধরা পড়বে না। মেয়েরা, যে-যার নিজস্ব বোতল ও তার জলবীয়তায় চুমুক দিতে লাগল।

এবং, ক্যানেরী রো-তে সন্ধ্যা নামল। দিনান্ত আর ধূসরতার সময় পেরিয়ে রাস্তার আলো একে একে জ্বলে উঠতে লাগল, সন্ধ্যাকে চিহ্নিত করে।

অধ্যায় ঃ ৩০

পার্টি। যদি তার ব্যবচ্ছেদ মাত্রিক-রাসায়নিক চরিত্র বিচার করা যায় তবে স্পষ্টতই লক্ষ করা যাবে-যায়, যে, পার্টি কখনোই পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পিত পথে হাঁটেনা। সে সর্বদাই প্রথাবিরোধী বিদ্রোহী বিপ্লবী। এবং, এই পার্টিতে, ক্যানেরী রো-এর প্রত্যেকে, স্বতস্ফূর্ততায় প্রমান করে দিল, পার্টি কেমন হওয়া উচিত, হতে হয়। শুভেচ্ছাময় চিৎকার, অভিনন্দন, আনন্দ-ভাললাগার উচ্চস্বর প্রকাশ, সবই ছিল। গমগম করছিল। ব্যাপারটা, অথচ, আদৌও এভাবে শুরু হয়নি। আটটা নাগাদ, ম্যাক ও তার দলবল এলো। ভদ্র সভ্য সাজ পোষাক, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, নিখুঁত কামানো গাল। বড়সড় একটা মদের পাত্র আর টম ক্যাটের খাঁচাটা হাতে দলটা যখন প্রায় সামরিক তৎপরতায় ভঙ্গীতে, মার্চ প্যারেডের ধরনে ডাক্তারের বাড়ী এসে পৌঁছল, দলের সব কজনের মুখেই বিব্রত বোধের ঢেউ খেলে গেল। ডাক্তার দরজা খুলে, হাসি হাসি মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মুখে, ঘোর কাটার আগেই, ম্যাক, সর্বপ্রথমে ডাক্তারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানায়। এরপর, একে একে, অন্যেরা সবাইও, বিহ্বল হতচকিত মুখেই, ডাক্তারকে শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করে। জন্মদিনের উপহারটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অতঃপর, হঠাৎই, হয়তো ওদের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা দেখেই, ডাক্তারের খেয়াল হয়, তিনি নিজেকে বদলান তাৎক্ষণিকতায়, 'সে কি? জন্মদিন, আজ আমার জন্মদিন? হে যীশু, আমার-আমার তো মনেই ছিলনা। তোমরা যে মনে করে এসেছ, অনেক অনেক ধন্যবাদ।' ডাক্তার, অবাক হবার ভান করেন। ওরা সবাই বাঁ দিকের বড় ঘরটায় বসে। ছোট্ট একখন্ড নীরবতায় ভরে ওঠে ঘরটা। তারপর ডাক্তার বলেন, 'বেশ, তোমরা সবাই যখন এসেছ, একটু পানের ব্যবস্থা হলে মন্দ হয় না, কি বলো?' ম্যাক বলে 'আমরা কিছুটা এনেছি।' এডি, একটু পানের ব্যবস্থা হলে মন্দ হয়না, কি বলো?' এডি, হিউজি আর জোনসের হাতের পাত্রগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে 'হুইস্কি' যোগ করে। ডাক্তার হাসেন, 'ধন্যবাদ। ওগুলো থাকুক। তোমরা এখন আমার আনা পানীয় নাও, নেবে, হুইস্কিই।' ভরা গ্লাস সবার হাতে তুলে দিলেন ডাক্তার। ওরা সবাই একসাথে অনাড়ম্বর সহজভাবে বসে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল। এই সময় ডোরা এবং তার মেয়েদের প্রথম দলটা এসে হাজির হলো। একটু পরে, এলেন শ্রী ও শ্রীমতি ম্যালোয়ী। শ্রী ম্যালোয়ী, তার ১৯১৬ কালমার্স' পিস্টন খন্ডটি যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে উপহার যোগ্যতায়—ডাক্তারের হাতে তুলে

দিতে-দিতে বললেন, 'সম্ভবত, পৃথিবীকে, এই বস্তুটির আর কোন জুড়ি—অবশিষ্ট—বিকল্প, নেই।' ডাক্তার হেসে, মাথা নেড়ে, বক্তব্য সমর্থনের ভঙ্গী করলেন। 'আমাদের দৈনন্দিন—প্রাত্যহিকতার তুচ্ছতার মধ্যেও যে লুকিয়ে থাকে কত অমূল্য বস্তু, আমরা তা খেয়ালই করিনা। জানতেও পারিনা।' ডাক্তার আবার সমর্থনসূচক—সায়বাচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়েন।

এবং, মানুষের ঢল নামে, ভীড় বাড়তে শুরু করে। হেনরী তার শিল্পকর্মসহ এসে হাজির হয়। উপহার ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে—সে যখন সবে নিজের শিল্পটির উৎকর্ষ্য তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে, গুণ বর্ণনা করে বক্তৃতা শুরু করে, শুরুর মুখেই তা ভেঙ্গে পড়ে। কারণ, হৈ হৈ করতে করতে চলে আসেন শ্রী ও শ্রীমতি গেই, উপহারসহ। এরপর আসে লি চঙ, তার চিনে পটকার 'অবিরাম' ফাটার দড়ি আর লিলি বাল্ব-এর উপহার নিয়ে। তারপর....তারপর...একে একে, অবিরাম, দলে-দলে অতিথিরা (অবশ্যই নিমন্ত্রণ কর্তার অজানা-অনিমন্ত্রিত) এসে চলে, ভীড় বেড়েই চলে দ্রুততর গতিতে। এমনকি, 'লা ইডা'তে স্ফুর্তি করতে আসা, একদল অচেনা মানুষ, খবর পেয়েও তারাও এসে হাজির হয়।

ভীড় যত বাড়তে থাকে—রাত যত এগোতে থাকে— পানীয় যত গড়াতে থাকে, পার্টির জড়তাটা ততোই কেটে যেতে থাকে। শৃঙ্খলার ধরণটা ততোই খসে পড়তে থাকে। আচরণ ব্যবহারে ভদ্রতার পালিশটা ক্রমে ক্রমে সরে যেতে থাকে। ডোরা সারা পার্টিটায় রাজেন্দ্রাণীর গর্বমত্ততায় ঘুরে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। সুন্দর পোষাক—দামী গহনা-শাররিক সৌন্দর্য্যের অহংকার ঔদ্ধত্য, বাঁ হাতের তিন আঙুলে মদের গ্লাসটাকে ধরে তার হেঁটে বেড়ানোর ভঙ্গীটিতেই ঠিকরে প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল। ডোরা, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অবশ্য হেঁটে বেড়াচ্ছিল না। সে তার মেয়েদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল, যাতে তারা কোন বিশৃঙ্খল-অনৈতিক কাজ করতে না পারে। এবং প্রথম গন্ডগোলটা বাঁধল, সেখানেই। লা-ইডা-য় স্ফুর্তি করতে আসা দলটার একজন, ডোরার একজন মেয়েকে অশ্লীল—অনৈতিক প্রস্তাব দেয়। ডোরার মেয়েটি রাগতভাবে প্রতিবাদ করে। ঘটনাটি নজরে আসতেই, ম্যাক ও তার দলের ছেলেরা রাগে গর্জে ওঠে—ফেটে পড়ে। একপ্রস্থ কথা কাটাকাটির পর ম্যাকেরা, দলে ভারী হবার সুবাদে-সুযোগে, স্ফুর্তিবাজদের পুরো দলটাকেই দরজার বাইরে বের করে দিল-ছুঁড়ে।

·

ডাক্তার রান্নাঘর থেকে টমেটো লেটুসপাতা দেওয়া রান্না মাংসের পদটা এবং প্রচুর রুটি, এনে টেবিলে সাজালেন। মদের পাত্রও টেবিলে দেওয়া হলো। সবাই খাওয়া দাওয়া মদ্যপানে মেতে ওঠায়, ঘরের পরিবেশে আপাত শান্তি

কল্যাণ নেমে এলো।

ডাক্তারের সারা মন জুড়ে এক স্বর্গীয় আনন্দের অনুভব জড়িয়ে পড়তে লাগল। তাৎক্ষণিক সেই আবেদন। আনন্দ উচ্ছল ঝর্ণা ধারার তরঙ্গে, ডাক্তার কি যেন এক অধরা বেদনা, বিষন্নতার তীব্র অনুরণন শুনতে পাচ্ছিলেন। কি সেই শোক বিষন্নতা, কোথায় তার উৎস শিকড় কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না—বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

অতিথিরাও কি ডাক্তারের এই মানসিক দ্বিস্তরীয় টানাপোড়েন, অস্থিরতা, টের পাচ্ছিল? কেননা, হঠাৎ, ঘর জুড়ে নেমে এলো অপার্থিব অলৌকিক পিনপতন নৈঃশব্দ্য। সবাই, স্থির পলকহীন চোখে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ, ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন। টেবিল থেকে একটা কালো চামড়া বাঁধানো মলাটের মোটা বই তুলে নিলেন।

ভারী, গম্ভীর, বিষণ্ণতা জর্জর কণ্ঠে, স্পষ্ট উচ্চারণে উঁচু গলায়, পাঠ শুরু করলেন—

এমন কি এখনো
আমার আত্মার তীব্রতর দহন বেজে ওঠে, জ্বালায়,
গহনতম বুকের অন্দরে
তার স্বর্ণ খচিত-মুখের উজ্জ্বলতার আভা, যেন রাত নক্ষত্র।
রেখায় আঁকা তার সৌন্দর্য্যের অগ্নি প্রতিরূপ, জ্বাজল্যমানা,
আমার ক্ষত গোপন.....

এর পরের কুড়ি মিনিট, সারা ঘর, অতিথিরা, মগ্ন-নীরব হয়ে রইল সেই পাঠের বিষণ্ণতা জর্জর স্তব্ধতর, আবেদনের ব্যাপকতরতায়।

ডাক্তার যখন পাঠ শেষ করলেন—কয়েক মুহূর্ত, সারা ঘর স্তব্ধতায় ঢাকা রইল। ফিলিস মায়ে, স্পষ্টতই, দুচোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জলের ধারা মুছতে ব্যস্ত দেখা গেল। হেজেল, গাঢ়তর বাক্য-শব্দের মোহক আবেদনে এতটাই মগ্ন হয়ে ডুবে গিয়েছিল যে, পাঠ শেষ হয়ে যাবার পরের বেশ কিছু মুহূর্তেও তার ঘোর কাটল না। বিষণ্ণতা—অচিন দুঃখবোধের কুয়াশার ভারী জালটা, সারা ঘর জুড়ে-অতিথিদের সবার মধ্যেই ছড়িয়ে-জড়িয়ে পড়েছিল। সবারই, মনে ভীড় করে আসছিল—ঘন অতীতের পিছুটান, ফেলে আসা পুরোনো-হারানো কোন এক ভালবাসা, কোন এক প্রায় ভুলতে বসা কণ্ঠস্বর, ডাক।

ঠিক এই সময়েই, কে যেন—অবিরাম ফেটে চলা' চিনে পটকার দড়িটার সলতেতে আগুন জ্বেলে দিল। পটকাগুলো ফাটতে শুরু করে বিরামহীন। ফেটেই চলে। যেন অন্তহীন শেষ বলে তার কিছু নেই-ই। পার্টি তার চরম-শীর্ষতায় পৌঁছল, অবশেষে।

অধ্যায় ঃ ৩১

ডাক্তার জেগে উঠলেন। ধীরে, জড়তাময়-শ্লথ ভঙ্গীতে, যেন কোন অত্যন্ত মেদবহুল মানুষ সাঁতারের পুলের জল থেকে উঠে আসতে চেষ্টা করছে—তার উঠে বসার মধ্যে সেই বিকৃত ভঙ্গীটির হুবহু প্রতিফলন ছিল। একবার চোখ খুলেই, সকালের—উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো রোদে, দ্রুত চোখ বন্ধ করে নিতে বাধ্য হলেন। ধীরে ধীরে। আলো সইয়ে নিয়ে চোখ খুললেন। সারা বাড়ী জুড়ে গত রাতের কারণে এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ভাব জড়ানো, ছেটানো। তার পর্যবেক্ষণময় অনুসন্ধানী চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগল, সারা বাড়ী জুড়ে ভাঙ্গা প্লেটের টুকরো, আধ খাওয়া মদের গ্লাস, খাবারের অভূক্ত অবশিষ্টাংশ এবং ডানা ছেঁড়া প্রজাপতির মত মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা একটা বই, সব, সবকিছুর ওপর দিয়ে সিনে ক্যামেরার মত ঘুরে বেড়াতে থাকে তার চোখ। দেওয়ালের চিনে পটকার মোড়কের লাল কাগজের আল্পনা আঁকা হয়ে রয়েছে, ফাটার পর যা উড়ে উড়ে দেওয়ালরঞ্জিত হয়েছে করেছে। বাতাসে তখনো, মৃদু ভেসে রয়েছে বারুদের গন্ধ। সিগারেট অবশিষ্টাংশর হাজার টুকরো জড়িয়ে সারা বাড়ীতে। একটা মিশ্র ভারী গন্ধ, যা নাকি গতরাতের বিয়ার, হুইস্কি আর নানা শরীর সুগন্ধীর বাসি গন্ধ।

ডাক্তার, ধীরে ধীরে রান্না ঘরে ঢুকলেন। তেল মশালা মাখা, খাদ্য অবশিষ্টাংশের দাগ লেগে থাকা প্লেটের স্তুপের দিকে তাকালেন একপলক। তারপর, উনুনে কফির গরম জল চাপালেন। জানালায় এসে বাইরের দিকে তাকালেন। উজ্জ্বল রৌদ্র-ধৌত শান্ত ক্যানেরী রো-এর একটি স্বাভাবিক দিন। অন্যদিনের তুলনায় একটু কম ব্যস্ত কম গর্জমান। প্যালেস ফ্লপ হাউস-এর দরজা শক্তভাবে বন্ধ। শুধু, কে একজন যেন, বাইরের চত্বরটায় শান্তভাবে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ডোরার বাড়ীও নিস্তব্ধ, জানালা দরজা আঁটা। কোন মেয়ের দেখা নেই। শুধু, অলৌকিক স্তব্ধতা পেরিয়ে ভেসে আসে, দূরের পাহাড় চুড়োর ওপরে গির্জার গম্ভীর, দৈবতা—অলৌকিকতাময় সমাহিত-ঘন্টার, টানা সুরে বেজে চলা, নির্দিষ্ট ছন্দময় শব্দটি।

ডাক্তার কফি বানালেন। স্নান সেরে পরিপাটি পোষাক পড়লেন। তারপর, ল্যাবরেটরীর টেবিলে এসে বসে হাতে তুলে নিলেন গত রাতের বইটি—

এমনকি এখনো
আমার আত্মার তীব্রতর দহন বেজে ওঠে, জ্বালায়,
গহনতম বুকের অন্দরে

তার স্বর্ণখচিত মুখের উজ্জ্বলতার আভা, যেন রাত নক্ষত্র।
রেখায় আঁকা তার সৌন্দর্য্যের অগ্নি প্রতিরূপ, জাজ্জ্বল্যমান,
আমার ক্ষত গোপন....

ডাক্তার বইটা বন্ধ করলেন। হাতের তালুর পেছন দিয়ে চোখ মুছলেন। ঢেউ, বহু দূর-অতীত থেকে ভেসে আসা, বেদনা বিধুর ঢেউ-এর শব্দ, তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। জলের গোপন জলোচ্ছাস ধাক্কা মারছে—আছড়ে পড়ছে, আদিম শৈল-প্রস্তরময় পাহাড়ের তলদেশে, অথচ ক্ষয়ের দাগ বসাতে পারছে না। সেই ব্যর্থ ঢেউয়ের গহনতার বুক চিরে এক গোপন বাজনা অথবা কান্নার মত সুর শুনতে পান ডাক্তার। তিনি, স্থির নিশ্চিত, ঐ ঢেউয়ে উঁকি মারলে তিনি দেখতে পাবেন আদিম-শ্যাওলা।

নিজের যৌবন।
ভুলে যাওয়া এক সময়ের দিকে
চোখ বন্ধ করে
তাকাই, আমি তাকাই।
আমার নবীনা কিশোরী আছে তার আড়ালে।
এক চিরকালীন আলোর মত, বিমূর্ত, অথচ বাস্তব।

ল্যাবরেটরীতে, খাঁচার সাদা ইঁদুরগুলো অস্থিরভাবে সীমাবদ্ধতাটুকুর মধ্যেই দৌড়ে বেড়াচ্ছিল। ঝুমঝুমি সাপটা, তার ধূসর-কুয়াশাময় রহস্যের মত দুচোখে, স্থির-শূন্যতার দিকে তাকিয়ে ছিল, তাকিয়েই ছিল।